প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশক—ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

নাট্যকার
মনোরঞ্জন বিশ্বাসকে

পরিচায়িকা

প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় একজন বুদ্ধিজীবীর দায়বদ্ধতা, সদর্থকতা কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রমাণিত হয়ে যায়। একজন মানুষ সারাজীবন ধরে শুধুই প্রগতিশীল কিংবা শুধুই প্রতি-ক্রিয়াশীল থাকেন না। জীবনের প্রথম পর্যায়ে প্রগতিশীল একজন বুদ্ধি-জীবীকেও হয়তো কখনো দেখা যায় জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হতে। একজন বুদ্ধিজীবীকে প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, শাসকশ্রেণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লড়তে লড়তে একটা অবস্থানে এসে দাঁড়াতে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কর্মকাণ্ড, দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকা গ্রহণের স্বরূপ এবং সর্বোপরি তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সমূহ বিশ্লেষণ করলে তবেই একজন বুদ্ধিজীবী কতখানি প্রগতিশীল কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

রাজনৈতিক গতিবেগের ধারায় বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও অনিবার্য-ভাবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দুই মূল বিপরীতস্রোতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—একদল প্রাতিষ্ঠানিকতার পক্ষে, অন্যদল জনগণের আন্দোলনে, গণমানুষের অংশীদার হিসেবে। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সত্যতা সূত্রেই বলা যায়, বাঙলাদেশের সম্প্রতিকালের শ্রেষ্ঠ মনীষা আহমদ শরীফও সারাজীবন প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এখন একজন প্রগতিশীল ও বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবীর অবস্থানে পৌঁছোতে পেরেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এটা একদিনে সম্ভব হয়নি, দীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই এই পরিণতি—এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সূত্রই আহমদ শরীফের বর্তমান আহমদ শরীফ 'হয়ে ওঠার' ইতিহাস।

বাঙলাদেশের সাহিত্যজগতে, বিশেষত প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্রে আহমদ শরীফ একটি অসাধারণ প্রতিভা, অনন্য ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী এই মানুষটি প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অবলীলায় নাকচ করে দেন বলিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্যের জালে, শব্দের সুতীক্ষ্ণ সায়কে এবং প্রগতিশীল বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তার আঘাতে। এসব অস্ত্র দিয়েই তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে, মন ও মননকে এবং মানুষের অন্তরের সুপ্ত সত্তাকে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। সবচেয়ে

অভিনব হলো এই যে, তাঁর যুক্তিনির্ভরতা এতই প্রখর এবং চিন্তা-চেতনার উপস্থাপন এমনই প্রচণ্ড শক্তিশালী যে পাঠকসমাজ বিষয়ের তথ্যগত সংশয় মনে না রেখেই চুম্বকের মতো আকর্ষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন আপোসহীন, সমাজকর্মে, প্রবন্ধচিন্তায় ও গবেষণাকার্যে তথা মননশীল চর্চায় তেমনি প্রতিবাদী। তাঁর গদ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার প্রতি অস্থির আগ্রহ। যদিও তাঁর সমাজতান্ত্রিক চেতনা মানবতাবাদের দ্বারা সিক্ত।

আহমদ শরীফ ঐতিহ্য ও সংস্কারকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন সমকালীন জীবন-দৃষ্টি থেকে, চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার অচলায়তনকে ভাঙেন যুক্তি ও মননশীল পাণ্ডিত্য দিয়ে। বস্তুবাদী দর্শনে প্লাবিত তাঁর সমগ্রসত্তা আঘাত করে সমাজের উপরিসৌধের দেয়ালে। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে এভাবেই ফেটে পড়ে তাঁর বিদ্রোহ ; ঐতিহ্যই হয়ে ওঠে তাঁর আগল ভাঙার হাতিয়ার। মার্কসবাদীরা প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতিকে যেভাবে কালের উপযোগ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন জীবন এবং সমাজবদলের আন্দোলন প্রয়াসে, আহমদ শরীফও তেমনিভাবে বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে মানবতাবাদের চেতনায় গণমুক্তির সন্ধান করেন, ইতিহাসে উপেক্ষিত নিরন্ন গণমানব ও খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রাম ও তাদের সংগ্রামী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত নির্মাণ করেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেন ; শিল্পচেতনা ও ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা দেন।

মধ্যযুগ নিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রবাদে পরিণত হয়েছে : 'আহমদ শরীফ। সমগ্র মধ্যযুগ করিলা জরিপ।' পুঁথির ভাষার আদলে শিক্ষার্থীদের এই প্রবাদ-প্রতিম প্রচার মিথ্যে নয়। জীবনের একটা বড় সময় ব্যয়ে তিনি মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের ইতিহাস তৈরি করেছেন, যাকে প্রয়াত অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য বলেছেন 'হিস্ট্রি অব দ্য পিপ্‌ল'। মধ্যযুগের ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের জুড়ি মেলা ভার। এই পর্যায়ে, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কখনো তিনি নৃতাত্ত্বিক, কখনোবা প্রতিফলনতত্ত্ব আরোপ করেছেন ; তবে মূলস্রোত তাঁর সবসময়েই এগিয়েছে বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে। তাঁর বিশ্লেষণালোকসম্পাতে গুরুত্ব পেয়েছে ঐ যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষ। প্রচণ্ড নির্ভীকতা ও ঝুঁকি নিয়ে, চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন সে-যুগের সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে।

সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি-তত্ত্ব, ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তা কিংবা বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদকে যৌক্তিকভাবে পরিহার করে তিনি রাষ্ট্রিক জাতীয়তার কথা বলেছেন ; সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রকাশ্যে নিন্দা করে এর উদ্‌গাতাদের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। সামরিক শাসন, গণতন্ত্রহীন স্বৈরাচারের রাজত্বে দাঁড়িয়েও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তাঁর বুক কাঁপেনি কখনো, বন্ধ হয়নি তাঁর প্রতিবাদী লেখনী। জীবনে আপোস করেননি কোনদিন। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকে তিনি ঘৃণ্য মনে করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন প্রতিবাদের পরিণামে বাঙলাদেশের প্রতিটি সরকারের হিসেবের তালিকায় তাঁর নাম শত্রু হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য বহু সম্মানসূচক স্বীকৃতি থেকে, বাদ দেয়া হয়েছে তাঁর নাম সবধরনের সরকারী প্রচারমাধ্যম থেকেও। ফলে এতবড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিভার আন্তর্জাতিক পরিচিতি বা খ্যাতির সুযোগ মেলেনি আজো।

বাঙলাদেশের মতো একটা জটিল পরিস্থিতি ও প্রতিবেশে সমাজতন্ত্র কায়েম সহজ না হলেও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আশা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং জানিয়েছেন, এর মধ্য দিয়েই 'যথাযথ সুশাসনে ও সুব্যবস্থায়' সাময়িকভাবে হলেও 'শোষিত-পীড়িত দীন-জনগণের' আর্থিক যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হবে। ড. শরীফের এ মন্তব্যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠন সত্যি সত্যিই কি সম্ভব ? কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ যেখানে প্রকট, শ্রেণীগত বিভাজন যেখানে ব্যাপক সেখানে দীন-জনগণের আর্থিক যন্ত্রণার উপশম বাস্তবে আদৌ সম্ভব কি ? অবশ্য এই সমস্যা সুরাহার আকাঙ্ক্ষায় তিনি 'গণমানবে'র জন্য অপেক্ষা করছেন এবং তিনি মনে করেন, মানবতা-বাদীদের দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবই 'গণমুক্তি'-কে ত্বরান্বিত করতে পারে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার উৎস, সাম্রাজ্যবাদীশক্তি, শোষকশ্রেণী, ইতিহাসের বিকৃতি, কিভাবে শ্রেণীস্বার্থে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়ায়—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইসলামের নামে নানা ধরনের ব্যবসা, ধর্মকে ভাষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার, অপসংস্কৃতি, ইয়াংকী কালচার, জাত-পাতের রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর রচনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি, ড. শরীফ ক্রমশ জনগণের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। নৈর্বস্তুক সৌন্দর্যচেতনা

উদ্ভোক্তা ও সমর্থনকারীরা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিচয়ে নিজেদেরকে 'বাঙালী' বা 'বাঙলাদেশী' বলে ঘোষণা করলেও বিদেশে গেলেই নিজেদের জাতীয় পরিচয় হিসেবে 'বাঙলাদেশী'র চেয়ে মুসলিম বলে পরিচয় দিতেই এঁরা সুখ ও স্বস্তি বোধ করেন বেশি।

এ সংকলনে আহমদ শরীফের যেসব প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে, প্রবণতার দিক থেকে বিচার করলে তাকে তিনটি পর্যায়ে ফেলা যায়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা, জাতিবৈর এবং পশ্চিমা উর্দুভাষী সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধিতা করতে গিয়ে ড. শরীফ আর পাঁচজন বাঙালীর মতই মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কারণ, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মনেপ্রাণে কামনা করলেও তিনি তখনকার পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সমর্থন সৃষ্টির একমাত্র এবং তাৎক্ষণিক হাতিয়ার হচ্ছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ। একমাত্র এই মন্ত্রের পতাকাতলে বাঙলাদেশের সমস্ত মানুষ সমবেত হবেন, হয়েছেনও। তিনি তাই সে পরিস্থিতিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বললেও অর্থনৈতিক শোষণ, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, শ্রেণীসম্পর্ক ইত্যাদিকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এবং তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন যে, একদিন বাঙালীরা সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি পরবর্তীকালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় আস্থাশীল হয়েছেন। বিশ্বাস করছেন সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বাঙলার মানুষের একদিন দুর্দিন ঘুচবে। জাতীয়তার প্রসঙ্গে তাঁর মানসপ্রবণতার বিবর্তনটি এভাবে দেখানো যায়:

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ← | বিরোধিতা | → বাঙালী জাতীয়তা

| সপক্ষে | → রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ।

গতিবেগ: ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ → রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র।

এ সংকলনে কেবলমাত্র 'বাঙলা', 'বাঙালী' ও 'বাঙালীত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধসমূহই স্থান পেয়েছে; বিষয় বহির্ভূত অন্য কোন প্রবন্ধ সঙ্গত কারণেই এতে নেই। এর প্রতিটি প্রবন্ধেই আহমদ শরীফের নিজস্ব ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি তথ্যনির্ভর, বিশ্লেষণাত্মক এবং প্রতিবাদী ও সাহসী-মতামত ব্যক্ত করেছেন নির্দ্বিধায়। তাঁর যৌক্তিক তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণের শাণিত তরবারিতে কার মাথা কাটা গেল, কে কতটা ক্ষুন্ন হলো, ধর্ম কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থা কেঁপে উঠলো কিনা এবং তার আশু প্রতিফল তাঁকে পেতে হবে কিনা, তা নিয়ে তিনি বিচলিত হন নি কখনো। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা, আপোসহীনতা, যুক্তিবাদিতা এবং তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে প্রতিবাদী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আর তাই তাঁর 'বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব'-র ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পরিচিতিতেও লক্ষ্য করা যায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী বিশ্লেষণ। বাঙলার নিরন্ন মানুষ, শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসঙ্গতিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ গ্রন্থে। তাঁর বিশ্লেষণের গুণেই, এ-গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে নিরন্ন খেটেখাওয়া পিছিয়ে পড়া বাঙালীর অকথিত ইতিহাস, যার পরিচয় প্রচলিত গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাঙালীর ভৌগোলিকতা, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাঙালীর সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, বিপ্লবী চেতনা ইত্যাদি বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনি এই খেটেখাওয়া নিরন্ন বাঙালী জাতির একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন এ গ্রন্থে। তাঁর এই গ্রন্থের বিন্যস্ত বিষয়গুলি নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা যায় :

১. বাঙালীর দেশ-কালের পরিচিতি, তার বিদ্যাবুদ্ধি, সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে বাঙালীর গৌরব-গর্বের কারণ, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে লেখক আমাদের ধারণা দিয়েছেন।

২. আর্য-গর্ব ও অনার্য-লজ্জা যে অহেতুক এবং স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

৩. আভিজাত্যবোধ কিংবা হীনমন্যতা যে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিকূল, তিনি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৪. গোত্র, শাস্ত্র কিংবা স্থানভিত্তিক মানুষের সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা কি-ভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এবং দুর্বলের ওপর পীড়নের ও অপ্রেমের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তিনি সেকথা ব্যক্ত করেছেন।

৫. বাঙালীর সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে দৈশিক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য,

স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষ বাঙালীর অবদান নয়। বাঙলাদেশেও এর সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রূপ পরিদৃশ্যমান।

৬. বাঙালীর মৌলধর্ম বিশ্লেষণ করে তিনি জীবনের শোষণ-বঞ্চনার বিবর্তন ও ধর্মীয় বাতাবরণের শ্রেণীভেদ নির্দেশ করেছেন।

৭. বাঙালীর মননবৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাঙালীর মুক্তির সন্ধান করেছেন সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আশা প্রকাশ করে বলেছেন, বাঙালীর ঐ প্রত্যাশিত মুক্তিসুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে নিরীশ্বর, নাস্তিক, বিশেষত শাস্ত্রদ্রোহী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদী বাঙালীই।

৮. তিনি গতরখাটা বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বাঙালীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯. 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' এবং 'বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস' তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে।

১০. কোম্পানী আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালীসমাজ কেমন ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক এ গ্রন্থে। প্রতিটি আলোচনা সূত্রেই সমাজ, সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের বঞ্চনা এবং উচ্চকোটির বাঙালী ও সমাজপতিদের শোষণের চিত্র নির্মিত হয়েছে।

১১. আঠার এবং উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে প্রচলিত মতামত ও সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ন করে এক্ষেত্রেও তিনি বেশ কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন।

১২. উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণের যথার্থ মূল্যায়নের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এ গ্রন্থে।

১৩. বঙ্গভঙ্গ কার্যটি যে সম্পন্ন করা হয়েছিল বাঙালী সত্তাকে বিলুপ্ত করে দেবার উদ্দেশ্যেই, তিনি তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এখানে। প্রসঙ্গত বাঙলা ও বাঙালীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রও লেখক তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

১৪. একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে ড. শরীফ বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি ও সেই পটভূমিতে বাঙালীদের সংগ্রামী মানসিকতা, কার্যক্রম, অবদান ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন। আবার এরই পাশাপাশি বাঙালীদের, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মিথ্যে অহমিকার মুখোশ খুলে দিয়েছেন; রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে

তাদের ব্যর্থতার গ্লানিও তুলে ধরেছেন কোন রকম সংকোচের আবরণ না রেখেই।

১৫. সবশেষে তিনি বাঙলাদেশের বাঙালীদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন এঁকেছেন। বাঙলাদেশে বাঙালী বনাম বাঙলাদেশী বিতর্ক এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ধর্মভিত্তিক ইসলামী জাতীয়তাবাদ ফিরিয়ে আনারই ষড়যন্ত্র চলছে, তিনি এ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন; এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও একাত্মতার স্বার্থে সাংস্কৃতিক পরিচয়ে 'বাঙালী' ও রাষ্ট্রিক পরিচয়ে 'বাঙলাদেশী' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই সংকলন-গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি একটানা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে লিখিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তু ও মানসপ্রবণতার নানা গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিন্যস্ত হয়েছে বলেই এতে কালানুক্রমিকতা বজায় রাখা যায়নি। একারণে লেখকের ভাষা ও বাচনভঙ্গির ক্রমোন্নতি, চিন্তার অগ্রগামিতা ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত বলে কিছু কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে ঘুরেফিরেও এসেছে। তবে বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষার খাতিরে, বিন্যাসে একটি ক্রমপরিণতি, বিশেষত জনমানসের সংগ্রামী চেতনার অগ্রগামী গতিবেগের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলি নির্বাচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলাভাষী পাঠককে বাঙালী সত্তার স্বরূপ সন্ধানে সহায়তা করবে এ গ্রন্থ।

সূচী

দেশকাল

আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এদেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনোমানুষ গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিল। বসতি ছিল বিরল। কেননা সেকালে রোগের প্রতিষেধক অজ্ঞাত ছিল বলে নানা ব্যাধিতে মহামারীতে এবং গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লোকক্ষয় হত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত অত্যন্ত মন্থরগতিতে। ফলে গোষ্ঠীর মিলনে গোত্রীয় সমাজ-গঠন বিলম্বিত হয়েছিল। মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ প্রভৃতি গোষ্ঠীয় সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। তাই আমরা 'ঐতরেয় আরণ্যক' (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচশতক) গ্রন্থে 'বঙ্গাঃ' (বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ) এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় গৌড়া', রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ পাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) 'সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ'র উল্লেখ করেছেন। উত্তর ভারতের কোশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (আনুঃ খ্রীঃ প্রথম শতক) 'বঙ্গপাল' নামের রাজার উল্লেখ রয়েছে। মানসোল্লাসে 'গৌড়-বঙ্গাল' নাম মেলে। হাজার বছরের পুরোনো 'চর্যাগীতি'তে বঙ্গালী, বঙ্গাল (দঙ্গাল ?) দেশ-এর উল্লেখ রয়েছে। তার আগেই 'গোত্র'জ্ঞাপক 'গ্রাম' (গাঁই) যে অর্থান্তরলাভ করে নিবাসস্থলরূপে নির্দেশিত হচ্ছিল, তাও নানা সূত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতেই বোঝা যায় খ্রীস্টপূর্ব প্রায় হাজার বছর আগেই ওদের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর জীবন পরিহার করে কৃষিনির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে। প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর মধ্যেই এ তথ্য মেলে।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদির প্রমাণে মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই উত্তর-ভারতীয় আর্যসমাজ এ অঞ্চল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং দাক্ষিণাত্যের মতো এ অঞ্চলকেও অবজ্ঞা ও কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত তারা। 'শতপথ-

ব্রাহ্মণে' পূর্বাঞ্চলের মানুষকে বয়াংসি-ভাষী অসুর (বিকৃত আর্যভাষী 'সুর'-দের বিরোধী দল) এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' পুণ্ড্রদের দস্যু বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

পাণিনি (খ্রীঃ পূঃ ৭ম / ৫ম শতক) তাঁর ভাষাবিজ্ঞানগ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী'তে যে 'গৌড়'-এর উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয়। ওই গৌড় 'গোণ্ড' জাতি বা গোত্রবাচক উত্তর বা মধ্যভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভাবনা। পরবর্তীকালের 'পঞ্চগৌড়' নামই একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। 'রাজতরঙ্গিণী'তেগৌড়, সারস্বতদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে 'পঞ্চগৌড়' বলা হয়েছে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়নও অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ-র উল্লেখ করেছেন। 'বোধায়ন ধর্মসূত্রে'ও (১।২।১৪) পুণ্ড্রের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে 'বঙ্গ'ও উল্লেখিত। রামায়ণে 'বঙ্গ'-এর এবং মহাভারতে বঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির এবং তারও আগের বন্দর 'Portalis' বা পুরস্থলীর (সম্ভবত নদীয়ার কাছে) উল্লেখ পাই রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি-র লেখায়। আচারাঙ্গ সূত্র (আয়ারাঙ্গ সুত্ত) নামের জৈনগ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে। বৌদ্ধ 'মহাবর্গে' (মহাবগ্গে) রাঢ়-এর এবং 'মিলিন্দপঞহো'-য় বঙ্গের আর 'দিব্যাবদানে' পুণ্ড্রের উল্লেখ মেলে। তা ছাড়া 'ললিতবিস্তরে' ও মহাবস্তুতে (মহাবথু) বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। গ্রীক-সূত্রে প্রাপ্ত গঙ্গাহৃদি বা হৃদয় (>গঙ্গারিড্‌ই) সম্ভবত গৌড়-পুণ্ড্রেই বিস্তৃত ছিল।

'পাণ্ডববর্জিত দেশ' বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষ্যার স্বীকৃতির স্বাক্ষর মেলে। প্রমাণে অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মহাবীর স্বয়ং এবং জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড়ে রাঢ়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তার আগে হয়তো পূর্বাঞ্চলীয় কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী নানা কাজে এসে ফিরে গিয়ে সমাজে নিন্দিত হয়েছে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু ব্রাত্যদোষ এড়ানোর প্রয়াসে ব্রাহ্মণ্য সমাজে এ তথ্য অস্বীকৃত রয়েছে। আর্যভাষীর গৌরবগর্বী বহিরাগত এবং আর্যাবর্তে ও ব্রহ্মাবর্তে নিবসিত লোকেরা বহুকাল স্থানীয় অনার্যভাষীদের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলবার প্রয়াসী ছিল—তা আদিশূর সম্পৃক্ত কিংবদন্তি ও বল্লালী কৌলীন্য-চেতনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অতএব জৈন-বৌদ্ধ শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষুরা

মাধ্যমেই উত্তরভারতের শাস্ত্র-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-শাসন, অস্ত্র-বস্ত্র প্রভৃতি জীবন-পদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এদেশীয়দের পরিচয় ঘটে। এভাবে এদের জীবন-জীবিকার আর্যায়ণ সম্ভব হয়। মৌর্য আমলে এ আর্যায়ণ হয়তো গৌড়ে, রাঢ়ে, পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্তযুগে তা কলিঙ্গে, সুহ্মে, বঙ্গে, সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে তথা আধুনিক ওড়িশা বাঙলা অসম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল—যদিও শিশুনাগ, মৌর্য, কাম্ব, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল বা সেন—কোন শাসনই সমগ্র বঙ্গে চালু ছিল না। এদের মধ্যে কোন কোন রাজবংশের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, ও ওদন্তপুরীভুক্তি। মধ্যযুগপূর্ব বঙ্গের স্থিতি ঠিক এখনকার কোন্ অঞ্চল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না। তবে মহাভারত-বর্ণিত ভীমের 'লোহিত্য' নদই ছিল বিজয়সীমা। বঙ্গ লোহিত্যের তীরসীমায় অবস্থিত থাকার কথা। কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায় রঘু 'সুহ্ম' জয় করেই 'বঙ্গ' জয় করেন। গঙ্গার বঙ্গীয় নাম ভাগীরথী ও পদ্মা। অতএব ভাগীরথীতীরে সুহ্ম এবং পদ্মাতীরে 'বঙ্গ' অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা চলে। বখতিয়ার খালজি জয় করেন লাখনৌতি-গৌড়। এবং বঙ্গ ও কামরূপ তখনো ছিল অবিজিত। গিয়াস-উদ্দীন ইওয়াজ খালজির পরবর্তী শাসকগণ বঙ্গ-কামরূপ জয়ে প্রয়াসী ছিলেন। এতে বোঝা যায় 'বঙ্গ' একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কামরূপ ও সমতটের মতো।

চর্যাপদে বঙ্গাল-বঙ্গালী নাম মিললেও, 'বঙ্গ'-এর পরিবর্তে 'বঙ্গালা' ব্যবহৃত হয় ইবন বতুতার বৃত্তান্তে। মিনহাজ সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন 'বঙ্গালা' 'বঙ্গ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন দেখতে পাই। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বয়ং 'শাহ-ই-বঙ্গালা' নাম গ্রহণ করেই ১৩৩৮ সনে গৌড়-সিংহাসনে বসেন। তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মুঘল আমলে এক বিস্তৃত পূর্ব-দক্ষিণ-অঞ্চলীয় ভূখণ্ড 'সুবাহ্ বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত ছিল। আমরা জানি শাহজাহান-আওরঙজীবের আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি বাঙলা-বিহার-ওড়িশা নিয়েই ছিল সে 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালা' বা ব্রিটিশের 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'; তবু উনিশ শতক অবধি 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে দু'ভাগে নির্দেশিত হত এ বৃহৎ অঞ্চলটি। তুর্কীপূর্বকালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র (বগুড়া থেকে মিথিলা অবধি), বরেন্দ্র, বঙ্গ বঙ্গাল, সমতট এবং হরিখেল ও কামরূপ (অসম) নামে

পরিচিত হত বিভিন্ন অঞ্চল। এবং স্বাধীন শাসক বা সামন্তের রাজ্যসীমানুসারে এসব এলাকার পরিসরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। আশ্চর্য, চিরকালের অবজ্ঞেয় বঙ্গ-বঙ্গাল-বাঙলা শেষ অবধি গোটা অঞ্চলের মাটির ও মানুষের নামের ও পরিচয় ভিত্তি ও অবলম্বন হল। এটি পর্তুগীজ বেঙ্গলা ও ইংরেজী 'বেঙ্গল'-এরই জনপ্রিয়তার এবং বহুল প্রচারের ফল। রামমোহন রায়ের বা মধুসূদন দত্তের 'গৌড়' এভাবে হল বিলুপ্ত। মোটামুটিভাবে গৌড়—রাজশাহী, মালদহ, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, রাঢ়—বর্ধমান বিভাগ, সুহ্ম—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, পুণ্ড্র-বরেন্দ্র—বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, মিথিলা। বঙ্গ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, সমতট—কুমিল্লা, নোয়াখালি, হরিখেল <অরিক্রীড়া (ক্ষেত্র)—চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। বঙ্গাল-সোমদ্বীপ>চন্দ্রদ্বীপ, সন্দীপ (বাকলা শহর-বরিশাল) আর তাম্রলিপ্তি তমলুক ছিল বলে মনে করা চলে। সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশী-বিজাতি-বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই। কাজেই তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্যরকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-প্রসূত।

বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা যেমন-তেমন কাঠামো হয়তো খাড়া করা আজকাল আর শক্ত নয়। সে ইতিহাসও অবশ্যই কোথাও ছায়া, কোথাও কঙ্কাল, কোথাও বা বিবর্ণ কায়ার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং তা কখনো একালীন সর্ববঙ্গীয়ও নয়। বস্তুত ব্রিটিশ-পূর্বকালে আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল বলে প্রমাণ নেই। কাজেই বাঙলার সার্বিক ইতিহাসের ধারণা কল্পনা-সম্ভব—বাস্তব নয়। আমরা যখন বাঙলার আদি ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা আবেগবশে সত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা, জানা তথ্য আমাদের সে অধিকার দেয় না। পূর্বে যেমন রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিখেল প্রভৃতি নামে বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত ছিল, কোন একক নামে বা একক শাসনে গোটা আধুনিক বাঙলা কখনো অভিহিত বা প্রশাসিত ছিল না, তেমনি তুর্কী আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি 'সুবাহ্ বাঙলা'র প্রায়ই অপরিহার্য অঙ্গরূপে থাকত বিহার-ওড়িশাও। জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচার সূত্রেই উত্তরভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণ-পূর্বদেশের যে যোগ ও পরিচয় তা আজকাল অস্বীকৃত নয়, এবং বৌদ্ধ মতের সঙ্গে আসে বৌদ্ধ মৌর্য শাসন। কিন্তু তা যে বিহার-সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমিত ছিল, তাও বিতর্কের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। এভাবে মৌর্য-কাণ্ব-শুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল শাসন-শোষণের খবর আমরা পাই বটে; কিন্তু তুর্কী-মুঘলপূর্বকালের শাসকরা রাঢ় সুহ্ম-গৌড়-পুণ্ড্রের কোথায় কতটুকু শাসনে রেখেছিল, তা আজো অনির্ণীত। আর বঙ্গ-সমতট-হরিখেলে দেব-বর্মণ-চন্দ্র-খড়্গ রাজাদের কথা শোনা যায় বটে; কিন্তু কারো রাজ্যসীমা জানা নেই।

অতএব, তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বাবধি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসও কখনো নামসার, কখনো বা কঙ্কালসার। এই রাজারা কি দেশী? মৌর্য-কাণ্ব-শুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেনেরা ছিলেন বিদেশী। গঙ্গারিডই রাজ কি স্থানীয়? উত্তর মেলে না। পাল রাজত্বের উদ্ভব ও বিনাশ মগধেই, বাঙলার সবটুকু তাদের অধিকারে আসেনি কখনো। শশাঙ্ক নাকি বাঙালী—তিনি কি গৌড়ী না রাঢ়ী? ইতিহাস নীরব। কেবল দিব্য-রুদ্রক-ভীমেরই সঠিক ঠিকানা মেলে। বর্মণরা যদি

অসমীয়া হন, চন্দ্ররা আরাকানী, খড়্গরা নেপালী আর দেবরা যদি কোচ হন, তা হলে ?

অতএব, বাঙলাদেশের রাজার এবং বাঙালীর ইতিহাস অভিন্ন নয়। বাঙালীর দুর্ভাগ্য বাঙালী ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি শাসিত। ফলে বাঙলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বিবর্ণ খবর ইতিহাস বহন করলেও তাতে বাঙালী তার স্বরূপে অনুপস্থিত। কাজেই বাঙালীর ইতিহাস নেই। বাঙালীর ইতিহাস আজো বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত। আমরা জানি কোন জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠী-সমষ্টি একচ্ছত্র শাসনে না থাকলে তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষিক, শাস্ত্রিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাভিত্তিক জাতিসত্তাবোধ জাগে না। আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল ব্রিটিশপূর্বকালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না, অঞ্চলটিও ছিল না একক নামে পরিচিত। তাই ভাষিক ঐক্যও হয়েছিল ব্যাহত। একচ্ছত্র শাসনে থাকলে এবং অঞ্চল-সম্ভূত শাসক বংশ থাকলে আঞ্চলিক শাসনে প্রাকৃত কিংবা অবহট্‌ঠই হত দরবারী তথা প্রশাসনিক ভাষা। তাহলে আজ আমরা অসম-বাঙলা-ওড়িশা-বিহারে এক অভিন্নভাষী মানুষ পেতাম। বুলিগত তুচ্ছ পার্থক্য নিয়ে তিন-চারটে তথাকথিত স্বতন্ত্র ভাষা এমন কৃত্রিম ব্যবধানের দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারত না। রাজশক্তির লালন পেয়ে মধ্যদেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেনী) ও অবহট্‌ঠ একসময় সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ও সংহতির বাহন হয়েছিল। তেমন ভাগ্য এ অঞ্চলের কোন বুলিরও হতে পারত সীমিত পরিসরে।

অতএব, বহু বহু কাল এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অভিন্ন জাতিসত্তায় সংহত হতে পারেনি। বরং বিভিন্ন বিদেশীর আঞ্চলিক শাসনে ক্লিষ্ট, আত্ম-প্রত্যয়হীন মানুষ আত্মমর্যাদালাভের বিকৃত বাসনায় মিথ্যা পরিচয়ে আত্মতুষ্টির যে পথ অবলম্বন করেছিল তা পরিণামে আত্মহননের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, এতে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। ঐ বৈনাশিক সংস্কারের প্রভাব আজো অম্লান। বাঙালীমাত্রেই তাই সত্য পরিচয় স্বেচ্ছায় পরিহার করে অঙ্গীকৃত সরকার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিকে স্বদেশ এবং শাস্ত্রকার ও শাসকের স্বজাতি বলে জেনে আত্মপ্রবোধ পেতে থাকে। তাই এদেশের বৌদ্ধমাত্রেই ছিল মগধী, ব্রাহ্মণ্যবাদীমাত্রেই আর্যাবর্ত ব্রহ্মাবর্তের আর্য। মুসলিমমাত্রেই আরব-ইরানী কিংবা মধ্য-এশীয়। ফলে আজো শিক্ষিত অভিজাত

বাঙালীমাত্রেই চেতনায় প্রবাসী ও বিদেশীয় জাতিস্মগর্বী, তাই ভিন্নমতের প্রতিবেশীমাত্রেই পর।

দু'হাজার বছর ধরে এ সংস্কার লালন পেয়ে পেয়ে এমন গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে যে, আজকের বিদ্বানেরাও নিজেদের অস্ট্রিক-মঙ্গোলাদির রক্তসঙ্কর সন্তান বলে মুখে স্বীকার করেও মনে মানেন না। তথ্যপ্রসূত জ্ঞান এভাবেই সংস্কারজাত অনুভবের মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। গোড়ার দিকের উত্তর-ভারতীয় ভাষা-ধর্ম-শাসন-সংস্কৃতির ঋণ বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি চিরতরে বিলোপ করেছে। এর ফলে সে আর কখনো স্বমেরুতে স্থির হয়ে, আত্মপ্রত্যয়ে প্রবল হয়ে রাজনৈতিক কিংবা বৈষয়িক জীবনে স্বতন্ত্র, স্বনির্ভর কিংবা স্বাধীন হবার সাহস পায়নি। তার জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আজো তাই পরাশ্রিত ও পরপ্রভাবিত। আজো হিন্দুমন ঘুরে বেড়ায় আর্যাবর্তে, ব্রহ্মাবর্তে, রাজস্থানে ও হিমালয়ের কন্দরে। মুসলিম বিচরণ করে ষোলশতক-পূর্ব উত্তর আফ্রিকায়, আরবে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীর শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের মানস-উদ্ভূত। কিংবা হিন্দু-মুসলিম বিবাদ-বিদ্বেষও ছিল দেশাগত বিদেশীর মধ্যে সীমিত। এরা প্রলুব্ধ করে সরল দেশী লোককেও হয়তো দলে ভেড়াত। আশার কথা, এ হচ্ছে আত্মবিস্মৃত বিকৃতরুচি নীলরক্তলোভী সংস্কৃতিলিপ্সু শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-চেতনা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক সামান্য। সমাজের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এদের হাতে বলেই আজো বিভ্রান্ত বাঙালী বিপথে চালিত। এদের এখনো স্বস্থ ও সুস্থ করা সম্ভব। তার জন্যে বাঙালীর সত্যকার ইতিহাস জানা ও জানানো দরকার। পরশাসিত বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নেই মেনে নিলে বাঙালীর ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য নয়। বাঙালীর চিন্তার চেতনার ও কৃতির ইতিহাসের উপকরণ আজো বিলুপ্ত হয়নি। আমরা জানি ঘটনার সুবিন্যাস ইতিহাস নয়, চেতনার অনুসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস। কারণ মন ও মননই মানুষের কর্মে ও আচরণে অভিব্যক্তি পায়। ইতিহাসের লক্ষ্য সামষ্টিক মনের ও মননের সামাজীকৃত অভিব্যক্তির স্থানিক ও কালিক আবর্তন-বিবর্তন কিংবা অনুবর্তনের ধারায় অনুধাবন ও বিশ্লেষণ।

অস্ট্রিক-মঙ্গোল রক্তসঙ্কর বাঙালী উত্তর-ভারতীয় ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি ও শাসন গ্রহণ করে বাহ্যত আর্যীকৃত হলেও, সে তার মানস স্বাতন্ত্র্য কখনো হারায়নি।

তার সাংখ্য-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র সে প্রায় সর্বভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকেও সে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। মহাযান বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান তন্ত্রযান ও সহজযান তারই প্রসূন, বৌদ্ধ চৈত্য যেমন দেবতা-উপদেবতায় আকীর্ণ হয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধ শাস্ত্রও বজ্রতারা তত্ত্বে, প্রজ্ঞা উপায় তত্ত্বে, অবলোকিতেশ্বর তত্ত্বে ও দেহতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। বেদ-উপনিষদ-গীতা-স্মৃতি-শাসিত ব্রাহ্মণ্য মত এখানে জীবন-জীবিকার অরি ও মিত্র দেবতার লীলানুধ্যানে অবসিত হয়েছিল, ইসলামও পেয়েছিল যোগে দেহাত্মতত্ত্বে ও অদ্বৈতবাদে নবরূপ। বাঙালীর মানস রূপের—চিত্তবৃত্তির তথা জীবনদৃষ্টির ও জগৎ-চেতনার প্রবহমাণ স্বরূপ জানা যাবে তার জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত দেবতা সৃষ্টিতে ও স্বকীয় স্বতন্ত্র জীবনচর্চায় ও জীবনাচরণে। বৌদ্ধ যুগে যেমন সে-স্বাতন্ত্র্যের অবাধ প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি মধ্যযুগে স্বাধীন সুলতানী আমলে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র সমাজ ও সরকারের রক্তচক্ষুর ভীতিমুক্ত বাঙালী জীবনে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুগত্যের মৌখিক অঙ্গীকারের আবরণে সে তার সৃষ্ট আদি দেবতাদের মাহাত্ম্য-মহিমা দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। বাঙালীর স্বশাস্ত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কারু-দারু-চারুশিল্পে, পটে ভাস্কর্যে তত্ত্বচিন্তায় বাঙালী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনার ও জীবনযাত্রার পরিচয় তাই কোন কালেই গুহায়িত ছিল না। আবার বৈষ্ণবে বাউলে ব্রাহ্মে ও সুফীবাদে পীরবাদে তার প্রকাশ ঘটেছে কালান্তরে। যেমন তুর্কী বিজয়ের পরে তেরো-চৌদ্দ-পনেরো শতকে গোটা ভারতেই নিম্নবিত্তের বা নিম্নবর্ণের মধ্যে মুক্তিতৃষ্ণা জেগেছিল, সন্তধর্মে যার প্রকাশ ও সাফল্য। বাঙালীর ইতিহাস এইসব তত্ত্বের ও কৃতির ধারাবাহিক সুবিন্যাসেই হবে রচিত। শাসকদের স্বার্থে তাদের ভাষা, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি বাঙালীর ওপর চাপানোর অভিসন্ধিপ্রসূত প্রয়াসের যে-সব ইতিকথা ও তথ্য বাঙলার প্রচলিত ইতিহাসে আর্যত্বগর্বী বিদ্বানেরা সগৌরবে বর্ণনা করেন, তা বাঙালীর জীবন ও মনন-সম্পৃক্ত নয়।

লোকশ্রুতির কোন আদিশূর কিংবা বল্লালসেন কাদের স্বার্থে আর্য কৌলীন্য সৃষ্টির অজুহাতে আর্য উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসী হলেন, কিংবা লোকায়ত ধর্মাচারে ব্রাহ্মণ্য পার্বণিক শাস্ত্রাচার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কোন অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল ছিল—তা আজ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যাচাই করতে হবে। বঙ্গে স্থিত উত্তর-ভারতীয় আর্যদের ও তাদের জ্ঞাতিদের চোখে অস্পৃশ্য হাড়ি ডোম বাগদী জেলে

জোলা কিংবা ম্লেচ্ছ নেড়ে ছিল কারা, বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে নব্যব্রাহ্মণ্য সমাজে কৃত্রিম বর্ণবিন্যাস কাদের স্বার্থে কারা করল, উচ্চবর্ণে ও বিত্তে অধিকারই বা পেল কারা, তার হিসেব নিতে হবে, নইলে বাঙালীর ইতিহাস অস্পষ্টই থেকে যাবে। বস্তুত বাঙালীর ইতিহাস লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোক-সাহিত্যের, লোকশিল্পের, লোকসঙ্গীতের ও লোকবিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম।

বাঙালীর ইতিহাস, বাঙলার জাতীয় ইতিহাস, বাঙলার সংস্কৃতি-কুলজী-কুল-পঞ্জী প্রভৃতি নামে যে-সব গ্রন্থ রয়েছে, তাতে বিদেশী শাসক এবং বিদেশীয় শাস্ত্র ও সমাজ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অস্পৃশ্য বলে অবহেলিত খাঁটি বাঙালীর জীবনযাত্রার রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা তার শতাংশের একাংশও নেই। ইসলাম ও বৈষ্ণব মতবাদ বাঙলায় মধ্যযুগেও একবার বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও আভিজাত্যবোধ বিলোপ করে নির্বিশেষ বাঙালী সমাজ গড়ার সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিহারে আজো কুলবাচিবিহীন হিন্দু নাম সুলভ।

বাঙলার ইতিহাসের যে অংশে প্রশাসনিক, স্থাপত্য শিল্প কিংবা সংস্কৃতি শাস্ত্র-সাহিত্য অথবা শিলালেখ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, সে অংশ বাঙলা বা বাঙালীর ইতিহাস নয়, তা শাসক-শোষকের দর্প-দাপটের নিদর্শন মাত্র। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিলবে বাঙালীসৃষ্ট দেবতার মূর্তিশিল্পের ব্যবহার ও ব্যঞ্জনা, দেবমহিমা-মাহাত্ম্য চেতনার বৈচিত্র্য, কামার-কুমোর-তাঁতী-ঘরামি-পটুয়ার কৃৎকৌশলের সঙ্গে রূপচেতনার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভয়মুক্ত বাঙালী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় বিধর্মী তুর্কী শাসনকালে। তাই চৌদ্দ-পনেরো শতকে বাঙালীর চিন্তা-চেতনায়, কর্মে ও আচরণে রেনেসাঁসের আভাস মেলে, তার মর্মের কথা, প্রত্যাশার প্রত্যয়ের কথা প্রকটিত হয় তার নাথসাহিত্যে, তার ধর্মমঙ্গলে, শিবায়নে, মনসার ভাসানে, চণ্ডীর অনুধ্যানে, তার অধ্যাত্মসঙ্গীতে, তার প্রণয়গাথায়, রূপকথায়, উপকথায়, ব্রতকথায় ও জৈব-বাসনার বিচিত্র আচারিক প্রকাশে।

আরো আগে জানতে হবে, শশাঙ্কের শক্তির উৎস কারা, মহাযান কাদের মানস-প্রসূন, মহাযানী দেব প্রতীক, নির্বাণ চেতনা ও জীবনচর্যা কাদের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। বাঙালী জনগোষ্ঠী কাদের কাছে অস্পৃশ্য, কারা করেছিল এদের অন্ত্যজ, তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবর্ত দিব্যের দ্রোহের কারণ। ঐ নির্ধন

বিদ্যকে সার্বভৌম শক্তির আধার পাল সম্রাটের প্রতাপ ও প্রভাব ভেদ করে শির উঁচু করে নির্ভয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা-উত্তেজনা যুগিয়েছিল কোন্ পীড়ন-শোষণ এবং নির্যাতন ; এবং কা'রা হয়েছিল স্বেচ্ছায় তার সহায় ও সহযোগী !

নদী-হাউর-বর্ষা-বহুল প্রত্যন্ত এই দেশ অনভ্যস্ত বিদেশীর পক্ষে কিছুটা দুর্জয় বলে তখনকার শাসকরা কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করেছে বার বার। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে প্রশাসক মনে। কিন্তু সে বাঞ্ছা কি ছিল দেশী লোকেরও ! এসূত্রে এও জানতে হবে তুর্কী আমল থেকে কোম্পানী আমল অবধি বাঙালী সৈনিকরা যে বাঙলায় শাহ্-সামন্তের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে, তার প্রেরণা দেশপ্রেম না পয়সা !

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যে-সব বণিক-পর্যটক-প্রচারক বাঙলাদেশে এসেছে, তারা বাঙালীকে ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, কলহপ্রিয়, দরিদ্র ও চোর বলে জেনেছে। আমরা জানি, বিগত দু'হাজার বছর ধরে বাঙালী ছিল বিদেশী শাসিত ও শোষিত। চিত্তবিকাশের ও আত্মোন্নয়নের কোন সুযোগই মেলেনি তাদের। কেননা, উচ্চপদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্বাধীন জীবিকা সংস্থানে পরাধীন মানুষের কোন অধিকার বা সুযোগ সাধারণত থাকে না। কথায় বলে : 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। দারিদ্র্য মানুষের সব গুণই নষ্ট করে, অঙ্কুরে বিনাশ করে সব সম্ভাবনা। আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সড়ক হয় সংকীর্ণ, জীবন-ভাবনার দিগন্ত ঘরে-গাঁয়ে থাকে সীমিত। অন্নের কাঙাল মানুষে শাস্ত্র-সমাজ সম্পৃক্ত মানবিক চেতনা কিংবা নীতিনিষ্ঠা ও আদর্শবোধ সুদুর্লভ। অন্ন-সন্ধানী মানুষ তাই ছল-চাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। ভীরুতা, স্বার্থ-পরতা, আত্মরতি, হরণ স্পৃহা, নিঃসঙ্গ প্রয়াস, ঈর্ষা, অসূয়া ও কলহপ্রবণতা তার নিত্যসঙ্গী। চিত্ত-বিকৃতির মৌল কারণ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধিকার-লাভের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগের অনুপস্থিতি।

এমনি পরিবেশে কারণ-ক্রিয়াবোধের অভাবে কিছু-সংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবহিতকামী মানুষের মনে তত্ত্বচিন্তা ও মানবহিতৈষণা জাগে, তাঁরাই হন বিষয়বিরাগী, সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ফকির-দরবেশ এবং শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারক। নীতিকথা ও আপ্তবাক্য শুনিয়ে, ন্যায়বোধ ও আদর্শবোধ জাগিয়ে তাঁরা ব্যক্তিকে অনীহ ও সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে চান। প্রাণের ভিত্তি অন্ন, মনের খাদ্য আনন্দ তাঁদের চেতনায় গুরুত্বহীন। অথচ মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার

ও বিকাশের জন্যে ন্যূনতম আর্থিক সাচ্ছল্য আবশ্যিক। অধিকাংশ বাঙালীর তা কখনো ছিল না।

তাই বোধ হয় বিগত দুই হাজার বছর ধরে বাঙালী জীবনে ও মননে ভোগ ও বৈরাগ্য—এই দুটোরই দ্বান্দ্বিক অবস্থান দেখতে পাই। অক্ষমের ভোগলিপ্সা তাদের যেমন দুষ্ট করেছে, তেমনি বৈরাগ্য নষ্ট করেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা। অসহায় ভোগলিপ্সুরা হয়েছে বিভিন্ন শক্তি ও নিরাপত্তা প্রতীক দেবতা-স্রষ্টা ও দৈবনির্ভর, আর আত্মপ্রত্যয়হীন দরিদ্র মানুষ পার্থিব বঞ্চনা-মুক্তির প্রয়াসে আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তি, প্রবোধ ও প্রশান্তি সন্ধান করেছে; তাদের অবলম্বন হয়েছে যোগ, তন্ত্র, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বৈরাগ্য। তাদের কাছে দারিদ্র্য ভোগ-বিমুখতা, কর্মভীতি ঔদাসীন্য অক্ষমতা অনাসক্তি আত্মবঞ্চনা সংযম এবং ভীরুতা অনীহারূপে প্রতিভাত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তাই বাঙালীকে রণ-বিমুখরূপে দেখতে পাই: ভঅ ভজ্জিঅ বঙ্গা (ভয়ে বাঙালী ভাগল) বঙ্গলা ভঙ্গল [বাঙালী (রণে) ভঙ্গ দিল]।

আজ লজ্জা ও গৌরবের মধ্যে, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে, দৌর্বল্য ও সাফল্যের মধ্যে, বিকাশ ও বিকৃতির মধ্যে, আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে, সম্পদ ও সংকটের মধ্যে, ভয় ও সাহসের মধ্যে, সামর্থ্য ও অক্ষমতার মধ্যে নিজেদের স্বরূপ জানতে হবে, তবেই আত্মোপলব্ধি হবে সম্ভব। আত্মশক্তি ও সামর্থ্য এবং আত্মত্রুটি ও দুর্বলতা সমভাবে জানা না থাকলে বিপদ ও ব্যর্থতা বাড়ে, পর-প্রতারণায় আপাতলাভ থাকলেও আত্মপ্রতারণা মরণফাঁদ বই নয়। কোন জ্ঞানই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না, তাই জ্ঞানই শক্তি। আত্মজ্ঞান ফিরে পেলে জাতীয় জীবনে অনেক বিপদ-সংকট উত্তরণ সম্ভব হবে।

বাঙলা ও বাঙালী

মা জন্ম দেয়, মাটি লালন করে।

তাই দেশের মাটিকে মায়ের মতোই ভালবাসতে হয়। একসময় মায়ের প্রয়োজন ফুরায়। কিন্তু মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মানুষের জীবন একাকিত্বে সম্ভব নয়, তাই পরিজন-প্রতিবেশী নিয়েই যাপন করতে হয় তার জীবন। এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মিলনে, সহযোগিতায় ও বিরোধেই তার জীবনের বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব। অতএব চেতনার গভীরে দেশের মাটি ও মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা।

দেশের মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা থাকলেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠাও হয় সহজ। কেননা জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই কেবল স্বদেশের মাটির জল ও বায়ু, দোষ ও গুণ এবং স্বদেশী মানুষের মন ও মেজাজ, যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সম্পদ, ভয় ও ভরসার কথা জানা যায়।

এই দেশের ও মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা, দোষ ও গুণ, ভয় ও ভরসা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বন্দ্ব ও মিলন, আশা ও নৈরাশ্য, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগ্লানি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরতি, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সংগ্রাম ও পরবশ্যতা প্রভৃতির ইতিকথাই স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের তথা স্বরূপের অভিজ্ঞান।

বাংলার রাঢ়-বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাঙলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সেখান থেকেই নানা পথ ঘুরে আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক-মঙ্গোল। এরাই অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুন, কুশান, গ্রীক, মঙ্গোল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের গায়ে আর্য-রক্ত সামান্য, নিগ্রো-রক্ত কম নয়, তবে বেশী আছে দ্রাবিড় ও মঙ্গোল রক্ত, অর্থাৎ আমাদেরই নিকট-জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, তিব্বতী, কাছাড়ী,

অহোম প্রভৃতি।

এদেশে যারা বাস করত তারা ছিল আধা-বর্বর। এদের নিকট-জ্ঞাতি নেপালী-বিহারীরা বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজ বরণ করে। কিন্তু পীড়ন-শোষণ অসহ্য হওয়ায় যাদের দোহাই পেড়ে নির্যাতন চালানো হত, সেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে ওঠে তারা। যুগে যুগে নেতৃত্ব দেন আজীবক, তীর্থঙ্কর ও বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যাত বহু নেতা। অবশেষে দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে পীড়নমুক্ত হল তারা।

এই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণের মাধ্যমেই বাঙালীরা উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, সমাজ ও নীতি বরণ করে সভ্য হয়ে ওঠে। তাই কিছু প্রাচীন শব্দ, কিছু বাক্‌-রীতি, কিছু আচার-সংস্কার ছাড়া বাঙালীর বহিরাঙ্গিক অন্য স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য।

এভাবে যুগে যুগে বাঙালীর ধর্ম, সমাজনীতি, পোশাক, প্রশাসনিক বিধি প্রভৃতি আচারিক ও আদর্শিক জীবনের প্রায় সব-কিছুই এসেছে বিদেশী, বিজাতি ও বিভাষী থেকে।

তবু বাঙালীর চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনো অবলুপ্ত হয়নি এবং তা একাধারে লজ্জার ও গৌরবের।

বাঙালী চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাঙ্ক-নরেন্দ্র-গুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দীন ছাড়া বাঙলার কোন শাসকই বাঙালী ছিলেন না। এটি নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙালী চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর গূঢ় কারণ।

যে ভোগেচ্ছু অথচ কর্মকুণ্ঠ, তার জীবিকার্জনের দুটো পথ—ভিক্ষা ও চৌর্য। বাঙালীর এই কাঙালপনার পরিচয় রয়েছে তার স্ব-সৃষ্ট উপদেবতা-অপদেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-কবচ-মাদুলি প্রীতিতে। আপাতসুখ ও আত্মরতি তাকে করেছে স্বার্থপর, ধূর্ত ও লোভী। তাই সে যৌথ কর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালীর স্থায়ী কলঙ্কের কথা।

কিন্তু তার গৌরব-গর্বের বিষয়ও কম নেই। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু

স্বার্থ-বোধ না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। তার স্ব-সৃষ্ট উপ- ও অপ-দেবতার। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় মতবাদ ও আচার-আচরণ বিধি। বৌদ্ধ যুগে বাঙালীর কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান; ব্রাহ্মণ্য সমাজে বাঙালীর লৌকিক দেবতা-নিষ্ঠা, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, চৈতন্যের প্রেমবাদ; মুসলিম সমাজে সত্যপীরবাদ, যৌগিক-সূফী তত্ত্ব, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মমত তার সাক্ষ্য।

এভাবে দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালীর স্বাধীনতাপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও সজ্ঘশক্তির সাক্ষ্য নগণ্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্ত্যপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহুত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে, সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সহধর্মিতার বন্ধনকে।

যখন সে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তখনো কৌমচেতনা ছিল প্রবল এবং সম্ভবত বৌদ্ধ-মৌর্য শাসনেও তার বিচলন ঘটেনি। ব্রাহ্মণ্য গুপ্ত শাসনেই বৃত্তিগত বিভাগ বর্ণবিভাগে বিকৃত হয়। কেননা সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং বৌদ্ধ পাল আমলের প্রথম যুগে এ চেতনা ম্লান হলেও শেষের দিকে শঙ্করাচার্যের নব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীর বাহুল্যে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ দ্রুত অপসৃত হয়ে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠতে থাকে আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে তা পূর্ণতালাভ করে। এজন্যেই বাঙালীর বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। মোটামুটিভাবে দশ থেকে ষোল শতক অবধি মেল ও পটি বন্ধনের কাজ চলে। বল্লাল চরিত, দৈবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চানন ঘটক ও জাতিমালা কাছারী তার সাক্ষ্য। এমনি করে নির্বর্ণ বৌদ্ধ সমাজ থেকে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠে। ফলে এখানকার হিন্দু-মুসলমান কারো জাত-বর্ণ পরিচয় সন্দেহাতীতরূপে যথার্থ নয়। বিশেষ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো-মঙ্গোল কারো মধ্যেই যখন বর্ণবিভাগ ছিল না, তখন এ যে আরোপিত ও অর্বাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীনকালে এখানে লোকসংখ্যা ছিল কম, গোত্রে বিভক্ত কৌমের নিবাস

ছিল অঞ্চলে সীমিত। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষার পরেই তারা গৌত্রিক গ্রাম থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাদেশিকতা নিতান্ত আধুনিক চেতনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাবিক ঐক্যের ফলে তারা স্থানিক ঐক্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু দেশগত জীবন-চেতনা ছিল অনুপস্থিত। তাই বাঙালী হিন্দু ছিল উত্তর-ভারতীয় আর্যত্ব-গৌরবে এবং রাজপুত-মারাঠার ঐতিহ্য-গর্বে স্ফীত। আর মুসলমান ছিল আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্বমোহে ও গৌরবে অভিভূত। ইদানীং-পূর্ব যুগে কেউ সুস্থ ও স্বস্থ ছিল না। স্বদেশে প্রবাসী এই বাঙালীর রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার ও স্বাদেশিক কর্তব্যবুদ্ধির বিরলতার কারণ এই।

আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে : মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালী কি স্বাধীন ছিল—সুখী ছিল? স্বাধীন পাল কিংবা সুলতানী আমল কি বাঙালীরও স্বাধীনতার যুগ? বারভুঁইয়ার বিদ্রোহ ও বীরত্ব কি স্বাধীনতাকামী বাঙালীরও সংগ্রাম ও ত্যাগের ঐতিহ্য? জাতীয়তার ভিত্তি হবে কি—গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, দেশ কিংবা রাষ্ট্র?

বাঙলাদেশ কচিৎ একচ্ছত্র শাসনে ছিল। তাই বাঙলাদেশান্তর্গত সব ঐতিহ্যে সর্ব-বাঙালীর অধিকার ছিল না। আঞ্চলিক মন, মনন ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সাহিত্যক্ষেত্রে এ আঞ্চলিকতা বিস্ময়করভাবে সুপ্রকট। যেমন ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে, মনসামঙ্গল হয়েছে পূর্ববঙ্গে, বৈষ্ণব সাহিত্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; বাউল প্রভাব পড়েছে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণকেন্দ্রী উপদেবতার প্রভাব-প্রসার ক্ষেত্র হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ। গীতিকা হয়েছে ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে, মুসলিম-রচিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামে। গাজন, গম্ভীরা, বৈষ্ণবগীতি, বাউলগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতিরও স্থানিক বিকাশ লক্ষণীয়।

দারু, কারু ও চারুশিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাই মসলিন ও শঙ্খশিল্প, সিলেটী গজদন্ত ও বেতশিল্প, নদীয়ার পটশিল্প, রাজশাহী-মালদহ-মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প, পাবনা-টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ- ও দারু-শিল্প স্মর্তব্য।

বাঙালীর লজ্জা ও গৌরবের কিছু ইঙ্গিত দিলাম। কিন্তু বাঙালী যেখানে

স্বকীয় মহিমায় সমুন্নত, যেখানে সে অতুল্য এবং প্রাচ্যদেশে প্রায় অজেয়, তা বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান। তার সাহিত্য ও তার দর্শন তার গৌরবের ও গর্বের এবং অপরের ঈর্ষার বস্তু।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়া এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবু বলা চলে এদেশে রক্ত-সাঙ্কর্য একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছে। তাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও হয়তো নির্ভুল তথ্য মেলা ভার। আনুমানিক তেরো শতকে সংকলিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাঙালীকে বর্ণভেদে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভাজন নৃতাত্ত্বিক নয়—বৃত্তিসম্পৃক্ত সমাজভিত্তিক। এছাড়া আধুনিক কালে রিজলি, রমাপ্রসাদ চন্দ, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ অনেকেই বাঙালীর আঙ্গিক বিচার করেছেন এবং করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট কিংবা চোখ-চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের সাঙ্কর্য কারো কোন লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি। তাই সমস্যা রয়েই গেছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো, আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড) ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মঙ্গোলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসঙ্কর আদি-অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজ-বংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজো, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প-সঙ্কর মঙ্গোলীয়। তাছাড়া কালপ্রবাহে কত কত গৌড়, মালব, চৌড়, খশ, হুন, কুলিক, কর্ণাট, লাট, (মনহলিপট্টোলী—মদনপাল দেব) দ্রাবিড়, মুরণ্ডা, শক, কুশান, ইউচি, আরব, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, আফগান, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ-রক্ত মিশ্রিত তো হয়েইছে। তবে তা পরিমাণে বেশি নয়। পুণ্ড্র, রাঢ়া, বঙ্গা, সুহ্মা নামের অষ্ট্রিক গোত্রগুলোই ছিল ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রধান। অপ্রধানের মধ্যে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডালেরা ছিল নির্জিত।

পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, হরিনন্দনপুরে বা হরিনারায়ণপুরে, চব্বিশ-পরগনার বেড়াচম্পায়, দেগঙ্গায়, কিংবদন্তির চন্দ্রকেতুর গড় প্রভৃতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন-বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও

অন্তত রাঢ় অঞ্চল তিন হাজার বছর আগেও আমাদের চিরকেলে ধারণা মতো বুনো-বর্বরের দেশ ছিল না, যদিও তাদের কোন স্বতন্ত্র ভাষার নমুনা নেই। এদেশে যে উন্নয়নশীল দু'চারটি গোত্র ছিল, তাদের যে বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল সে খবরও মেলে। দু'তিনটে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর উদ্ভবস্থল ও তথা কাহিনীর বর্ণিত ঘটনাও বর্ধমান অঞ্চলের। ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে এদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলেও কোন কোন বিদ্বান অনুমান করেন।

মহাভারতোক্ত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম রাজারা ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষে। কালিদাসের রঘুবংশে নৌযুদ্ধে নিপুণ ও সাহসী বাঙালীদের রঘু পরাস্ত করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে মনে হয় বাঙালীদের গোত্র-রক্ত পরিচয় যা-ই হোক, রাজনীতিতেও তারা পিছিয়ে ছিল না। এ রক্তসঙ্কর বাঙালীর স্বভাব-চরিত্র যেমন অনন্য, তাদের কৃতি-কীর্তিও বিচিত্র।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ধারণায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এইরূপ :

'শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য··· আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্যধারায়, বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব-স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে।'

বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধযান, যোগ, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন ও পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরিদেবতার পূজাপ্রবণতার কারণ এ-ই। ডক্টর রায় তাই বলেন :

'প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমাশিল্পে

ও দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।...সিদ্ধায়া বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই।...অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্মসাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প এবং শিথিল। বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল...বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই।...তখন (মুসলিম বিজয়কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নির্লজ্জ কাম-পরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার—সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মত প্রকট হইয়াছিল।' (বাঙালীর ইতিহাস—আদি পর্ব)।

বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাও কখনো ভালো ছিল না। মিথ্যা কথন, ভীরুতা, মামলা-প্রিয়তা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বাঙালী চরিত্রে ছিল সুলভ।

বাঙালী ভোগলিপ্সু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ বৈষ্ণব মতবাদ বাঙালী চিত্তে কর্মকুণ্ঠা আরো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। বাঙালীচরিত্রে যে একদিকে মিথ্যাভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, ছদ্মবৈরাগ্যভাব, চাতুর্য, সুবিধাবাদ এবং সুযোগসন্ধান, তোয়াজ ও তদ্বির-প্রবণতা প্রভৃতির প্রাবল্য এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবানুগ্রহজীবিতা রয়েছে, তা ঐ কর্মকুণ্ঠারই প্রসূন। তাই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে আমরা বাঙালীকে কেবল তুক-তাক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগ-তন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী-নির্ভর দেখতে পাই। তার সাহিত্যে পাই দেবতার স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তন। তার গানে গাথায় পাই বৈরাগ্যমহিমা ও পারত্রিক-চেতনা। চিরকাল বিদেশী শাসন-শোষণের ফলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ মেলেনি বলেই হয়তো বঞ্চিত দরিদ্রের নিঃস্ব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের এ প্রয়াস, দৈবশক্তির সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও প্রয়োজনপূর্তির এই আগ্রহ এবং বাঁচার তাগিদেই অনন্যোপায় মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি, মিথ্যার আশ্রয় ও প্রতারণার পথ বরণ আবশ্যিক হয়েছে। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মচরিতে বাঙালী মানসের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন, : "বাঙালীরা 'পদ'-কেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আমরা তখ্তের প্রতি বিশ্বস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমরা তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি।"

প্রতীচ্য মানুষ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় বের করেছে। আর আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্য মানুষ অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির এবং জীবনের নিরাপত্তার উপায়সন্ধানী।

প্রাচ্যের এই নিষ্ক্রিয় দলের জীবন-স্বপ্ন মানুষকে করেছে কল্পনাবিলাসী। ভূত-প্রেত-দেও দানব, গন্ধর্ব-পরী-অপ্সরা তাদেরই কল্পলোক-সহচর। মন্ত্রবলে আকাশে উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে অথবা নদ নদী উল্লঙ্ঘনে কিংবা মরু-কান্তার উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পনা ও বাসনার জগতে। রূপ-কথা, উপকথা, ধর্মকথা, পুরাণকথা প্রভৃতি এদেরই সৃষ্টি।

যারা উদ্যমশীল তারা জ্ঞান, বুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তব-ক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে। তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার কৌশল, সাগরতলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ-নিরাময়ের নিদান, কর্মে সাফল্যের ফল এবং অন্যান্য বাঞ্ছাসিদ্ধির সামর্থ্য অর্জনে হয় ব্রতী। এমনি মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে মানুষের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্তু আবিষ্কার ও নির্মাণ। শস্য-উৎপাদন অথবা মৃতে প্রাণসঞ্চার থেকে পারমাণবিক শক্তি সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সবকিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও সাধ।

আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতায় এবং দৈবনির্ভরতায় প্রাচ্য-মানবের পরিচয়। প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তাই বাস্তব; প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, প্রতীচ্যে তাই যান্ত্রিক সম্পদ। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস, আর প্রাচ্য মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তি-লিপ্সা, আজন্মলালিত বিশ্বাস-সংস্কারে নিষ্ঠা, প্রশ্নহীন প্রত্যয় এবং আত্মসামর্থ্যে অনাস্থা। জিজ্ঞাসার ও আকাঙ্ক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও জীবিকায়, মনে ও মননে যে-জীর্ণতা আসে, তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে ব্যক্তির বা সমাজের মুক্তি ঘটে না, তার সাক্ষ্য আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত ও আরণ্য সমাজ।

বাঙালী সত্তার স্বরূপ সন্ধানে

এখনকার দিনে বাংলাভাষী অঞ্চল বহুবিস্তৃত। ওড়িয়া-অসমীয়াকে অন্তর্ভুক্ত করলে গোটা প্রাচ্য-ভারতই বৃহত্তর ও প্রাচীন সংজ্ঞায় অভিন্নভাষী অঞ্চল।

সাম্প্রত-পূর্ব কালে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সামান্য, এবং বহুলাংশে অনুমিত। উত্তর-ভারতীয় আর্যদৃষ্টিতে এরা দাস, দস্যু, অসুর, পক্ষী তথা বর্বর। এদের ভাষা অবোধ্য, সংস্কৃতি ঘৃণ্য, অবয়ব শ্রীহীন।

সাম্প্রতিক গবেষণায় আমাদের এসব ধারণার প্রায় আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। 'বেস্সান্তর জাতক'-এর আলোকে সন্ধান করে জানা গেছে আড়াই হাজার বছর আগেই বৌদ্ধযুগে রাঢ় অঞ্চলে দুটো ক্ষুদ্র সামন্ত বা স্বাধীন রাজ্য ছিল। একটি শিবিরাজ্য—টলেমি বর্ণিত সিব্রিয়াম, অপরটি চেতরাজ্য। শিবিরাজ্য ছিল এখনকার বর্ধমান জেলার অনেকখানি জুড়ে, আর এর রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর (মঙ্গলকোটের নিকটে শিবপুরী)। এর দক্ষিণে ছিল চেতরাজ্য, এর রাজধানী চেতপুরীই সম্ভবত বর্তমান ঘাটাল মহকুমার 'চেতুয়া' এলাকা। দুটি রাজ্যই ছিল কলিঙ্গরাজ্যের সীমান্তে।

এতে বোঝা যায়, মৌর্যবিজয়ের আগেও এ অঞ্চলে সভ্য রাজা, রাজ্য ও প্রশাসন চালু ছিল, অতএব কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যও ছিল। টলেমি প্রমুখ বর্ণিত গঙ্গাহৃদয়কে (গঙ্গারিডই) গঙ্গাতীরস্থ 'রাঢ়' বলে মেনে নিলে বুঝতে হবে আলেকজান্দার-শ্রুত গজারোহী সৈন্যবাহিনী রক্ষিত প্রতাপে প্রবল রাজ্য ছিল এই 'রাঢ়'। আর তাম্রলিপ্তি, পুরস্থল (Portalis), গঙ্গা, সমন্দর প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবন্দরও সুপ্রাচীন।

সভ্য ও সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্যে যে বাঙালীর জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ গ্রহণের কিংবা মৌর্য-শুঙ্গ-কান্ব-গুপ্ত শাসনে থাকার প্রয়োজন ছিল না, বরং উক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি যে বাঙালীর শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও ভাষা বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল, তা বেড়াচম্পায়, হরিনারায়ণপুরে, দেগঙ্গায় চন্দ্রকেতুর গড়ে এবং 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিই (প্রায় দেড় হাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দের) প্রমাণ করেছে। উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র, শাসন এবং সংস্কৃতি বাঙালীকে দু'হাজার বছর ধরে আত্মবিস্মৃত রেখেছে। তাই স্বতন্ত্র সত্তায় পরে আর কোনদিন আত্ম-

প্রকাশের ইচ্ছাও তাদের মনে জাগেনি। বিজাতির শস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি বরণ করে এমনি সত্তা হারিয়েছিল উত্তর আফ্রিকার মিসর-লিবিয়া-মরক্কো-আলজিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া-ব্যাবিলোনিয়া এবং আশশিরিয়া আর ইরান হারিয়েছিল হরফ ও ধর্মমত।

১৯২৮ থেকে ১৯৭০ সন অবধি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নরকঙ্কালাদি নানা প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ফলে এখন প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল বা কাঠামো আভাসিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এখন এরূপ: আদি অস্ট্রিকরাই (আদি অস্ট্রাল) দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা। এরা মূলত ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী। এরা সম্ভবত জলপথে বাঙলায় প্রবেশ করে। অথবা স্থলপথে দক্ষিণ উপকূল হয়ে এসে বাঙলায়-ওড়িশায় এবং ছোটনাগপুর অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। পরে ভূমধ্যসাগরীয় আর এক-দল উপকূলীয় স্থলপথে বা জলপথে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ও বসবাস করে। তারাই দ্রাবিড় (ভেড্ডিড) নামে পরিচিত। তাদেরও কিছু লোক অস্ট্রিকদের সঙ্গে বাস করে। এবং কালে উভয়ের রক্তমিশ্রণ ঘটে। ফলে তাদের অবয়বে ঘুচে যায় এবং মানসে মুছে যায় তাদের গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য। এর পরে আসে হ্রস্বশির আলপাইনীয় আর্যভাষী জনগোষ্ঠী। এরা সম্ভবত জলপথে কেবল প্রাচ্য ভারতেই প্রবেশ করে। তাই বিহারের উত্তরে এদের কোন নিদর্শন মেলে না। এর সমসময়ে বা আরো আগে হিমালয় ও লুসাই পর্বতের মালভূমি-অধিত্যকা অঞ্চলে নেমে আসে বিভিন্ন গোত্রের মঙ্গোল জনগোষ্ঠী। তাদের রক্তও মিশ্রিত হয়েছে এ অঞ্চলের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আলপীয় নরগোষ্ঠীর রক্তের সঙ্গে। পরে আর যে-সব বিজেতা ব্যবসায়ী বা যাযাবর এদেশে এসেছে, তাদের রক্তও এদেশী মানুষের মধ্যে রয়েছে বটে, তবে তা সামান্য ও বিরল, তাই দুর্লক্ষ্য। অবশ্য নিগ্রোরক্তের মিশ্রণের কিছু লক্ষণও কিছু মানুষে দুর্লভ নয়। এবং পরবর্তীকালে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় ঐতিহ্য বা টোটেম পরিচয়ে তারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি গোষ্ঠীনামে অভিহিত হয়। এভাবেই আজকের অসমীয়া-বাঙালী-ওড়িয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বগধ চের প্রভৃতি গাঁই (<গ্রাম), গোত্র এবং অঞ্চলবাচক নামগুলিও এসূত্রে স্মর্তব্য।

চোখ-চুল-চোয়াল ও নাক-মুখ-মাথার গড়ন আর দেহের বর্ণ, রক্ত এবং আকার ধরেই নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী ও পর্যায় নির্ধারণ করা হয়।

১. অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিল রয়েছে বলেই নৃতত্ত্বের পরিভাষায় আমাদের 'অস্ট্রিক' ((Proto-Australoid) বলা হয়। আদি অস্ট্রিকদের দেহ খর্বাকার, মাথা লম্বা ও মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, দেহবর্ণ কালো, মাথার চুল ঢেউ-খেলানো কোঁকড়া।

কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোরওয়া, জুঁয়াঙ, কোরবু প্রভৃতি প্রায়-বিশুদ্ধ অস্ট্রিক এবং এরা আমাদের নিকট-জ্ঞাতি। মুণ্ডা বা মুণ্ডারী ভাষাই আদি অস্ট্রিক ভাষার বিবর্তিত রূপ। অস্ট্রিকরাও মূলত ভূমধ্যসাগরীয় বর্গের নরগোষ্ঠী।

২. ভূমধ্যসাগরীয় অপর বর্গের নরগোষ্ঠী হল দ্রাবিড়রা। এরা 'ভেড্ডিড' নামেও পরিচিত। এরা সম্ভবত স্থলপথে উপকূল ধরে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে। এরা দেহে মধ্যমাকার, এদের মাথা লম্বা, নাক ছোট, দেহবর্ণ শ্যামল।

৩. আলপাইনীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষী ইরান-ভারতের (ইন্দো-ইরানী) নরগোষ্ঠী একই ভাষী বটে, কিন্তু নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় গোত্রে পৃথক। মূলত আলপাইনীয় বা আলপীয় ও ইন্দো-ইরানী-য়ুরোপীয় আর্যভাষীরা রাশিয়ার উরাল মালভূমি এবং দক্ষিণের সমতলভূমি থেকে দানিয়ুব নদীর উপত্যকা অবধি ছড়িয়ে বাস করত, তাদের মধ্যে তাই স্থানিক ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বিদ্বানদের মতে 'আর্য' নামটি তাই ভাষাজ্ঞাপক—'জাতি'বাচক নয়। আলপ্‌স পার্বত্য অঞ্চলে যে-দল ছড়িয়ে পড়ে তারা আলপীয়, আর যারা পশ্চিম য়ুরোপে, মধ্য-এশিয়ায়, ইরানে ও ভারতে প্রবেশ করে তারা সম্ভবত অভিন্ন-বর্গের নরগোষ্ঠী। তারা 'নর্ডিক' বর্গের নরগোষ্ঠী বলে পরিচিত। আলপীয়রা ছিল কৃষিজীবী আর নর্ডিকরা বহুকাল ধরে ছিল যাযাবর এবং পশুজীবী। আলপীয় আর্যরা হ্রস্বশির, মধ্যমাকার, মাথার খুলি ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল, দেহবর্ণ গৌর। আলপীয়রা পরে এশিয়া মাইনর হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা অঞ্চলে এবং পূর্ব উপকূল ধরে বাঙলা-ওড়িশায় বাস করে।

৪. মঙ্গোলীয় বর্গের লোকেরা সাধারণভাবে লেপচা, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজঙ, মুরঙ, মেচ, খাসিয়া, মঘ, ত্রিপুরা, মিজো, মার্মা প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রীয় নামে পরিচিত। দুনিয়ায় এককভাবে মঙ্গোলীয় বর্গের লোকের সংখ্যাই অধিক। জাপান থেকে মধ্য-এশিয়া ও রাশিয়া অবধি অঞ্চলে এদের বাস। রক্ত-মিশ্রণের ফলে নৃতত্ত্বের একক মাপে অবশ্য এখন তাদের চিহ্নিত করা যায় না। সাধারণ-

ভাবে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মাথা গোল, চুল কালো ও ঋজু, মাথায় খুলির পিছনের অংশ স্ফীত, গাত্রবর্ণ পীত, ঈষৎ ও ঘন পিঙ্গল, ভ্রূ অস্বচ্ছ, মুখাবয়ব ছোট বা স্বল্পপরিসর, চিবুকের হাড় উঁচু, নাকের গড়ন মাঝারি এবং চ্যাপ্টা, মুখে ও দেহে লোম স্বল্প, চোখের খোল বাঁকা এবং দেহ মধ্যমাকার।

৫. নর্ডিক আর্যরা সাধারণভাবে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ (লম্বা) ও সরুনাসা, দীর্ঘ (লম্বা) শির বা দীর্ঘ কপাল, দেহ দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ।

নর্ডিক আর্যরা প্রাচীনকালে গ্রীসে, ইরানে ও ভারতে এবং এ-যুগে য়ুরোপে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে ও কৃৎকৌশলে প্রাধান্য পাওয়ায় দুনিয়ার তাবৎ জাতির ঈর্ষার পাত্র। এজন্যে এশিয়ার এবং য়ুরোপের অনার্য বর্গের লোকদের 'আর্য' পরিচয়ের গৌরবলাভের লোভও প্রবল। তাই কিছু কথা বলতে হয়।

আসলে মিসরীয়, আশশিরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধুদেশীয় কিংবা চৈনিক সভ্যতার কালে আর্যরা ছিল বর্বর ও যাযাবর। উরাল ও দানিয়ুব অঞ্চলে বাসকালে তারা ছিল অন্য বর্বরদের মতো নরমাংসভোজী, পরে অশ্ব, তার পরে ষাঁড়, গাভী, মহিষ, তার পরে মেষ এবং তারও পরে তারা অজভোজী হয়। নরমেধ, অশ্বমেধ, বলিবর্দমেধ, মেষমেধ ও অজমেধ অবধি নীতি ও নিয়ম পরিবর্তিত হতে সমাজ বিবর্তনের ধারায় সময় লেগেছে নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বছর। তার প্রমাণ ভারতেও বৈদিক সাহিত্যে ঋচীক-পুত্র শুনঃশেপের, কর্ণের, শিবিরাজা প্রভৃতির গল্পে অতিথির ভোজনার্থে পুত্র বা নরবলিদানের কাহিনী রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে ভূতসিদ্ধির ('অতিষ্ঠা') জন্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা নরমেধ যজ্ঞ করত বলে বর্ণিত রয়েছে। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র ও যযাতি এ যজ্ঞ করেছিলেন। এসব নরমেধ বা প্রাণিমেধ যজ্ঞ প্রজনন এবং সন্তান-সম্পদকামী সমাজের আদিম যাদুবিশ্বাস যুগের স্মারক।

পশুজীবী বলে তারা ছিল আরণ্যক ও যাযাবর এবং নগর-সভ্যতার শত্রু। নর্ডিক আর্যরা নগর-সভ্যতা বিনাশে ছিল উৎসাহী। তাদের আদি নিবাস থেকে তারা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা উন্নততর সভ্যতা ও নগর ধ্বংস করেই, সম্পদ লুট করেই পেয়েছে স্বস্তি। যাযাবর বলেই ওরা লুণ্ঠন করে সম্পদ অর্জনে ছিল উৎসাহী। কেননা যাযাবরের পক্ষে লুণ্ঠনই ছিল ধনপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এখানে অন্ন ও সম্পদের দেবতা বৈদিক ইন্দ্রের লুণ্ঠনকাহিনী স্মর্তব্য। ভারতেও আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা তথা মহেনজোদারো-হরপ্পা নগর (লোথাল ও

কালিবঙ্গনও) ধ্বংস করেছিল। অবশ্য ধ্বংস করেও বর্বর ও যাযাবর আর্য ঐ সভ্যতার প্রভাব এড়াতে পারেনি, বরং শাস্ত্রের, সমাজের এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐ প্রভাব গ্রহণ করেই হয়েছিল কৃষিজীবী ও স্থিতিশীল এবং নগর-সভ্যতার ধারক। চলমান জীবনে যাযাবরের মানস বা ব্যবহারিক সভ্যতার বিকাশ বাস্তব কারণেই হতে পারে না। স্থায়িনিবাসী ও কৃষিজীবী হওয়ার আগে তাই আর্যরা কোথাও উল্লেখযোগ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টা ছিল না। আসলে আমরা যাকে বৈদিক আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বলি, তার চৌদ্দ আনাই আর্যপূর্ব দেশী জনগোষ্ঠীর অবদান। শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, নারী, বৃক্ষ, পশু এবং পাখি দেবতা, মূর্তি-পূজা, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, ভক্তিবাদ, অবতারবাদ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নবীবাদ স্মর্তব্য), জন্মান্তরবাদ, প্রেতলোক, ঔপনিষদিক তত্ত্ব বা দর্শন, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য সবটাই দেশী। যাযাবর আর্যের স্থাপত্য-ভাস্কর্য জানা থাকার কথা নয়। ইরানের নর্ডিক আর্যরাও ইলামী, আশশিরীয়, সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় প্রভাব স্বীকার করেই হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত।

প্রাচীন বাঙলার নিষাদরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আর কিরাতরা ছিল মঙ্গোল। বাঙলার দেশজ মুসলমানরা এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকগুলি (তফসীলী) অস্ট্রিক-দ্রাবিড়। আর সম্ভবত উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে আলপীয় রক্ত বেশী।

নর্ডিক আর্যরক্তের মানুষ বাঙলায় বিরল—নেই বললেই চলে। নর্ডিক আর্য-রক্ত বাঙলায় বিরল বটে, তবে নর্ডিক আর্যশাখার বৈদিক আর্যদের শাস্ত্র, সমাজ-সংস্কৃতি (জৈন-বৌদ্ধ-সহ) দু'হাজার বছর ধরে বাঙালীর মন-মনন ও জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে। বৈদিক আর্যরা সুরের এবং তাদের নিকট-জ্ঞাতি ইরানী আর্যরা অসুরের পূজারী। পূজ্যদেবতা নিয়েই হয়তো এক এক সময়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, যখন তারা মধ্য-এশিয়ার আমু ও শিরদরিয়ার উপত্যকায় বাস করত। তারও আগে একসময়ে উভয় দলের পূজ্য দেবতা ছিল অসুর (অহোর)। পরে ইরানীরা অসুর (অহোরামজদা) এবং ভারতীয় বৈদিক আর্যরা 'দেইবো', 'দইব' বা 'দেব' পূজারী হয়। ফলে ইরানীর কাছে দেব (দেও) হলেন অরি ও অপদেবতা এবং তেমনি অসুর হলেন ভারতীয়দের অরি ও অপদেবতা। তাছাড়া জেন্দাবেস্তার এবং ঋগ্বেদের ভাষায় মিলও তাদের অভিন্নত্বের প্রমাণ। কোন কোন বিদ্বানের মতে অসুরপন্থীরা ছিল কৃষিজীবী ও উন্নতরুচিসম্পন্ন এবং স্থাপত্যে ভাস্কর্যে নিপুণ, আর সুরপন্থীরা

ছিল যাযাবর, দুর্ধর্ষ ও অপরিশীলিত রুচির। অসুরপন্থীদের অন্য প্রধান দেবতা বরুণ আর সুরপন্থীদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। অহিপ্রতীক বৃত্র (বেতরো) উভয় পক্ষেরই শত্রু।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি ও অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আমরা চারটি যুগের নিদর্শন পেয়েছি। ফলে রাঢ় অঞ্চল যে অতি প্রাচীন ভূমি, সে-সম্বন্ধে যেমন আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি, তেমনি এখানকার লোকবসতিও যে সুপ্রাচীন, তা নিশ্চিত-ভাবে স্বীকৃত হল। এ সভ্যতা মহেনজোদারোর ও হরপ্পার নগর-সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয়।

নব্যপ্রস্তরযুগের পাথুরে অস্ত্র এবং অন্যান্য হাতিয়ার যেমন এখানে মিলেছে, তেমনি তাম্রযুগের ও তাম্রাশ্ম বা ব্রোঞ্জযুগের নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঙলার তামা বিদেশে রপ্তানীও হত। ব্রোঞ্জযুগেই মহেনজোদারো-হরপ্পায় নগর-সভ্যতার উদ্ভব। পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রমাণে রাঢ়েও তা ছিল বলে দাবি করা চলে। রাঢ়ে তখন সুপরিকল্পিতভাবে নগর এবং রাস্তা-ঘাট, ঘর ও দুর্গ নির্মিত হত। কৃষি-শিল্পবস্তু বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে সুদূর ক্রীট দ্বীপেও যে রপ্তানী হত তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। ক্রীট দ্বীপে প্রচলিত প্রাচীন লিপি-সম্বলিত একটি গোল সীলমোহর পাওয়া গেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। রাঢ়ের পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে মসলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত, তাম্র এবং সম্ভবত এখো-গুড়ও ছিল (কেননা এখো-গুড়ের এলাকা বলেই অঞ্চলের নাম 'গৌড়' হয় বলে কারো কারো বিশ্বাস)। বাঙলার এখো-গুড় ও চিনি একসময়ে রোমসাম্রাজ্যেও রপ্তানী হত। খ্রীস্টপূর্ব যুগের বাঙলাদেশের বহির্বাণিজ্যের আর একটি সাক্ষ্য হচ্ছে মৃন্ময় লেবেল বা ফলক। এটি পণ্যগর্ভ ঝুড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকত। পণ্যের ও মূল্যের হিসেব লেখা থাকত এই মাটির ফলকে।

বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালীর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গমন এবং সেখানকার বণিকের এদেশে আগমন ছিল আবশ্যিক। তাই ক্রীটবাসীর সঙ্গে প্রাচীন বাঙালীর সাংস্কৃতিক যোগও ছিল স্বাভাবিক। এর প্রমাণও মেলে—যেমন উভয় দেশের মাতৃদেবীর বাহক সিংহ, ক্রীটদ্বীপের নারীরা যেমন দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত রাখত, তেমনি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' থেকে জানা যায়—অভিজাত নারীরা (রানীরা) শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখত। ডক্টর অতুল সুরের মতে

ক্রীটে প্রচলিত লিপির সঙ্গে, বাঙলার 'পাঞ্চ মার্কযুক্ত' মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির সাদৃশ্য ছিল। তাঁর মতে আলপীয় বর্গে (আরামিক ?) বণিক 'হিট্টি' নামে পরিচিত। প্রাচীন বাঙলায়ও বণিকরা 'হট্টি>হাটি' নামে ছিল আখ্যাত। ডক্টর অতুল সুর বলেন, বর্ধমান জেলায় 'হাটী' জাতি এখনো বর্তমান। সমার্থক শ্রেষ্ঠী শব্দ এ সূত্রে স্মর্তব্য। এই 'হাটী' যে বণিক বা বাণিজ্যিক পণ্যবাচক হিট্টি সম্পৃক্ত নাম তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। ঋগ্বেদে বণিক 'পণি' নামে অভিহিত, বৌদ্ধযুগে বণিক ছিল 'সার্থবাহন', পরে হয় 'সাধু' নামে পরিচিত। পণির ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্যই 'পণ্য'। আলপীয় আর্যভাষীরা কি বণিক হিসেবেই এশিয়া-মাইনর, আশশিরিয়া, দক্ষিণ ইরান হয়ে অসুরপন্থীরূপে বাঙলায় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেছিল, যার ফলে এখানে আলপীয় নরগোষ্ঠীর বাহুল্য দেখা যায় ? এবং এ-জন্যেই কি বৈদিক আর্যরা এ অঞ্চলের লোককে অসুর (পূজক) নামে অভিহিত করত ? উল্লেখ্য যে অসুর আশশিরীয়দেরও পূজ্য এবং অহোরামজদার উপাসক জোরথুস্ত্রেরও জন্ম আশশিরীয় রাজ্যসীমান্ত ইলাম অঞ্চলে। জর্জ গ্রিয়ার্সন গুজরাটী-মারাঠীর সঙ্গে ওড়িয়া-বাঙলা-অসমীয়ার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। মনে হচ্ছে এ সাদৃশ্য আলপীয় বর্গের আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর প্রভাবজ। বাঙলার প্রাচীন ভাষাকে অসুর ভাষা বলার মূলেও হয়তো অসুরপন্থী আলপীয়দেরই নির্দেশ করা হত।

প্রত্নপ্রস্তর, নবপ্রস্তর, তাম্রাশ্ম বা ব্রোঞ্জযুগেও যে অন্তত রাঢ় অঞ্চলে জন-বসতি ছিল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথুরে হাতিয়ার থেকে তা বিশ্বাস করতে পারি। নবপ্রস্তর যুগে কৃষি ও বয়নশিল্পের উদ্ভবের, পশুপালনের ও যাযাবর জীবনাবসানের আভাস পাই। এ সময়ে এরা মৃতকে কবরস্থ করত এবং খাড়া লম্বা পাথর বসিয়ে চিহ্নিত করে রাখত—বীরকাঁড় নামের এই খাড়া পাথর মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, হুগলীতে ও অন্যান্য স্থানে মেলে।

ব্রোঞ্জযুগে বাঙালীরা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক। পাণ্ডুরাজার ঢিবির সঙ্গে মহাভারতীয় পাণ্ডবদের সম্পর্ক থাক বা না-থাক, আমরা মোটামুটিভাবে আজ থেকে সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগেকার রাঢ়বাসীর কিছু খবর পাচ্ছি। আমরা দেখলাম বাঙলাদেশে উচ্চবিত্তের বা উচ্চবর্ণের শ্রেণী হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। আর সবাই নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী। ব্রাহ্মণরা গুপ্ত আমলে রাজ-শক্তির প্রয়োজনে নগণ্য সংখ্যায় বাঙলায় আসে, তারা যজ্ঞের পৌরোহিত্য জানত না। কিংবদন্তির আদিশূর কিংবা বল্লালসেন কর্তৃক নতুন করে বেদজ্ঞ

ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়নের তাই প্রয়োজন হয়। এবং তাদের অনুচর বা ভৃত্য হিসেবে আসে ঘোষ, গুহ, বসু, মিত্র, দত্ত (দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে) প্রভৃতি। বাঙলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনো ছিল না। বাঙলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যের আলোকে বিচার করলে মেল-পটিবিন্যাসের সময়ে দেশী লোকও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য হয়েছে বলে মানতে হবে। দাক্ষিণাত্যের অনার্য অবয়বের ব্রাহ্মণদের কথাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। আসলে বাঙলায় বৌদ্ধ বিলুপ্তির সুযোগে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ গড়ে ওঠে সেন আমলে কৃত্রিম (বল্লালসেনী কৌলীন্য প্রথা) বর্ণ-বিন্যাসের ফলে—যার জের চলে জাতিমালা কাছারী, গাঁই-পটি-মেল বিন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে সতেরো শতক অবধি। নৃ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় কিন্তু বাঙলার জনগণের মধ্যে বৈদিক আর্যভাষীর রক্ত কিংবা অবয়ব মেলে না। কোন কোন নৃ-বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। তাঁদের মতে বাঙলায় উচ্চ-বর্ণের লোকগুলি (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা) আর্যভাষী আলপীয় এবং অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের পরে সমুদ্রপথে বাঙলায় ওড়িশায় প্রবেশ করে। এরাই প্রভুত্ব করতে থাকে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের ওপর। এদের জীবিকার ও সেবার প্রয়োজনে অস্ট্রিক দ্রাবিড়দের মধ্যে থেকে যাদের এরা সহযোগী ও সেবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের শূদ্র—উত্তম ও মধ্যম সঙ্কর তথা স্পর্শযোগ্য বা জলাচারযোগ্য শ্রেণীর নির্দিষ্ট পেশার ও প্রশ্রয়ের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ (সৎশূদ্র ও সদ্গোপ)। অন্যেরা রইল নির্দিষ্ট হীনবৃত্তিজীবী রূপে, চিরনিঃস্ব অস্পৃশ্য হয়ে—যারা 'অন্ত্যজ' রূপে অভিহিত। বৌদ্ধ যুগে হয়তো নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির বৌদ্ধরা তেমন অস্পৃশ্য ছিল না।

মোটামুটিভাবে বলতে পারি বৌদ্ধ বিলুপ্তি থেকেই অস্ট্রিক-দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর তথা আদি বাঙালীর দারিদ্র্যের সঙ্গে সামাজিক ঘৃণা ও দুর্ভোগের বৃদ্ধি। আলপীয় যুগেই যারা অরণ্যাশ্রিত হয় তারা কোল-ভীল-মুণ্ডা প্রভৃতি গোত্রীয় নামে আজো স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে উপজাতি অভিধায় ; এদের নির্জিত নিঃস্ব জ্ঞাতিরা হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল-শবর, কাপালি-বাগদি-মুচি-মেথর রূপে দাস ও হীনকর্মের লোক। আর মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী তাদের কাছে ম্লেচ্ছ। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের মধ্যে সদ্গোপ-কৈবর্তরা বৌদ্ধ যুগে এবং মল্লরা মধ্যযুগে বাহুবলে কোথাও কোথাও স্থানিক প্রাধান্যলাভ করে (দিব্যক-রুদ্রক-ভীম কিংবা ইছাই-সোম ঘোষ অথবা মধ্যযুগে রাঢ়ের মল্লদের কথা স্মর্তব্য)।

অতএব, পাণ্ডুরাজার ঢিবি-সভ্যতার স্তর অতিক্রম করার আগেই এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত প্রচারিত হতে থাকে এবং বাঙলা-দেশ পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কবলিত থাকে। এ দুই হাজার বছর ধরে তাদের স্ব-সত্তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কিংবা আত্মবিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। মৌর্য-শুঙ্গ-কান্ব-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ শাসকদের সবাই ছিল বিদেশী। তাদের শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক শাসনে-শোষণে দেশী লোক আর কখনো সমষ্টিগতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষুদ্র ও স্বাধীন সামন্ত ও আঞ্চলিক রাজারা—চন্দ্র, বর্মণ, খড়্গ, গুপ্ত, দেবরাও দেশী ছিল না। দেশের আদি অধিবাসী ও আসল মালিকরাই প্রতাপে প্রবল প্রভুদের সেবাদাসরূপে মানবিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে প্রায় প্রাণিরূপেই প্রাণে বেঁচে রইল মাত্র। গৃহপালিত পশুর আদর-কদর-যত্নও তারা কোনদিন পায়নি। তাদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শ্রেণী আলপীয় নরগোষ্ঠীরা এবং কিছু বুদ্ধিমান যোগ্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ও ব্যক্তিগতভাবে প্রভুগোষ্ঠীর প্রয়োজনে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হবার সুযোগ রাজনীতিক নিয়মেই লাভ করেছিল নিশ্চয়ই। বিভিন্ন সময়ের ও পর্যায়ের বর্ণবিন্যাসকালে তারাও উচ্চতর বার্ণিক স্তরে উঠেছে অবশ্যই। তাই আজকের বাঙলায় আমরা বর্ণহিন্দুর বহুলতা প্রত্যক্ষ করছি। বাঙালীর আবর্তন-বিবর্তন-উন্নয়ন চলেছিল বিদেশী ভাষ-শস্ত্র-সংস্কৃতি-শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং নিয়ন্ত্রণে। তাই বাঙালীর চিন্তা-চেতনায়, জীবনজিজ্ঞাসায় ও জগৎভাবনায় একটি অদৃশ্য স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকলেও বাহ্যত তার সবকিছুই অনুকৃত।

বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির শাসন তার স্বসত্তা-চেতনার বৃদ্ধি রোধ করেছিল। বাঙালী রইল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চোখে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর এবং অন্ত্যজ নামের কামার-কুমার-চামার-কাঁসার-তাঁতী-হাড়ি-ডোম-জেলে-চাঁড়াল-বাগদি-ধোপা-নাপিত-তেলী-গোপ-কেওট, ক্ষুদ্র বেনে প্রভৃতি অবজ্ঞেয় পেশাজীবী হয়ে। বাঙলা-অসম-ওড়িশা এবং দক্ষিণপূর্ব বিহারের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মানুষের—দেশজ বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের দুই হাজার বছর ধরে এই ছিল অবস্থা। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকেই উক্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নির্জিত নির্যাতিত গণমানব বিরুদ্ধ পরিবেশেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সামান্য সুযোগ পাচ্ছে। বিদেশী প্রভাব ও পরাধীনতা যে আত্মবিকাশের পথে কী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—দু'হাজার বছরের খাঁটি বাঙালীই তার প্রমাণ। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় বর্গের নরগোষ্ঠী বহু

বহু কাল উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষীর প্রভাবমুক্ত ছিল বলে আর্যশাস্ত্র গ্রহণ করেও তারা স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধিকারে স্বস্থ ছিল। রাষ্ট্রকূট-চোল-চালুক্য-পল্লব সাম্রাজ্য ও ভাষাগুলি তার প্রমাণ।

অতএব, বাঙলার প্রচলিত শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বাঙালী নেই। সেখানে রয়েছে উত্তর-ভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের ও তুর্কী-মুঘলের কৃতি এবং কীর্তির বিবরণ। সে-ইতিহাস পড়ে আমরা যে কেবল আত্মপরিচয় ভুলি তা নয়, নিজেদের জ্ঞাতিদেরও ঘৃণা করতে শিখি।

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মঙ্গোল বাঙালীর পরিচয় মেলে তাদের জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার ফসল সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে, কায়াসাধনতত্ত্বে, রজ-শুক্র চর্যায়, দারু-টোনা-বাণ-উচাটন-বশীকরণ শক্তির চর্চায়, ডাক-ডাকিনী-যোগী-যোগিনীর মাহাত্ম্য ও প্রভাব শিকারে, তাদের কৃষিতত্ত্বে ও আবহাওয়া চেতনায়; বৌদ্ধ মতের মহাযান সঞ্জাত মন্ত্র-কালচক্র বজ্র-সহজ যানে, লোকায়ত শাস্ত্রে ও লৌকিক দেবতার উদ্ভাবনে, বৈষ্ণব সহজিয়া মতে, বাউলতত্ত্বে, চৈতন্যের প্রেমবাদে, পীর-নারায়ণ-সত্যের উপলব্ধিতে; আর বেদে-তাঁতী-পোদ-কিরাত-নিষাদ প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর আচারে-সংস্কারে এবং তথাকথিত উপজাতির জীবনপদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি মেলে বাঙালীর চেতনার গভীরে জগৎ ও জীবনভাবনায় নারী-দেবতার প্রভাব স্বীকারে, চণ্ডী কালী দুর্গা মাতৃকাপূজায়, অরিদেবতারূপেও ওলা ষষ্ঠী শীতলা মনসা প্রভৃতি নারীদেবতা-কল্পনায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের চেতনায়ও নারীই জীবন-নিয়ন্ত্রক এবং জগৎ-নিয়ামক শক্তি ও জীবনদেবতা। তাঁর কাব্যে গানে তাঁর এ ধারণাই মুখ্যত অভিব্যক্তি পেয়েছে।

সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজে যেমন হয়ে থাকে, আর্থিক ক্ষেত্রে এখানে গণমানবের অবস্থা তাই ছিল। শ্রম দিত গণমানব, আর ফল ভোগ করত শাহ্-সামন্ত ও তাদের সহযোগী আমলা-মুৎসুদ্দীরা। গণমানবের মানবিক অধিকার ছিল না, তারা ছিল শাসক-প্রশাসক গোষ্ঠীর এবং তাদের সহযোগীদের ভোগ-উপভোগ সামগ্রীর যোগানদার ও সেবক। তাই তারা যদিও ধান, সরিষা, মরিচ, হলুদ, ডাল, কার্পাস, আখ (পৌড় < পৌণ্ড্র = ইক্ষু) প্রভৃতি চাষ করত, গুড়-চিনি তৈরি করত, কাপড় বানাত এবং সুপারি-নারিকেল, আম জাম-কাঁঠাল-কলা, তেঁতুল-লাউ, কুমড়া, পুঁই, ঝিঙা, বেগুন, কন্দ, আলু, নটে-কলমি তাদের ভোগ্য ফল-মূল-পাতা, আর পান ও বরজ বাঙালীরই। তবু ভোগ-উপভোগের অধিকার

ছিল না তাদের। তারা এসবের উৎপাদক ও শ্রমিক বটে, কিন্তু এ যুগের কারখানার কিংবা চা-বাগানের শ্রমিকদের মতোই ছিল তাদের অবস্থা। গামছা থেকে মসলিন অবধি কাপড় কিংবা রেশম তাদের হাতেই তৈরি হত বটে, বেচত বেনেরা, পরত অন্যেরা, লাভ লুটত বেনে-ফড়েরা। ওরা পরত গামছা, কৌপিন আর আঁটধুতিও হয়তো। সুপ্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত, সমন্দর, গঙ্গা বাঙলায় বটে, এমনকি সপ্তগ্রামে আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বটে, কিন্তু খাঁটি বাঙালী ব্যবসায়ী ছিল না, পণ্যদ্রব্যাদির অনেকগুলোই বাঙলার ও ছিল না। ব্রিটিশ আমলের কোলকাতা বন্দরের বাণিজ্য ও বণিকদের কথা এ-সূত্রে স্মর্তব্য। কাজেই খাঁটি বাঙালীর দারিদ্র্য এবং নিঃস্বতা কখনো ঘোচেনি। বাঙলার বৃত্তিজীবী ও চাষীমাত্রেই ছিল চিরঅবজ্ঞেয় ও বঞ্চিত মানুষ। যদিও দরিদ্র ব্রাহ্মণও ছিল কৃষিজীবী।

শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মা, নারী-পশু-পাথর ও বৃক্ষদেবতা, মূর্তিপূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ (নবীবাদ), কায়াসাধন, মন্ত্রশক্তি ও যাদুবিশ্বাস, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, চড়ক-গাজন প্রভৃতি; শুভকর্মের যাদুপ্রতীক চাউল, খই, কলা, নারিকেল, পান-সুপারি, আম্রসার, হলুদ, দূর্বা, দধি, মাছ, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি, গোময় ইত্যাদি আর চণ্ডী, মনসা, বাসুলী, ষষ্ঠী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, জাঙ্গুলি প্রভৃতি বাঙালীর লোকায়ত দেবতা এবং কালিক তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন প্রভৃতিও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল বাঙালীর নিজস্ব।

এসব সম্পৃক্ত উপকথা, ব্রতকথা, পুরাণকথা, আচার ও সংস্কার প্রভৃতিও তাই তাদের মন-মনন-প্রসূত। পরবর্তীকালের পীর-নারায়ণ-সত্য ও তার দেবকল্প অনুচর পীর ও উপদেবতারাও সমকালীন জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা হিসেবে পরিকল্পিত।

কারো গৌরব বা লজ্জা আবিষ্কার আমাদের লক্ষ্য নয়, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি তো নয়ই—আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য বাঙালীর গোষ্ঠীগৌরব নিরূপণও নয়।

ক. আর্য-গর্ব ও অনার্য-লজ্জা যে অহেতুক এবং স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী,

খ. আভিজাত্যবোধ কিংবা হীনমন্যতা যে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ-বিকাশের প্রতিকূল,

গ. জন্মসূত্রে নয়,— জ্ঞান-প্রজ্ঞা-কর্ম ও আচরণ সূত্রেই যে মানুষ ছোট বা বড় হয়,

ঘ. গোত্র, শাস্ত্র বা স্থানভিত্তিক মানুষের সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এবং দুর্বলের উপর পীড়নের ও অপ্রেমের কারণ,

ঙ. সর্বপ্রকার জুলুম মুক্তিতেই যে দেশ-দুনিয়ার ব্যক্তির ও সমষ্টির নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত, মানুষের জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, মানবিক গুণের ও শ্রেয়োবুদ্ধির বিকাশ যে সাধন হবে ভবিষ্যৎকালে, অতীত তাকে যে আর কিছুই দেবে না, তার কল্যাণ যে সামনে, পেছনে নয়,

চ. সবার উপরে মানুষ ও মনুষ্যত্বই যে মানুষের অভয় শরণ, নির্বিশেষ মানব-চেতনাতেই যে মানবিক সমস্যার সমাধান নিহিত, এবং মানুষের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-লাভ-লোভের ইতিকথা যে এ শিক্ষাই দেয়—তা জানবার বুঝবার জন্যেই এই আলোচনা আবশ্যিক।

বাঙালীর সংস্কৃতি

অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্য প্রাণী প্রকৃতির অনুগত জীবন ধারণ করে আর মানুষ নিজের জীবন রচনা করে। প্রকৃতিকে জয় করে, বশীভূত করে প্রকৃতির প্রভু হয়ে সে কৃত্রিম জীবন যাপন করে—এ-ই তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অতএব, এইভাবে জীবন রচনা করার নৈপুণ্যই সংস্কৃতি। স্বল্পকথায়, সুন্দর ও সামগ্রিক জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। চলনে-বলনে, মনে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচারে-আচরণে, অনবরত সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিবানতা। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি অসুন্দর, অকল্যাণ এবং অপ্রেমের অরি। সুরুচি ও সৌজন্যেই তাই সংস্কৃতিবানতার প্রকাশ। সংস্কৃতিবান মানুষ কখনও জ্ঞাতসারে অন্যায় করে না, অকল্যাণকর কিছুকে প্রশ্রয় দেয় না, অপ্রীতিতে বেদনাবোধ করে এবং কৌৎসিত্যকে সহ্য করে না। অন্যকথায়, যেখানে কথার শেষ সেখানেই সুরের আরম্ভ, যেখানে photography-র শেষ সেখান থেকেই শিল্পের শুরু, নক্সার উর্ধ্বেই সাহিত্যের স্থিতি, তেমনি যেখানে স্থূল জৈব প্রয়োজনের শেষ, সেখান থেকেই সংস্কৃতির শুরু। সংস্কৃতিবান মানুষ জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়, অভিজ্ঞতায় ও প্রয়োজনবোধে চালিত হয়ে অনবরত জীবনকে রচনা করতে থাকে এবং পরিবেশকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করবার প্রয়াসী হয়। এজন্যে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেই কেবল নিজের প্রতিই নয়, প্রতিবেশীর প্রতিও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে। এবং সচেতনভাবে ও সযত্নে নিজেকে সুন্দর করে সৃষ্টি করে এবং নিজের আচারে-আচরণে, মনে-মননে, কথায়-কাজে অপরের পক্ষে শরণীয়, বরণীয়, অনুসরণীয় এবং আকর্ষণীয় লাবণ্য ছড়িয়ে তৈরী করে প্রতিবেশীদের সুষ্ঠু জীবনের ভিত্।

বীজের আত্মবিকাশের জন্যে যেমন কর্ষিত ক্ষেত্র প্রয়োজন, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের জন্যেও তেমনি সুকর্ষিত মনোভূমি তথা পরিস্রুত চেতনা আবশ্যক। তাই সংস্কৃতির স্রষ্টামাত্রেই বিজ্ঞ এবং বিবেকবান, সুন্দরের ধ্যানী ও আনন্দের অন্বেষ্টা, বুদ্ধি ও বৃদ্ধির সাধক, মঙ্গল ও মমতার বাণীবাহক এবং প্রীতি ও প্রফুল্লতার উদ্ভাবক।

চরিত্রবল, মুক্তবুদ্ধি এবং উদারতার ঐশ্বর্যই এমন মানুষের সম্বল ও সম্পদ।

বেদনামুক্তি এবং আনন্দ-অন্বেষাই মানুষের জীবনসত্য। এক্ষেত্রে সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। আর এই সৌন্দর্য-অন্বেষা এবং কল্যাণ-কামিতাই সংস্কৃতি।

মানুষের জীবনে সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা পাশাপাশি চলে, বলা যায় একটি অপরটির সহচর। কিন্তু এগুলো যখন আনুপাতিক ভারসাম্য হারায়, তখন সুখ কিংবা দুঃখ বাড়ে। সুখ বৃদ্ধি পেল তো ভালই, কিন্তু সমস্যা ও যন্ত্রণার চাপে যখন জীবন-জ্বালা আত্যন্তিক হয়ে উঠে, তখনই বিচলিত-বিপর্যস্ত মানুষ স্বস্তিকামনায় সমাধান খোঁজে। এ সমাধান দিতে পারেন এবং দেনও কেবল সংস্কৃতিবান মানুষই।

মানুষমাত্রেই সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে সংস্কৃতিকামী। কিন্তু সাধনার মাত্রা ও পথ-পদ্ধতি সবার এক রকম নয়। তাই সংস্কৃতিতে আসে গৌত্রিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, আর্থিক ও আত্মিক বৈষম্য ও বিভিন্নতা। এবং স্তরভেদে তা হয় নিন্দনীয় কিংবা বন্দনীয়, অনুকরণীয় কিংবা পরিহার্য।

আগের কথা জানিনে, কিন্তু ইতিহাসান্তর্গত যুগে দেখতে পাই বাঙালী মনোভূমি কর্ষণ করেছে সযত্নে। এবং এই কর্ষিত ভূমে মানবিক সমস্যার বীজ বপন করে সমাধানের ফল ও ফসল পেতে হয়েছে উৎসুক। এই এলাকায় বাঙালী অনন্য। এ যেন তার নিজের এলাকা, সে এই মাটিকে ভালোবেসেছে, সে এ জীবনকে সত্য বলে জেনেছে। তাই সে দেহতাত্ত্বিক, তাই সে প্রাণবাদী, তাই সে যোগী এবং অমরত্বের পিপাসু। এজন্যেই নির্বাণবাদী বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেও সে কায়াসাধনায় নিষ্ঠ। তার কাছে এ মর্ত্য জীবনই সত্য, পারত্রিক জীবন মায়া। মর্ত্য জীবনের মাধুর্যে সে আকুল, তাই সে মর্ত্যে অমৃতসন্ধানী। সে বিদ্রোহী, সে বলে,

> কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জেঁ
> কিংতো কিজ্জই মন্তহ সেব্ব'।
> কিংতো তিত্থ-তপোবন জাই
> মোক্খ কি লব্ভই পানী হ্নাই।

—কি হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কি হবে তোর, তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কি দেবে? পানিতে স্নান করলেই কি মুক্তি মেলে?

অনেককাল পরে এই ধারায়ই সাধক বাউলের মুখে শুনতে পাই:

সখিগো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সনে প্রেমগো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

জীবনবাদী বাঙালী তাই বৌদ্ধ হয়েও মর্ত্যের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার বাঞ্ছায় অসংখ্য উপ এবং অপদেবতার সৃষ্টি ও পূজা করেছে। সাংখ্যকেই সে তার দর্শনরূপে এবং যোগকেই তার সাধনপদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছে। তন্ত্রকেই সার বলে মেনেছে। দেহে-মনে আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই জীবনকাঠি বলে জেনেছে। আর যোগ-তান্ত্রিক কায়া-সাধনার মাধ্যমে সে কামনা করেছে দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব। এ জীবনকে সে প্রত্যক্ষ করেছে চলচঞ্চল ও তরঙ্গভঙ্গে লীলাময় মন-পবনের নৌকারূপে। বৌদ্ধযুগে তার সাধনা ছিল নির্বাণের নয়—বাঁচার, কেবল মাটি আঁকড়ে বাঁচার। মন-ভুলানো ভুবনের বনে বনে, ছায়ায় ছায়ায়, জলে-ডাঙ্গায় ভালোবেসে, প্রীতি পেয়ে মমতার মধুর অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকার আকুলতাই প্রকাশ করেছে সে জীবনব্যাপী। হরগৌরীর মহাজ্ঞান, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা-কানুফা, ময়নামতী-গোপীচাঁদ প্রভৃতির কাহিনীর মধ্যে আমরা এ তত্ত্বই পাই। অবশ্য এ বাঁচা স্থূল ও জৈবিক ভোগের মধ্যে নয়, —ত্যাগের মধ্যে সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সহজ মানসোপভোগের মধ্যে বাঁচা। কিন্তু এই জীবন-সত্যে সে কি নিঃসংশয় ছিল?—মনে হয় না। তাই বিলুপ্ত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতে তার দ্বিধা ও মানস-দ্বন্দ্বের আভাস পাই। পাল আমলের গীতে মনে হয়, সে মধ্যপন্থা (golden mean) অবলম্বন করেছে। যোগেও নয়, ভোগেও নয়, মর্ত্যকে ভালোবেসে দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই যেন সে বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে। তার সেই জানা-বোঝার সাধনায় আজও ছেদ পড়েনি। বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক, বৈষ্ণব বৈরাগীরা তাই ঘর করে, আর ফকিরেরা বাঁধে ঘর।

সেন আমলে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধসমাজ বর্ণে বিন্যস্ত হয়ে বল্লালসেনের নেতৃত্বে উগ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলে। কিন্তু তা

স্থায়ী হয়নি। গীতা-স্মৃতি-উপনিষদের মত সে মুখে গ্রহণ করলেও মনে মানেনি। তার ঠোঁটের স্বীকৃতি বুকের বাণী হয়ে ওঠেনি। কেননা সে ধার করে বটে, কিন্তু জীবনের অনুকূল না হলে অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে না। তাই সে তার প্রয়োজনমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রতীক দেবতা সৃষ্টি করে পুজো করেছে, আশ্বস্ত হতে চেয়েছে ঘরোয়া ও মানস জীবনে। তার মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি তার স্ব-সৃষ্ট দেবতা। জীবনের সামাজিক সমস্যার সমাধানে ও অধ্যাত্মজীবনের বিকাশসাধনে সে আরো এগিয়ে এসেছে। জীমূতবাহন এবং বল্লালসেন-রঘুনাথ-রামনাথ প্রভৃতির স্মৃতি ও ন্যায়, দেবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চাননের মেল-পটি প্রভৃতি গোত্র এবং বর্ণবিন্যাস প্রয়াস, চৈতন্যের ভগবৎপ্রেম ও মানব-প্রীতিবাদ বাঙালী জীবনে বেনেসাঁস আনে। এবং তার প্রসাদে আপামর বাঙালীর দেহ-মন-আত্মা গ্লানিমুক্ত হয়। এ নতুন কিছু ছিল না, গৌতমের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্বের ঐতিহ্যে সুফীমতের প্রভাবেই মানব-মহিমা বাঙালী চিত্তে নতুন মূল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়। বাঙালী নতুন করে 'জীবে ব্রহ্ম' এবং 'নরে নারায়ণ' দর্শন করে। তখন বাঙালীর মুখে উচ্চারিত হয় মানুষের মর্যাদা এবং মনুষ্যত্বের মহিমা 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।'—মানবিক সম্ভাবনার এ স্বীকৃতি সেদিন জীবন-বিকাশের নিঃসীম দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তাই বাঙালীর কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম চরম সত্য ও পরম কাম্য বাণী—'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

বাঙালী এই ঐতিহ্য আজও হারায়নি। আজো হাটে-ঘাটে-প্রান্তরে বাউল-কণ্ঠে সেই বাণী শুনতে পাই। মানববাদী বাউলেরা আজো উদাত্তকণ্ঠে মানুষকে মিলন ময়দানে আহ্বান জানায়, আজো তারা মানবতার শ্রেষ্ঠ সাধক ও চিন্তানায়কের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সাম্য, সহ অবস্থান এবং সম্প্রীতির বাণী শোনায়। তারা বলে,

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

কাজেই কাকেই বা দূরে ঠেলবি আর কাকেই বা কাছে টানবি! তোরা তো তাই ফুল কুড়োতে কেবল ভুলই কুড়োচ্ছিস্। কৃত্রিম বাছ-বিচারের ধাঁধায় কেবল

নিজেকেই ঠকাচ্ছিস্। গোত্রীয়, ধর্মীয় ও দেশীয় চেতনা বিভেদের প্রাচীরই কেবল তৈরী করছে—বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি করেছে, হানাহানির প্রেরণাই কেবল দিয়েছে, তাই বাউল বলেন—

'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারী লোকের কি হয় বিধান ?
বামণ চিনি পৈতার প্রমাণ
বামণী চিনি কি ধরে ॥'

একালের ইংরেজী শিক্ষিত কবি যখন বলেন,—

'সবারে তুই বাসরে ভাল, নইলে তোর মনের কালি ঘুচবে না রে।'

কিংবা, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা'

অথবা, 'গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান ;'

তখন তা আমাদের কাছে নতুন ঠেকে না। কেননা প্রকৃত বাঙালীর অন্তরের বাণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখেছি আমরা কত কত কাল আগে।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে এখানে শরীয়তী ইসলামও তেমন আমল পায়নি। এক প্রকার লৌকিক তথা দেশজ ইসলামই লোকের অবলম্বন হয়েছিল। তখন পার্থিব জীবনের স্বস্তির ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য কল্পিত হয়েছিলেন দেব-প্রতিম পাঁচগাজী এবং পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ আর শিরনী পেয়েছেন দেশের সেনানী-শাসক জাফর-ইসলাম-খান জাহান গাজীরা এবং বিদেশাগত বদর-আদম-জালাল-সুলতান প্রভৃতি সুফীরা, তার পরেও প্রয়োজন হয়েছিল সত্যপীর-খিজির-বড়খাঁ-গাজী-কালু-বনবিবি-ওলাবিবি প্রভৃতি দেবকল্প কাল্পনিক পীরের। এঁরা বাঙালীর ঐহিক জীবনের নিয়ন্তা দেবতা। জীবনবাদী বাঙালী এঁদের উপর ভরসা করেই সংসার-সমুদ্রে ভাসাত জীবন নৌকা। এখানেই শেষ নয়। চিন্তাজগতে বাঙালী চিরবিদ্রোহী। বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম ধর্ম সে নিজের মতো করে গড়তে গিয়ে যুগে যুগে চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাহ্যত সে ভাববাদী হলেও, উপযোগ-

তত্ত্বেই তার আস্থা ও আগ্রহ অধিক।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযান, থেরবাদ, অবলোকিতেশ্বর ও তারা দেবতার প্রতিষ্ঠা এবং যোগতান্ত্রিক সাধনায় বিকাশ সাধন করে সে তার স্বকীয়তার, সৃষ্টিশীলতার, মনন বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ব্রাহ্মণ্যযুগে জীমূতবাহন, বল্লালসেন, রামনাথ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায় সৃষ্টি করে তাঁদের চিন্তারঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞার প্রভায় জ্ঞানলোক সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করেছেন।

মুসলিম আমলে চৈতন্যদেবের নবপ্রেমবাদ, সত্যপীরকেন্দ্রী নবপীরবাদ, চাঁদ সদাগরের আত্মসম্মানবোধ এবং তেজস্বিতা, বেহুলার বিদ্রোহ ও কৃচ্ছ্রসাধনা, গীতিকায় পরিব্যক্ত জীবনবাদ আমাদের সাংস্কৃতিক অনন্যতা এবং বিশিষ্ট জীবন-চেতনার সাক্ষ্য।

তারপরেও কি আমরা থেমেছি! রামমোহনের ব্রাহ্মমত, বিদ্যাসাগরের শ্রেয়োবোধ, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ, রবীন্দ্রনাথের মানবতা, নজরুল ইসলামের মানববাদ কি সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে দেয়নি?

মনীষা ও দর্শনের জগতে বাঙালী মীননাথ, কানপা, তিলপা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, জীমূতবাহন, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামনাথ, চৈতন্যদেব, রূপ-সনাতন জীব-রঘুনাথাদি গোস্বামী, সৈয়দ সুলতান, আলাউল, হাজী মুহম্মদ, আলিরজা, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস-কাশীদাস-রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন, তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্- দুদুমিয়া, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রমথ-নজরুল নির্মাণ করেছেন বাঙালী মনীষার এবং সংস্কৃতির গৌরব মিনার। এঁদের কেউ বলেছেন ঘরের ও ঘাটের কথা, কেউ জানিয়েছেন জগৎ এবং জীবন রহস্য, কারো মুখে শুনেছি প্রেম, সাম্য ও করুণার বাণী, কারো কাছে পেয়েছি মুক্তবুদ্ধি ও উদারতার দীক্ষা, কেউবা শিখিয়েছেন ঘর বাঁধা ও ঘর রাখার কৌশল, কেউ শুনিয়েছেন ভোগের বাণী, কেউ জানিয়েছেন ত্যাগের মহিমা, আবার কেউ দেখিয়েছেন মধ্যপন্থার ঔজ্জ্বল্য। আত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, পারমার্থিক সব মন্ত্রই আমরা নানাভাবে পেয়েছি এঁদের কাছে।

বাঙালীর বীর্য হানাহানির জন্যে নয়, তার প্রয়াস ও লক্ষ্য নিজের মতো করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার। স্বকীয় বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে তত্ত্ব ও তথ্যকে, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের জীবনের ও জীবিকার অনুকূল এবং উপযোগী করে গড়ে

তোলার সাধনাতেই বাঙালী চিরকাল নিষ্ঠ ও নিরত। এজন্যেই রাজনীতির তত্ত্বের (Theory) দিকটিই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশী—বাস্তব প্রয়োজনে সে অবহেলাপরায়ণ ; কেননা তাতে বাহুবল, ক্রূরতা ও হিংস্রতা প্রয়োজন। এজন্যেই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ বাঙালীর মানস-সন্তান হলেও নেতৃত্ব থাকেনি বাঙালীর। বিদেশাগত ভুঁইয়াদের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জানমাল উৎসর্গ করতে বাঙালীরা দ্বিধা করেনি বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা কিংবা সম্পদ কামনা করেনি। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে সে অনন্য। নতুন কিছু করার আগ্রহ এবং যোগ্যতা তার চিরকালের। প্রজারা যেদিন 'গোপাল'কে রাজা নির্বাচিত করেছিল, ইতিহাসের এলাকায় সেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হল। সেদিন এ বিস্ময়কর পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কেবল বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ওহাবী, ফরায়েজী এবং সশস্ত্র বিপ্লবকালে বাঙালীর বল ও বীর্য, ত্যাগ ও অধ্যবসায় বাঙালীর গৌরবের বিষয়।

স্বাতন্ত্র্য আসে উৎকর্ষে, অনন্যতায় ও অনুপমতায়—বৈপরীত্যে ও বিভিন্নতায় নয়। বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও তার উৎকর্ষে, নতুনত্বে এবং অনন্যতায়। আমাদের দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙালী লেখাপড়া করে কেবল হিন্দু হয়েছে কিংবা মুসলমান হয়েছে, বাঙালী হতে চায়নি। হিন্দুরা ছিল আর্য-গৌরবের ও রাজপুত-মারাঠা বীর্যের মহিমায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত এবং মুসলমান ছিল দূর অতীতের আরব-ইরানের কৃতিত্ব-স্বপ্নে বিভোর। এরা স্বাদেশিক স্বাজাত্য ভুলেছিল, বিদেশীর জ্ঞাতিত্ব গৌরবে ছিল তৃপ্তমন্য। এদের কেউ স্বস্থ বা সুস্থ ছিল না। তাই বাঙলা সাহিত্যে আমরা কেবল হিন্দু কিংবা মুসলমানই দেখেছি। বাঙালী দেখেছি কচিৎ। এজন্যেই আমাদের সংস্কৃতি আশানুরূপ বিস্তার ও বিকাশ পায়নি। আজ বাঙালী পায়ের তলার মাটির সন্ধান নিচ্ছে। এই মাটিকে সে আপনার করে নিচ্ছে। এর মানুষকে ভাই বলে জেনেছে। আজ আর কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে সে চলে না। স্বদেশের ও স্বভাষার নামে পরিচিত হতে সে উৎসুক। দুর্যোগের তমসা অপগত-প্রায়—প্রভাত হতে দেরী নেই—সামনে নতুন দিন, নতুন জীবন। নিজেকে যে চেনে অন্যকে জানা-বোঝা তার পক্ষে সহজ। আজ বাঙালী আত্মস্থ হয়েছে। তার আত্মজিজ্ঞাসা হয়েছে প্রখর, সংহতিকামনা হয়েছে প্রবল। শিক্ষিত তরুণ

বাঙালী জেগেছে, তাই সে তার ঘরের লোককে জাগাবার ব্রত গ্রহণ করেছে। বলছে—'বাঙালী জাগো'। জাগ্রত মানুষই সংস্কৃতি চর্চা করে। এবার স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ বাঙালী জাগবে এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবে। জীবনে ও জগতে সে নতুনকে করবে আবাহন এবং নতুন ও ঋদ্ধ চেতনায় হবে প্রতিষ্ঠিত।

বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য বিভিন্নতা, বিবর্তন এবং বৈষম্য ঘটে একারণেই। বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন-জীবিকার নিরাপদ নিরুপদ্রব রক্ষণ-লালন লক্ষ্যেই মানুষের মানস সংস্কৃতি ও তজ্জাত ব্যবহারিক উপকরণ এবং বৈষয়িক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন-চেতনার বাহ্যরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন-নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ-বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য-দুর্দশার উপর নির্ভরশীল। যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের অনুকূল পরিবেশ, সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বাত্মক বিকাশের এবং জীবিকার স্বচ্ছন্দ প্রসারের লাবণ্যে বর্ধিষ্ণু, যেখানে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জড়তায়, জীর্ণতায় ও চিরন্তনতায় বিকৃত, প্রথাগত নিষ্প্রাণ আচার ও আচরণ মাত্র। কারণ বেঁচেবর্তে থাকার পদ্ধতিই জন্ম দিয়েছে শাস্ত্রের, সমাজের, সংস্কৃতির, সভ্যতার ও রাষ্ট্রের। সেই বাঁচার প্রয়াস যখন কোন বিরুদ্ধ বিরূপ শক্তি রোধ করে দাঁড়ায়, তখন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-প্রয়াস ও আচরণ আবর্তনধর্মী হয়েই জীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

আমাদের বাঙলাদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষ চিরকাল অন্তত ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিজাতি বিজিত দেশ। এদেশের মানুষ কখনো স্বকীয় মেজাজে আত্ম-বিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। সৃজনে নয়—অনুকৃতি ও অনুশাসনের বশে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে কোথাও অন্ধের মতো কোথাও পঙ্গুর মতো সে এগিয়েছে স্থান কালের দাবী স্বীকার করেই। তাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। মেদ-মাংসের স্ফীতি ও লাবণ্য তাকে আড়াল করেছে বটে কিন্তু লোপ করতে পারেনি।

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালীর মননে এবং অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব

বরাবর প্রবল রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে এবং যাদুতে তার আস্থাও অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, পশু-পাখী দেবতা, দেহচর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তুক-তাক-দারু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচাটন, কবচ-মাদুলি এবং বশীকরণে আস্থা তাদের আজো অবিচল। সভ্য বাঙালীর অষ্ট্রিক-মঙ্গোলীয় জ্ঞাতি পার্বত্য আরণ্য কৌম—কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, হাজঙ, খাসিয়া, মণিপুরী, লুসাই, নাগা, মিজো, খুমি, তিপরা, মুরঙ, কুকী, কোচ প্রভৃতির মধ্যে যেসব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তাদের অনেকগুলোই ভিন্নাকারে বা সামান্য রূপান্তরে সভ্য বাঙালীর প্রথাসিদ্ধ আচারে রয়ে গেছে। আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক অনেক আচারে-অনুষ্ঠানে, প্রথায়-পার্বণে, মৃতের সৎকারে, শ্রাদ্ধে, বিশ্বাসে-সংস্কারে আদিম রীতি-নীতির ছিটেফোঁটা এখনো মেলে।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান ধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণ করেও বাঙালী তার আদিম ঐতিহ্য কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেনি। তাই গাছের মধ্যে বট, অশ্বত্থ, তাল, তেঁতুল, তুলসী প্রভৃতি, পাখীর মধ্যে কাক, পেচক, শকুন, শালিক প্রভৃতি, পশুর মধ্যে গাভী, শেয়াল, সরীসৃপের মধ্যে সাপ, টিকটিকি, নৈসর্গিক তিথি-নক্ষত্র-দিন-ক্ষণ-মাস, অশরীরী ভূত প্রেত পিশাচ (জিন-পরি) ডাইনী প্রভৃতি বাঙালীর চেতনায় রোগের চিকিৎসায়, শুভাশুভ চিন্তায় এবং সিদ্ধি-সাফল্য কামনায় আজো উপযোগ হারায়নি।

আচারিক জীবনে ধান, দূর্বা, হলুদ, আমপাতা, কলাগাছ, কলসী, ঘট, কুলো, দীপ, ধুপ, মাছ, দই আজো মনোজীবনে বাঞ্ছাসিদ্ধির ভরসা জাগায়। ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী কিংবা সাপ, হাতী, বাঘ, কুমীর আজো সভয় শ্রদ্ধা পায়।

নৈতিক সামাজিক জীবনে গোত্রে বিবাহ, বহু বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, বাল্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, ত্যাগ, তালাক প্রভৃতি বিধিনিষেধও আদিম। গোত্রপতি, সমাজপতি এবং গৃহপতির দাপট ও নেতৃত্ব আজো নিম্নতর সমাজে অবিলুপ্ত। গুরুবাদ এবং মন্ত্রগুপ্তি সর্বসমাজে আজো প্রবল। হাতিয়ারের মধ্যে লাঙল, যোয়াল, ফাল, ঈষ, দা, দড়ি, মই, কোদাল, বর্শা, বাঁটুল, ঝুড়ি, চুপড়ি, চেঙাড়ি, ডিঙ্গি, ভোঙ্গা, তৈজস আসবাবের মধ্যে হাঁড়ি, সরা, পাতিল, ঝিনুক, ডাবা, (নারিকেলের মালা), মাচা, নল, পেটি, ঘটি, চাটাই, চাটি, ঝাঁটা, বাখারি প্রভৃতি, নেশার মধ্যে গাঁজা, ধেনো মদ, চরস, সিদ্ধি, প্রভৃতি,

ফলমূলের মধ্যে ধান, বেগুন, ঝিঙা, কলা, তাম্বুল, গুবাক, গাওয়ারী, জামুরা, শিমূল, তেঁতুল প্রভৃতি অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় বাঙালীর আবিষ্কৃত। ধানের জিজিরা, ককচি, করা, তুভীয়া, বাদল, গুকুই, লেম্বক, গেলঙ,মইদল প্রভৃতি এবং মাছের পুটি, টেঙরা, শিঙ্গি, গজাড়, কই, মাগুর, টাকি, পাঙ্গাস প্রভৃতি অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় নাম।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে গুড়, ভাত, মাড়, খই, চিড়া, মুড়ি, চচ্চড়ি, ভর্তা, আচার প্রভৃতিও অষ্ট্রিক হওয়ার কথা।

কড়া, পণ, গণ্ডা, কুড়ি, কাহন, গণনা পদ্ধতি অষ্ট্রিক। এমনকি কয়েকশত শব্দ ঢিল, ঢাক, ঢোল, ডাগুর, ডাঁশাল, ডাহা, চোয়াল, খাড়ু, টোপা, খোকা খুকি, খাড়ি, খোটা, খামার, খড, আড্ডা, লাড্ডু প্রভৃতি অষ্ট্রিক সংস্কৃতির স্মারক।

এসব ছাড়াও ধর্মমত সূত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা-পদ্ধতি সূত্রে বিদেশীর জ্ঞান ও চিন্তা এবং বিদেশে আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত দ্রব্য এবং ভাবচিন্তার নাম ও ব্যবহার সম্পৃক্ত আচার-সংস্কৃতি অনুকৃতি-অনুসৃতির মাধ্যমে বাঙালীর সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ ও রূপান্তরিত করেছে। যেমন—জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় চিন্তা-চেতনা এবং আচার-আচরণ এক সময় জৈন-বৌদ্ধ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও জীবনদর্শন কিংবা ইসলাম এবং খ্রীস্টান শাস্ত্র তেমনি ভাবে যথাক্রমে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টান জীবন প্রভাবিত করেছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগই নিয়ন্ত্রণ করে—বিশ্বাসরূপে, সংস্কাররূপে, ঘরোয়া ও সামাজিক আচার-আচরণরূপে, ন্যায়-অন্যায় চেতনারূপে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধরূপে। এক কথায় জীবনের মূল্য-বোধ মুখ্যত ধর্মমত থেকেই জাগে। কাজেই বাঙালী নির্বিশেষের অভিন্ন মানস-সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার মতো কচিৎ কিছু মেলে। তবু সাধারণভাবে কিছু আদিম বিশ্বাস-সংস্কার রূপান্তরে তথা ধর্মীয় সংস্কারে সমন্বিত হয়ে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিশেষ বাঙালীর সাধারণ আচরণের অবলম্বন হয়েছে। এবং সেখানেই কেবল বাঙালীর অভিন্ন সত্তার সন্ধান মেলে। তাই আমরা আজো হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের কিংবা অষ্ট্রিক-মঙ্গোলীয় ঐতিহ্যের এবং আচারের অনেক কিছুরই রেশ দেখতে পাই। আবার সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে যেহেতু সংস্কৃতি জীবিকাপদ্ধতি তথা আর্থিক নৈতিক শৈক্ষিক কালিক ও প্রাতিবেশিক পরিবেষ্টনী নির্ভর—সেহেতু সংস্কৃতিরও আঞ্চলিক,

সামাজিক, কালিক, শ্রেণীক ও ব্যক্তিক ভেদ থাকে। এই ক্ষেত্রে জানবার বুঝবার জন্যে সামান্যীকরণের রেওয়াজ চালু থাকলেও তা কখনো বিজ্ঞানসম্মত হয় না। অতএব ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলের ও ধর্মমতবাদীর আচরণে কিংবা জীবিকার ক্ষেত্রে আপাত অভিন্নতা থাকলেও মানসক্ষেত্রে তথা জীবন-ভাবনা এবং জগৎ-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থেকেই যায়। যেমন—ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকগুলো য়ুরোপীয় আচার-আচরণ ব্যক্তিক, ঘরোয়া এবং সামাজিক জীবনে গ্রহণ করেছে, তবু স্বাতন্ত্র্য-চেতনা হারায়নি। এতেই বোঝা যায় শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের মন-মত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমরা আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখতে পাই। পাকপ্রণালীতে, খাদ্যাখাদ্যনিরূপণে, তামা পিতল ও মাটির থালা-বাসন-গ্লাসের ব্যবহারে, ঘর-দোরস্থাপন পদ্ধতিতে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, মসজিদ-মন্দির-গির্জার আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে এ পার্থক্য সুপ্রকট। আসন ও শয্যাবিন্যাসে, দিক্ নির্বাচনে যেমন শাস্ত্রীয় স্বাতন্ত্র্য সুপ্রকট, তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বক্তব্যে, আদর্শে এবং লক্ষ্যেও এ স্বাতন্ত্র্য অলক্ষ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রসূত মূল্যবোধ ও সমস্যাই সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তাই গল্পে উপন্যাসেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জীবন সমস্যা ও সমাধান পন্থা অভিন্ন নয়। তা ছাড়া শাস্ত্রীয় প্রভাবে চিত্রশিল্পে, মূর্তিশিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে কারো অনীহা আবার কারো আগ্রহ জেগেছে। কেউ চর্চা করেছে, আবার কেউ বিরত থেকেছে। ফলে দৈশিক শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষ বাঙালীর অবদান নয়—আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থানভেদে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য সংস্কৃতি সভ্যতা স্বাতন্ত্র্যলাভ করে। বাংলাদেশেও সেই সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রূপ সর্বত্র দৃশ্যমান।

বাঙালীর মৌল ধর্ম

সাংখ্য এবং যোগ—এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত।

বাঙালীর শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানস প্রসূত। তেমনি অনাদি এবং আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাংলায় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন এবং যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতিলাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত মহেনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোন সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেহ শক-হুন-ইউচি-তুর্কী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশীদিন রক্ষা করতে পারেনি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম সংস্কৃতির পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া দেশী জন্মান্তরবাদ প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষ-দেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, কর্ম-বাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মানস প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্ব-ভারতীয় হলেও অস্ট্রিক, নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এসবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি এবং তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন ও একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন

মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্র—তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর্য আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্যশাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদালাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব—কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপলাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদি-রূপও—তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূর্য] দেবতার স্মারকগুণও বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত দেবাদিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগপন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথ-পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে এবং নাথপন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজাণ্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউয়েন সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনে-বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) এবং উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হুঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যেরই স্মারক।

'মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া।'

(গোরক্ষ বিজয়)

এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর।

এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের। দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতুহলী হয়েছে। দেহযন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা এবং পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুশ্চক্র বা ষট্‌চক্র, বিভিন্ন দল সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উল্টা সাধনা প্রভৃতির নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এ সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ—সূর্য বা অগ্নি, ঠ—চন্দ্র বা সোম। হঠ—শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে এবং বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যায়। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড'। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা এবং প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উত্তরাধী বা উত্যর দিসি সিধকা যোগ'—গোরখ বাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ পৃঃ ১৬]।

অতএব এই কায়াসাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করেনি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা-দেশে এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে—জালন ধারায়—সমন্দরে ?), কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয়

হয়েছিল।

পূরবদেশ পছাঁহী ঘাটি
(জনম) লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা ন'াবগর কহীএ
মেইট ভরম বিয়োগ—

(গোরখ বাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ)

—'পূর্বদেশে (আমার) জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে (আমি) যোগী গুরু (আমার) ভব-সাগরের নাবিক, আমি ব্রহ্মরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।'

শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের গোর্খা নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলাদেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল-গীতি, যোগীর গান ও যুগী কাচ আজো বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি ও চাঁড়ালই ছিলেন।

ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রনা পূতা (শিষ্য) জাতি হমারি তেলী
পীড়ি কোটা কাঢ়ি লীয়া পবন খলি দীয়ঁা ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়ঁা খুলি দীবী মেলী।

(গোরখ বাণী, পৃ ১১৭)

এতেও এঁদের বাঙালীত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণ অবধি সবকিছুর সন্ধান করেছেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র—শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃত রসে পরিণত করতে চেয়েছেন। শুক্রবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টি-শক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনীশক্তি অক্ষত থেকে আয়ুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির

পথ বন্ধ হলে ধ্বংসেরও পথ হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের—

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে

স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারামখানা।

বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাট দেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এর নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া বা আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজঃ ও শুক্ররূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজঃ-রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে।

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব এবং বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। তাই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়াপদ, বাউল গীতি, ধর্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষ বিজয়, অনিল-পুরাণ, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তাবিলনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আত্ম পরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধ প্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষ বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ-যোগ ও তন্ত্র বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধ-প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী—উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র শাসন। এখানেই অভিন্ন-সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীনকালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত বাঙালী ভারতবর্ষকে দান করেছে।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালী। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ'—অর্থে মূলত চৌরাশী-সিদ্ধা ব্যবহৃত (জ্ঞানপ্রদীপ, সৈয়দ সুলতান)। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস

শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা রূপকাত্মক। তিনি বলেন, 'চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যা মাত্র।' (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খাবিজয়'-এর ভূমিকা স্বরূপ নাথপন্থের 'সাহিত্যিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১-২। (৬)।) ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মনেও ছিল এ প্রশ্ন। (Obscure Religious Cult etc.)

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এই জন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় ধর্ম-মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালীর এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালীর জীবনে ও মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কাল-চক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্য-বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীরকেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর—যাদের দু'চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতি-নীতিতে আদিম Animism, Magic belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও ঋক্থের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিকভাবেই সত্য। তিনি বলেন,

It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilisation, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech...the ideas of 'karma' and transmigration, the practice of yoga, the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Krishna, the Hindu ritual of

puja as opposed to the vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the cocoanut etc. the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our pre-Aryan ancestors." (Indo-Aryan and Hindi, pp. 31-32)

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচার বর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচার বর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষনাথবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জালন্ধরীপাদের অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। আর পা পন্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধ মতভিত্তিক, তথা আদি সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্ম-জ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য মনন-প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এজন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ পবন আয়ত্তে এলে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও

জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও অপান বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা-বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয়:

> 'মন থির তো বচন থির
> পবন থির তো বিন্দু থির
> বিন্দু থির তো কন্ধ থির
> বলে গোরখদেব সকল থির।'

(অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১১৮)

বাঙালী মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু'চারটা আরবী-ফারসী পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং ডাকিনী প্রভৃতির বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়াসাধনাকে ইসলামী রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের 'বাসকানামায়' পাই:

> দিলসে বৈঠে রাম-রহিম দিলসে মালিক-সাঁই
> দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
> ধড়ে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা
> চাঁদযুক্ত মেবজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা।

(আবদুল করিম, প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ ১৩৮)

অতএব, বাঙলার বা বাঙালীর আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলাদেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুব্যাহৃত হয়েছে।

যোগ ও তন্ত্রের বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য, এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্যও—তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী

প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তথা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে (লাঙ্গলের ফাল) গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে (যাতে হল পড়েনি) প্রাণ দান প্রভৃতির রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছা-সিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কি বাধা আসে। কার্য-কারণ জ্ঞানের অভাবেও প্রাতিকূল্যের কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারেনি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র—কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তন সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। স্বপ্নও হয়েছে এ বিশ্বাসের সহায়ক।

আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গান ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্য কামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা এবং জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার।

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোন কোনটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত পরিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানবতারূপে পরিকীর্তিত। যে-কোন সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি। অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি এবং পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জন-মানবের জীবন-চেতনা ও জীবিকা-পদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণসংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালীর ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশী নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার বুঝবার প্রয়াস। লোকজীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রসাদ কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের এবং বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য প্রলেপে বাস্তব জীবনকে আড়াল করে, তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরীব-ঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখ-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্য-জীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্ম-প্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য

দর্শন আমার অধীত বিষয় নয়। দর্শনচর্চায় আমি অনধিকারী। কিন্তু ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে কারণ আবিষ্কার কিংবা লক্ষণ বিচার করে রোগ নির্ণয় ও নিদান নিরূপণ যেমন সম্ভব, তেমনি বাঙালীর আচার-আচরণে যে নীতি-আদর্শ অভিব্যক্তি পেয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বাঙালীয়ানার বা বাঙালীত্বের স্বরূপলক্ষণ জানা যাবে,—এ বিশ্বাসে আমি বাঙালীর ঐতিহাসিক আচরণের ধারা অনুসরণ করছি। এ বাঙালীর কোন্ জীবন-দৃষ্টির ও জগৎভাবনার ইঙ্গিত বহন করে—তার দার্শনিক স্বরূপ নিরূপণের দায়িত্ব দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দের।

প্রাণীমাত্রেই বাঁচতে চায়, আর বাঁচার প্রয়োজনেই আসে আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসারের বুদ্ধি ও প্রয়াস। অন্য প্রাণীর কাছে তা সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিমাত্র, মানুষের তা-ই জীবনসাধনা।

যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই ভয়-বিস্ময়-অসহায়তা। তাই জীবনের নিরাপত্তার জন্যে জীবনকে ও জীবনপ্রতিবেশকে চেনা-জানার মানবিক প্রয়াসও শুরু হয়েছে মানুষের আদিম অবস্থাতেই। মানবশিশুর মতো মানবিক প্রয়াসও হাত-পা নাড়ার, হামাগুড়ির ও হাঁটতে শেখার স্তর অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যেখানে উদ্যোগী-উদ্যমশীল বুদ্ধিমান মানুষ সুলভ ছিল, সেখানকার সমাজের বিকাশ হয়েছে দ্রুত। এভাবে কেউ সৃজন করে আর কেউ অনুকরণ করে এগিয়েছে। যারা সৃজনও করতে পারেনি, অনুকরণও করেনি, সেই আরণ্য-মানব আজো প্রায় আদিম স্তরেই রয়ে গেছে।

মানুষের মন-বুদ্ধি-প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে দুই ভাবে—ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর কাজে এবং মননের উৎকর্ষসাধনে। মূলত সবটাই ছিল জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। বিকাশের ধারায় জীবন যখন বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য পেয়ে পেয়ে জটা-জটিল হয়ে উঠল, তখন তনু-মনের চাহিদা বাহ্যত ভিন্ন হয়ে দেখা দিল। একদিকে আজ গ্রহাভিসারী যন্ত্র যেমন দেখছি, অন্যদিকে অস্তিত্ববাদাদি নানা তত্ত্ব-চিন্তারও তেমনি উদ্ভব হয়েছে। অজ্ঞতাপ্রসূত ভয়-বিস্ময়-কল্পনাই ক্রমে মানুষকে কারণ-ক্রিয়া সচেতন করে তোলে। ভয়-বিস্ময় থেকে যে-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং অজ্ঞের কল্পনা দিয়ে তার উত্তরস্বরূপ যে-জ্ঞান লব্ধ, তা কখনো

যথার্থ হতে পারে না। তবু কৌতূহলী মন বুঝ মানে না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার, সাধ ও সাধ্যের, প্রয়াস ও প্রাপ্তির অন্তরায়রহস্য মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই ভাবনা সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, টোটেম-ট্যাবু তত্ত্ব প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে। তার বিসূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপ পাই পুরাতত্ত্বে বা Metaphysics-এ। অদৃশ্যকে দেখার, অধরাকে ধরার, অচিন্ত্যকে চিন্তাগত করার, অজ্ঞেয়কে জানার এই প্রয়াস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অসাফল্যে বিড়ম্বিত। তবু 'নিশি-পাওয়া' লোকের মতো কিংবা বিবাগীর মতো পথ চলে পথের দিশা খুঁজে অনিঃশেষ পথে বিচরণের আনন্দটাকে বিশ্বাসীজন জীবনের পরম সার্থকতা বলেই মানে।

জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসের জন্ম। বন্ধ্যা মনেই বিশ্বাসের লালন, যুক্তিহীনতায় বিশ্বাসের বিকাশ। কাজেই যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পুতুলে চক্ষু বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি দানের অপপ্রয়াসেরই নামান্তর।

কিন্তু চিরকাল অজ্ঞ-অসহায় মানুষ বিশ্বাসকে আশ্রয় করে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভরসা পেতে চেয়েছে, চেয়েছে নিশ্চিন্ত হতে। তাই তার কল্পনালব্ধ জ্ঞান তাকে চিরকালই আশ্বস্ত করেছে।

এই জ্ঞানই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রজ্ঞা নামে হয়েছে পরিচিত। এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞাশ্রয়ী শাস্ত্রই ধর্ম ও ধর্মবোধরূপে সমাজে পেয়েছে স্থিতি। শাস্ত্র অবশ্য সেদিন গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বৃহত্তর গণসমাজ গড়ে তুলে মানুষের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল। তাই তখনকার শাস্ত্রের কালিক উপযোগ অবশ্যস্বীকার্য। এই Metaphysical জ্ঞান-তত্ত্ব বিশ্বাসের অঙ্গীকারে দৃঢ়মূল হয়ে আচার-সংস্কারে পরিণতি পায়। তখন লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও জীবনযাপনের দিশারী হয়ে উঠে। তখন বিশ্বাস-সংস্কারের নিয়ন্ত্রণেই মানুষের জীবন যান্ত্রিকভাবে হয় চালিত। তখন তনুর জীবন ও মনের জগৎ হয়ে পড়ে আলাদা। এবং মানুষ তখন তনুকে তুচ্ছ জেনে মনকে করে তোলে উচ্চ। তেমন স্তরের মনের প্রেরণায় উচ্চারিত হয়—

'বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।'

এই Metaphysical তত্ত্বের প্রসারে পাই Philosophy. Philosophy-র

সাধারণ অভিধা হচ্ছে 'প্রজ্ঞা-প্রীতি', 'দর্শন'-এর সাধারণ লক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখা। দুটোই মূলত এক,—চেতনার গভীরে জীবন সম্পৃক্ত জগৎকে কিংবা জগৎ-প্রতিবেশে জীবনকে তার সামগ্রিক স্বরূপে ও তাৎপর্যে উপলব্ধি বা ধারণ করার চেষ্টা।

সাধারণভাবে দর্শন শাস্ত্রাশ্রয়ী অর্থাৎ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধানই ছিল দার্শনিকদের লক্ষ্য। এতে যে প্রত্যয়ানুগত্য, প্রতিজ্ঞানুসরণ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্টতা ছিল, তাতে সংকীর্ণ-সরণীতে মানস-বিচরণ সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ, অনপেক্ষ কিংবা সার্বিক শ্রেয়সের তত্ত্ব থাকত অনায়ত্ত। বলতে গেলে পুরোনো কালে কেবল গ্রীসে ও ভারতেই বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা কিছুকাল প্রশ্রয় পেয়েছিল।

কোন সীমিত চিন্তাই অখণ্ড তত্ত্ব বা সত্যের সন্ধান পায় না। শাস্ত্রীয় দর্শনও তা-ই দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-গোত্রের ছাপ এড়িয়ে সর্বজনীন হতে পারেনি। আবার বিশুদ্ধ তত্ত্ব-চিন্তাও শাস্ত্রানুগত বিশ্বাসী মানুষকে তার সংস্কার-লালিত পুরোনো প্রত্যয়ের দুর্গ থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই দর্শন-চর্চা ব্যক্তিক রুচি, মন ও মনন যতটা উন্নত ও প্রসারিত করে, সমাজমনে তার প্রভাব ততটা পড়ে না। তবু একসময় আচার-সংস্কাররূপে তার তাত্ত্বিক প্রভাব গোটা সমাজ-মানসকে চালিত করে। দর্শনের গুরুত্ব এবং সার্থকতা তাই অপরিমেয়। বলা চলে মানব সংস্কৃতির উৎকর্ষ পরোক্ষে দর্শন ও দার্শনিকেরই দান।

ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার বাঙলার এবং বাঙালীর দর্শনের কথা বলি।

বাঙালীরা রক্তসঙ্কর জাতি। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার অবশ্য আজো অনির্ণীত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তরভাগ অস্ট্রিক, বিশভাগ ভোট চীনা, পাঁচ ভাগ নিগ্রো এবং বাকী পাঁচ ভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালী-ধমনীতে। বাঙলাদেশও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ভৌগোলিক বিচারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই অন্তর্গত। বাহ্যত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর ভারত-প্রভাবিত হলেও অন্তরে এর মানস-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কখনো হারায়নি। মিশ্ররক্তপ্রসূত স্বভাবের সাঙ্কর্যই হয়তো বাঙালীর এই অনন্যতার কারণ। অবশ্য তার সবটা কল্যাণপ্রসূ হয়নি কখনো।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বরণের মাধ্যমে বাঙালীর সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় ভাবা

সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিচয় ঘটে। এভাবেই বাঙালীর আর্যায়ণ সম্ভব হয়। এতে বর্বর যুগের বাঙালীর ভাষা-পোশাক, বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়মনীতি, প্রথা-পদ্ধতির প্রায় সবখানিই বাহ্যত পরিত্যক্ত হয়। তবু থেকে গেছে বিশ্বাস-সংস্কারের অনেকখানি—যার স্থিতি বাঙালীর মর্মমূলে। এই থেকে-যাওয়া অবিমোচ্য স্বাতন্ত্র্য এবং স্ব-ভাবই তার অনন্যশক্তির উৎস ও স্বতন্ত্র-স্থিতির ভিত্তি।

বাঙালী বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু কোন ধর্মই সে অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমতো রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম এখানে মন্ত্রযান-কালচক্রযান-বজ্রযান-সহজযানে বিকৃতি ও বিবর্তন পায়। বৌদ্ধ চৈত্য হয়ে ওঠে অসংখ্য দেবতা-অপদেবতার আখড়া। জৈনধর্ম পরিত্যক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মও স্থানিক দেবতা উপদেবতা-অপদেবতার প্রবল প্রতাপের চাপে পড়ে যায়। ইসলামও ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনের আগে পীরপূজায় অবসিত হয়। বিদ্বানেরা এর নাম দিয়েছেন লৌকিক ইসলাম। উল্লেখ্য যে, এসব দেবতা-পীর ঐহিক জীবনেরই ইষ্ট বা অধিদেবতা—পারত্রিক পরিত্রাণের নয়। এতেই বোঝা যায় বাঙালী ঐহিক জীবনবাদী অর্থাৎ জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যকামী—ভোগলিপ্সু। অবশ্য সব ধর্মই কালে কালে স্থানে স্থানে বিকৃত হয়, কিন্তু বাঙালীর ধর্মের বিকৃতিতে বাঙালী-স্বভাব এবং মনন যত প্রকট, এমনটি অন্যত্র বিরল। বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে, তার কারণ বাঙালী কখনো তার অনার্য সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র নামের দর্শনে এবং চর্যায় তার আস্থা ও আনুগত্য হারায়নি। ঐ নিরীশ্বর তত্ত্বে ও চর্যায় তার নিষ্ঠা কিছুতেই কখনো বিচলিত হয়নি। তার কারণ বাঙালী মুখে মহৎ বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু আসলে সে এ জীবনকেই সত্য বলে মানে এবং পারত্রিক সুখকে সে মায়া বলেই জানে। তাই সে এই মাটির মায়াসক্ত জীবনবাদী। সে বস্তুতান্ত্রিক, ভোগলিপ্সু, তাই সে সশরীরে অমরত্বকামী। এজন্যেই সাংখ্যের প্রাণ-রসায়নতত্ত্ব, আয়ুবর্ধক যোগ ও শক্তিদায়ক তন্ত্র তার প্রিয় হয়েছে। চিরকালই তার সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসা ও প্রয়াস জীবনভিত্তিক এবং জীবনকেন্দ্রী। তার সাধনা বাঁচার জন্যেই। তাই সে দেহাত্মবাদী। সে জানে দেহাধারস্থিত চৈতন্যই জীবন। দেহ ও আত্মার আধার-আধেয় সম্পর্ক, একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। তার কাছে ভবসমুদ্রে দেহ হচ্ছে মন-পবনের নাও। মন-পবনের সংস্থিতি এবং সহস্থিতিই রাখে দেহ-নৌকা

ভাসমান ও সচল। তবে যৌগিক চর্যার মাধ্যমে দেহকলে বায়ু সঞ্চালন আয়ত্তে রাখতে হয়। আর ভূতসিদ্ধির জন্যে তান্ত্রিক সাধনা। স্ব-স্ব আঙুলের মাপের চৌরাশি আঙুল পরিমিত দেহ-নৌকাকে কাণ্ডারীর মতো স্বেচ্ছা-পরিচালনার শক্তি যে অর্জন করে সে-ই হচ্ছে চৌরাশি-সিদ্ধা। এ সাধনা ভোগলিপ্সুর দীর্ঘ-জীবনোপভোগের সাধনা। আত্মরতিই তার মূল জীবন-প্রেরণা। তাই স্ব-স্বার্থেই সে নিঃসঙ্গ সাধনা করে। আত্মকল্যাণেই সে সদ্‌গুরুর দীক্ষা কামনা করে বটে, কিন্তু তার আত্মিক কিংবা অধ্যাত্মসাধনায় সমাজ-চেতনা নেই। এই জীবনতত্ত্ব তার বৈষয়িক জীবনকেও গভীরভাবে করেছে প্রভাবিত। বজ্রযানী ও সহজ-যানীরা ছিল যোগতান্ত্রিক—তাদের লক্ষ্যই ছিল আত্মকল্যাণ ও আত্মমোক্ষ। বজ্র-সহজযানীর উত্তর-সাধক সহজিয়া বৈষ্ণব কিংবা বাউলেরা আজো তাই ভোগমোক্ষবাদী। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমমোক্ষবাদও কোন পার্থিব কিংবা সামাজিক শ্রেয়সের সন্ধান দেয়নি। সবাই আত্মকল্যাণেই বৈরাগ্যবাদী। বাস্তব ও বৈষয়িক জীবনকে তুচ্ছ জেনে ঐসব পরান্নজীবী মোক্ষকামীরা বাঙালীর সমাজে-সংসারে বৈরাগ্য মাহাত্ম্য প্রচার করে বাঙালীর ক্ষতি করেছে অপরিমেয়। কেননা, যে মানুষ ভোগলিপ্সু অথচ কর্মকুণ্ঠ তার জীবিকা অর্জনের পথ দুটো—ভীরুর পক্ষে ভিক্ষা এবং সাহসীর জন্যে চুরি। বৈষয়িক দায়িত্বে এবং কর্তব্যে ঔদাসীন্য ও ভিক্ষাজীবিতা এদেশে অধ্যাত্মসিদ্ধির রাজপথ বলে অভিনন্দিত হয়েছে সেই ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন মুনি-ঋষি-যোগী-শ্রমণদের আমল থেকেই। ফলে আজো ভিখিরীরা সাধু-ফকিররূপে সম্মানিত। এদেশের বামাচারী-ব্রহ্মচারী যোগী-সন্ন্যাসী কিংবা পীর-ফকিরেরা পারত্রিক শ্রেয়সের নামে মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট করে বৈষয়িক জীবনকে বন্ধ্যা করে রাখতে চেয়েছে চিরকাল। জাগতিক কর্মে ও কর্তব্যে কখনো তাদের অনুপ্রাণিত করেনি কেউ। কিন্তু তত্ত্বকথা শুনতে ভাল হলেও তাতে জৈব প্রয়োজন মেটে না, তাই মানুষ প্রবৃত্তি-বশেই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মকল্যাণ খুঁজেছে। বহুজন-হিতে বহুজন-সুখে যেহেতু কখনো সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রেরণা মেলেনি, সেহেতু বাঙালীমাত্রেই ব্যক্তিক লাভ এবং লোভের সন্ধানে ফিরেছে কালো পিঁপড়ের মতো। সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে সামগ্রিক কল্যাণলক্ষ্যে যে যৌথ প্রয়াস আবশ্যিক, তার অভাবে বাঙালী কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি স্বয়ম্ভর কিংবা স্বাধীন-ভাবে। তাই সে চিরকাল বিদেশী-বিভাষী-শাসিত ও শোষিত। বিরুদ্ধ পরিবেশে

তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার উদ্যম স্বার্থপরতায়, তার শক্তি ঈর্ষায়, অসূয়ায় ও পরস্বাপহরণে অবসিত। এবং সে আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে দেবানুগ্রহে ও পরানুগ্রহে বাঁচতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সে স্ব-সৃষ্ট দেবাশ্রিত। লৌকিক দেবতা এবং কাল্পনিক পীরপূজার উদ্ভব ও প্রসার বাঙলাদেশে এভাবেই ঘটেছে এবং ঘটেছে অন্তত ঐতিহাসিকভাবে বৌদ্ধযুগ থেকে। জীবন-জীবিকার অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিকে তোয়াজে-তোষামোদে তুষ্ট রেখে দেবানুগ্রহে নিশ্চিন্ত-নিষ্ক্রিয় জীবনোপভোগকামী বলেই কর্ম ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আত্মশক্তির এবং পৌরুষের প্রয়োগ বাঙালী জীবনে বিরলতায় দুর্লভ।

অতএব কর্মকুণ্ঠ ভোগলিপ্সু বাঙালীর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা দু'ভাবে প্রকটিত হয়েছে : এক, দীর্ঘজীবনলাভ ও জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ-বাঞ্ছায় অলৌকিক শক্তিধর হবার জন্যে দেহাত্মবাদী বাঙালীর যোগতান্ত্রিক সাধনায় এবং তুক-তাক, বাণ-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, দারু-উচাটন, যাদুমন্ত্র, কবচ-মাদুলী, মারণ-বশীকরণ প্রভৃতি অনুশীলনে ও প্রয়োগে ; দুই, বিভিন্ন শক্তি ও ফলপ্রতীক স্ব-সৃষ্ট লৌকিক দেবতা ও পীরের স্তুতি-স্তাবকতায়। এবং সবটাই চলেছে বিদেশাগত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী শাস্ত্রের নামে। যদিও তখনো মূল শাস্ত্রগুলোও শাস্ত্রবিদ এবং সমাজপতির স্বার্থে ক্ষীণভাবে চালু ছিল।

ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে বাঙলায় স্মরণীয় পুরুষ বিরল ছিলেন না। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-শীলভদ্র-দীপঙ্কর-অম্বরনাথ-হাড়িপা-কানুপা-রামনাথ-রঘুনাথ-রঘুনন্দন চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ প্রমুখ অনেকেই বাঙালী মনীষার প্রমূর্ত প্রতীক। কিন্তু এঁদের দেহাত্মবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, প্রেমবাদ, সেবাবাদ কিংবা শাস্ত্রানুগত্য মাটির মানুষের কোন জাগতিক কল্যাণসাধন করেনি।

মধ্যযুগে বিজাতি-বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্জিত শ্রেণীর মধ্যে যে চেতনা, চাঞ্চল্য ও দ্রোহ দেখা দিল, উত্তর-ভারতীয় আদলে ইসলামী সাম্য ও সূফীতত্ত্বের অনুসরণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশ বাঙলায় চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তা রূপ পেল। এই বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন এবং ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল বটে, কিন্তু তা পরিণামে বাঙালীর পক্ষে কল্যাণকর হয়নি আবার উনিশ শতকে কলকাতায় ম্লেচ্ছস্পর্শদোষে সমাজ পরিত্যক্ত ভদ্রলোকদের হিন্দু রাখার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রামমোহন প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মমত।

উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনটাই সমাজ-বিপ্লবের রূপ নিয়ে বাঙালী জীবনে সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার কিংবা চেতনায় নবরাগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাস্তব এবং বৈষয়িক জগৎকে আড়াল করে দেহাত্মবাদী বাঙালী নিঃসঙ্গভাবে যে আত্ম ও আত্মিক উন্নয়ন কামনা করেছে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে তা মনন ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে গৌরব-গর্বের বিষয় ছিল। তার মনন ও জীবনদৃষ্টি ঐহিক-পারত্রিক সুখলোভী আস্তিক মানুষের আত্ম-প্রীতিপ্রবণ চাহিদা মিটিয়েছিল। এদেশে আজীবিক ছিল, কপিল চার্বাক-চেলা নাস্তিক ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণবাদপ্রসূত উচ্চ দার্শনিক চিন্তার প্রসূন শূন্য ও বজ্রতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল। গুণরত্ন-চেলাদের লোকায়তিক দর্শন বিকাশ পেয়েছিল। প্রতিবেশী ভোট-চীনার প্রভাবে যোগ-তান্ত্রিক সাধনাও প্রাধান্য পেয়েছিল। আজো বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনামাত্রেই যোগ-তন্ত্রভিত্তিক। শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ, গৌড়ীয় ন্যায়, গৌড়ীয় স্মৃতি, পীর-নারায়ণ-সত্যের অভিন্ন অঙ্গীকারে মানুষের মিলনসাধনা, শাক্তদের নবমাতৃতত্ত্ব—রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণে যার বিকাশ, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি মননক্ষেত্রে বাঙালীর বিশ্রুত অক্ষয় কীর্তি।

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয়তো বাঙালী মননের ঐ ধারায় ত্রুটি আবিষ্কার করবেন। তাঁরা বলবেন, চিরশোষিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের এবং বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে, তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে সেই নির্মিত ভুবনে বিহার করে সার্থককাম, আনন্দিত হতে চেয়েছে পৌরুষহীন, কর্মকুণ্ঠ, দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। কিন্তু রক্তসঙ্কর বাঙালীর মন ও রুচি আলাদা। কবির ভাষায় তার বক্তব্য হয়তো এরূপ :

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ
যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে।
যার যাহা আছে তার থাক তাই

বাঙালীর এ অবদান চিন্তাজগতে তথা বিশ্বের মনন সাহিত্যে আমাদের কীর্তি-মিনার।

বাঙালীর জীবন-দৃষ্টি এরূপ ভিন্ন ছিল বলেই সে অতীতে কখনো রাজ্য-গৌরব, শাসনদণ্ড, ধনগর্ব, ক্ষমতার দাপট কিংবা বাহুবলের প্রতাপকামনায় বা অর্জনে উৎসাহ বোধ করেনি। সে নিজের মতো করে নিজেকে জেনেই তৃপ্ত থেকেছে, আত্মসমাহিত জীবনে সে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট রয়েছে। দুর্বৃত্তের সামাজিক ও দুর্ধর্ষের রাষ্ট্রিক শাসন-পীড়ন, শোষণ-পেষণ তাকে মনের দিক দিয়ে বিচলিত করেনি, করেনি স্বভাবভ্রষ্ট। কিন্তু সমাজস্বার্থ নিরপেক্ষ ঐ জীবনতত্ত্ব বাঙালীর বৈষয়িক ও নৈতিক জীবন বিড়ম্বিত করেছিল। সমাজের বিশেষ মানুষ যখন জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণে ও মোক্ষতত্ত্ব আবিষ্কারে নিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত, তখন সাধারণ মানুষ জৈবিক ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, শ্রেষ্ঠ মানুষের নেতৃত্বের ও নির্দেশের অভাবে, ব্যক্তিগত প্রয়াসে প্রাণ বাঁচানোর যথেচ্ছ উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত। যারা বাঙালীর জীবন-দৃষ্টির খবর জানত না, সেই বিদেশী শাসক পর্যটকরা হাটের-ঘাটের-বাটের-মাঠের ইতর মানুষকে বাঙলার ও বাঙালীর প্রতি-নিধি স্থানীয় মানুষ বলে গ্রহণ করেছে। আর ভেতো, ভীতু, ধূর্ত, প্রতারক, কর্মকুণ্ঠ ও মিথ্যাভাষণে পটু বলে বাঙালীর নিন্দা রটিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে। নিন্দিত বাঙালী আজো তা স্মরণে লজ্জিত হয়।

এ অবধি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর জগৎচেতনা ও জীবন-ভাবনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে প্রয়াস পেয়েছি। এবার আধুনিক বাঙালীভাবনার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে প্রতীচ্য শাসন ও শিক্ষার, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বিশ্বের উন্নত ও জাগ্রত জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালীর মানস-সংযোগ ঘটে। এর ফলে এদেশের জড় সমাজে বিচলন ও সংস্কার-জীর্ণ বন্ধ্যা চিত্তে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বন্দর-নগরী ও রাজধানী কলকাতায় নবশিক্ষিতরা দেখল রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভেলিউশনের প্রসাদ-পুষ্ট ও ইনকুইজিশন-মুক্ত বুর্জোয়া য়ুরোপ বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে-সাম্রাজ্যে, ধনে-যশে-মানে, সেবায়-সৌজন্যে-মানবতায়, উদ্যোগে-উদ্যমে-প্রাণময়তায়, প্রতাপে-প্রভাবে-দাপটে প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো আশ্চর্য বিভায় শোভমান। আর নিজেদের প্রতি তাকিয়ে দেখল সংস্কারজীর্ণ, আচারক্লিষ্ট

বন্ধ্যাসমাজ মধ্যযুগের বর্বর নারকীয় পরিবেশে স্থির হয়ে আছে। এ লজ্জা তাদের শিক্ষার্জিত নব জীবন-চেতনায় ও নবলব্ধ আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানল। য়ুরোপীয় আদলে জীবন রচনার ও সমাজ গড়ার এক অতি তীব্র অন্ধ আবেগ তাদের পেয়ে বসল। জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নতুন কিছু করার জন্যে তাই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল—বলা চলে আবেগ-প্রাবল্যে উৎকণ্ঠাবশে তারা দিশে-হারার মতো ছুটোছুটি শুরু করল।

কিন্তু গোড়ায় রয়ে গেল গলদ। য়ুরোপ তাদের মনে যত আকাঙ্ক্ষা জাগাল, যত উত্তেজনা দিল, সে পরিমাণে 'য়ুরোপীয় চিত্ত' তাদের বোধগত হল না। তাই তাদের আন্তরিক প্রয়াস প্রত্যাশা পূরণে হল ব্যর্থ। প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতাপ্রীতি, কল্যাণবাদ, মানবতা, প্রগতি, লোক-হিত, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনটাই স্বরূপে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে, প্রগতির নামে নির্লক্ষ্য দ্রোহকেই তারা বরণ করে। লোকহিত তাদের কাছে ছিল স্বশ্রেণীর কল্যাণ-বাঞ্ছা মাত্র। জাতীয়তা তাদের কাছে স্থান-কালহীন স্বধর্মীর সংহতি মাত্র। বাঙলার প্রশাসনিক ক্রান্তিকালে অন্ধ বিজাতি-বিদ্বেষ যেমন ফকির-সন্ন্যাসীদের নির্লক্ষ্য লুটেরা বানিয়েছিল, তেমনি ওহাবীদের কিংবা আর্যসমাজীদের করেছিল স্থান-কালহীন স্বধর্মীর হিতবাদী, তেমনি রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম হয়েছিলেন স্বশ্রেণীর কল্যাণকামী। সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জেগে-ছিল বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলনে, বহুবিবাহ নিবারণে কিংবা নারী-পর্দা বর্জনে ও নারীশিক্ষা দানে বাস্তব উৎসাহ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা প্রীতি জাগল, ফরাসী বিপ্লব মুগ্ধ করল এবং সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-স্বাধীনতা সার্বক্ষণিক উচ্চারণের বিষয় হল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি, সমর্থন পায়নি সিপাহী-বিপ্লব। কোঁতের হিতবাদ ও নাস্তিকতা শিক্ষিত বাঙালীর—বঙ্কিমেরও মন হরণ করল বটে, কিন্তু নাস্তিক রইল দুর্লভ, গণমানবের হিত-কামনা রইল বিরল। রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের লোকসেবা দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত—মানবতার নামে উৎসর্গিত নয়। জমিদারসমিতি গড়ে উঠল, কৃষকসমিতি তৈরী হল না। য়ুরোপে দেখল রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, আর নিজেদের জন্যে কামনা করল ধর্মীয় জাতি-সত্তা। তাই বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হয়েছে, মুসলিম হয়েছে মুসলিম—কেউ বাঙালী থাকেনি। হিন্দু কংগ্রেস ময়দানী বক্তৃতায় ভারতবাসীমাত্রেরই

মিলন ও সংহতি কামনা করেছে কিন্তু নির্জিত স্বধর্মীর কায়িক স্পর্শকে জেনেছে অপবিত্র বলে। তাই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগই এদেশে টিকল, বাঙালী হিন্দু দিল্লীর অভিভাবকত্বে পেল স্বস্তি, বাঙালী মুসলিম করাচীর কর্তৃত্বে হল নিশ্চিন্ত। বাঙলা ও বাঙালী যে খণ্ডিত হল, বিচ্ছিন্ন হল, তাতে দুঃখ করবার রইল না কেউ। দেশ নয়, ভাষা নয়, গোত্র নয়, ধর্মই আজো বাঙালীর জাতীয়তার ভিত্তি।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী-হিন্দু প্রেরণার উৎসস্বরূপ গৌরব-গর্বের ঐতিহ্যিক অবলম্বন খুঁজেছে আর্যাবর্তে, ব্রহ্মাবর্তে, রাজপুতানায় ও মারাঠা অঞ্চলে, মুসলিমরা ঢুঁড়েছে আরবে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। এমনকি দেশের এযুগের মহত্তম মানবতাবাদী পুরুষ রবীন্দ্রনাথও এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। পাণ্ডববর্জিত বাঙলার অধিবাসী হয়েও ব্রাহ্মণ্যসংস্কারবশে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের আর্য উত্তরভারতে, রাজপুতানায়, মারাঠা অঞ্চলে, শিখ ইতিহাসে ও বৌদ্ধ পুরাণে স্বজাতির গৌরব-গর্বের ইতিকথা খুঁজেছেন, বিদেশী তুর্কী-মুঘলের প্রতি অশ্রদ্ধাবশে সাতশ বছরের ভারত-ইতিহাসকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে অস্বীকৃত হয়েছে সাতশ বছর কালপরিসরে দেশী মুসলিমের অস্তিত্ব। স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন-যুগান্তর-সুভাষ-সূর্যসেনপন্থীরাও কালীমাতার সন্তানরূপে হিন্দুভারতেরই স্বাধীনতা কামনা করেছে, তার আগেও হিন্দু-মেলাওয়ালারা স্বধর্মীর বাঙলা তথা ভারতেরই স্বপ্ন দেখেছে। সন্ত্রাসবাদী স্বদেশপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ মানবকল্যাণকামী হয়েও অবশেষে যোগীসাধক শ্রীঅরবিন্দ রূপে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার চোরাবালিতে মানব-মুক্তির সন্ধান করেছেন। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব বাঙলায় বা ভারতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিতদের কেউ মনের দিক দিয়ে সুস্থ ও স্বস্থ ছিলেন না। তাঁরা কেবল হিন্দু কিংবা শুধু মুসলমান ছিলেন। যে প্রতীচ্য বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্র তাঁদের আধুনিক জীবন-ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে, তার Spirit চেতনার গভীরে ধারণ করা যায়নি বলে তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে বিকৃতি ও বৈপরীত্য এসেছে। ফলে তাঁদের সব প্রয়াস অসামঞ্জস্যের শিকার হয়ে বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হয়েছে। প্রতীচ্যের অনুকৃতি ও প্রাচ্য-স্বভাবের টানাপোড়েনে আলোচ্য যুগের কথায় ও কর্মে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও আধুনিকতার আবরণ উন্মোচন করলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-তিতুমীর-দুদুমিয়া-মেহের-

শাহ্-মৌলানা বাকী-আকরম খাঁ সবাইকেই আদি এবং অকৃত্রিম বাঙালী মন ও মননের প্রতিভূরূপেই দেখতে পাই। সেই শ্রেণী-চেতনা, সেই স্বাধর্ম্য, সেই বৈরাগ্য, সেই আধ্যাত্মিকতা, সেই সংকীর্ণজীবন-চেতনা ও বাস্তব বিমুখিতা, সেই নিঃসঙ্গতা, সেই আত্মরতি তাদের মনে-মননে, কথায়-কর্মে অবিকৃতভাবেই অবিরল রয়েছে। চোখধাঁধানো ও মনভোলানো আধুনিকতা তাদের মনে-মননে প্রলিপ্ত চন্দনের মতোই বিজড়িত বটে কিন্তু অন্তরঙ্গ নয়। তাই যে-মাটি মায়ের বাড়া, হাজার বছরের পরিচিত জ্ঞাতি-বিধর্মী যে প্রতিবেশী তাদের পর করে পরকে প্রিয় ভাবতে তারা এতটুকু বেদনাবোধ করেনি। গত দেড়শ বছর ধরে বাঙলাদেশে বঙ্গপ্রবাসী হিন্দু ছিল, মুসলমানও ছিল কিন্তু বাঙালী ছিল না।

দৈশিক জাতীয়তায় বাঙালী দীক্ষিত হয়নি, এ যন্ত্রযুগেও যৌথকর্মে পায়নি দীক্ষা। জনে জনে জনতা হয়, মনের 'সায়' না থাকলে একতা হয় না, একত্রিত হওয়া সহজ কিন্তু মিলিত হওয়া সাধনাসাপেক্ষ। সে-সাধনা বাঙালী করেনি, তাই আবেগবশে সে ক্ষণিকের জন্যে উদার হয়, উত্তেজনাবশে সে ক্ষণিকের জন্যে মরণপণ সংগ্রামে নামে, মৌহূর্তিক স্বার্থবশে ঐক্যবদ্ধও হয় কিন্তু কোনটাই টেকে না। তাই চৈতন্যের সাম্য ও প্রীতিভিত্তিক প্রেমবাদও বাঙলায় ব্যর্থ হল। এজন্যে বাঙালী বৈষয়িক জীবনে কোন বৃহৎ কর্মে উদ্যোগী হলেও সফল হয় না। লীগ-কংগ্রেসের জন্ম বাঙলায়, বিদ্বান বুদ্ধিমানও বাঙলায় সুলভ ছিল, তবু নেতৃত্ব বাঙালীর হাতে থাকেনি। সঙ্ঘশক্তি নেই বলে সে চিরকাল বিদেশী শাসিত-শোষিত ও দুঃস্থ। নিজে বঞ্চিত হয়েও স্বধর্মীর গৌরব ও ঐশ্বর্যগর্বে সে গর্বিত ও আনন্দিত থাকে।

আজো বাঙলাদেশে এমন একজন অবিসম্বাদিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানবতাবাদীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁকে আদর্শ মানুষ ও মানবপ্রেমিক বা নিরপেক্ষ গণকল্যাণ-কামী পুরুষ বা নারী হিসেবে সন্তানের সামনে অনুকরণীয় বলে স্মরণ করা যায় কিংবা ঘরে প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখা চলে অনুপ্রাণিত হবার সদুদ্দেশ্যে। সমাজের বা ইতিহাসের এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে মার্কসবাদ জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত হতে থাকে। তার কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়ায় দরিদ্র দেশের মানুষ পুরোনো 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বাদ সমর্থিত কেড়ে-মেরে-শোষণে-বঞ্চনায় বাঁচার তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে

মার্কসীয় বণ্টনে বাঁচাতত্ত্বে ভরসা রাখে। মানবিক সমস্যা সমাধানের এই নতুন প্রত্যাশা হতাশ মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত করে তোলে। তাই আজকের দুনিয়ায় নিঃস্ব, দুঃস্থ গণমানবের জিগির ও স্বপ্ন হচ্ছে সমাজবাদ ও সাম্যবাদ। এ তত্ত্বের মূলকথা আধুনিক কায়াসাধন—তনুর সেবা। কাজেই এ তত্ত্বে আসমানী কিছুই নেই, আছে মানুষকে প্রাণী হিসেবে গণ্য করে প্রাণে বেঁচে থাকার জন্মগত মৌলিক ও সঙ্গত অধিকারে স্বীকৃতি দান। শারীরিক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণতত্ত্বভিত্তিক বলেই এ হচ্ছে নিতান্ত বস্তুবাদী দর্শন। কাজেই সমাজ বা সাম্যবাদী মাত্রেই মানবতাবাদী এবং মানবতাবাদে দীক্ষার প্রথম শর্ত হচ্ছে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসেবে জানতে ও মানতে হবে। মানুষের মৌল মানবিক অধিকার সর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। অতএব সমাজবাদ কিংবা সাম্যবাদ অঙ্গীকার করতে হলে পুরোনো শাস্ত্রে এবং সেই শাস্ত্রভিত্তিক সমাজে ও সরকারে আনুগত্য পরিহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ এ-গুলোর ভিত্তিই হচ্ছে দল-চেতনা। মানুষে মানুষে বৈরিতা ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। সম ও সহস্বার্থেই দল গড়ে উঠে। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্য দলের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ না করলে স্বদলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় না। সব দলই এক রকম। পার্থক্য কেবল এই যে শাস্ত্রীয় দল অর্থাৎ ধর্ম সম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবনসম্পৃক্ত বলে অনন্ত শাস্তির ভয়ে ঐটিতে মানুষের জীবনব্যাপী অনড় আনুগত্য থাকে। অন্য পার্থিব দল সময় ও সুযোগমতো স্বার্থবশে ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়েই বদল বা লোপ করা চলে। কিন্তু শাস্ত্রীয় দল অবিনশ্বর। এ কারণে ধর্মীয় দলের কোন্দল চিরন্তন ও মারাত্মক। অতএব শাস্ত্রীয় আনুগত্য পরিহার করেই কেবল মানুষ উদার মানবতাবোধে নির্বিশেষ মানবের মিলন-ময়দান তৈরী করতে পারে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা হারালেই মন-বুদ্ধি মুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়। অন্য পার্থিব দল ক্ষণজীবী, সেজন্যে সেগুলো কোন স্থায়ী ও সর্বজনীন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই অন্য দল মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব সমাজবাদী বা সাম্যবাদী তথা মানবতাবাদী হতে হলে প্রথমেই শাস্ত্রীয় আনুগত্য তথা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার আবশ্যক। তা হলে সে-সঙ্গে শাস্ত্রভিত্তিক পুরোনো সমাজ

সরকারে আনুগত্যও লোপ পাবে। আজকের মানবশাস্ত্র ও মানবধর্ম হবে—সম-স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের স্বীকৃতিতে বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকার।

উগ্রজাতীয়তা, গোত্রদ্বেষণা, বর্ণবিদ্বেষ ও ধর্মভেদ প্রভৃত অভিশাপ বিমোচনের অঙ্গীকারে ডক্টর গোবিন্দ দেব প্রমুখ চিন্তাবিদেরা সহিষ্ণুতাভিত্তিক যে সমন্বয়ী মানবতার তত্ত্ব প্রচারে উৎসুক, তা বুর্জোয়া উদারতার পরিচায়ক মাত্র। শুনতে ভালো হলেও সেই পুরোনো তত্ত্বে মানবিক সমস্যা সমাধানের শক্তি নেই, কোনকালে ছিলও না। ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা সোনার পাথরবাটি বানানোর মতই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা এবং পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞাই শাস্ত্রানুগত্য বা ধার্মিকতার মৌল শর্ত। একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর সহিষ্ণু হতে পারেন কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধাবান হতে পারেন না।

আজ দেশে সমাজতন্ত্রের জিগির উঠেছে, এ উচ্চারিত বুলি বুকের সত্য হয়ে উঠলে আমাদের প্রত্যাশিত সুদিন শিগগিরই আসবে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার করলে বাঙালীর স্বভাব বদলাবে। বাঙালী আধুনিক জাগ্রত ও স্বস্থ বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠবে আর একান্তই বাঙালী থাকবে না। নিরীশ্বর-নাস্তিক অন্তত শাস্ত্রদ্রোহী মুক্তবুদ্ধি মানবতাবাদী বাঙালীর ওপর নির্ভর করছে বাঙালীর সুন্দর ভবিষ্যৎ। সামনে নতুন দিন। প্রত্যাশী ও আশ্বস্ত আমরা সেই নতুন সূর্যের উদয়-লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকব।

ইতিহাসের ধারায় বাঙালী

আমাদের দেশের নাম বাঙলাদেশ, তাই ভাষার নাম বাঙলা এবং তাই আমরা বাঙালী। আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্য-ধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই, আরবী, ইরানী কিংবা তুর্কীস্তানীও আমরা নই। আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য।

২

আমরা আগে ছিলাম animist, পরে হলাম pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান। আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি, ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজের মতো করে রচনা করবার জন্যেই। তার প্রমাণ নির্বাণকামী ও নৈরাত্ম-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল, তা নয়, অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়। হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরী করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী। এতে নিহিত তত্ত্বের নাম গুরুবাদ।

এই বিকৃত বৌদ্ধ জীবন-চর্যায় মিলে এদেশের আদিবাসীর জীবনতত্ত্ব ও জগদ্দর্শন। এদেশের মানুষ চিরকাল এই কাদা-মাটিকে ভালবেসেছে, এর লালনে তার দেহ গঠিত ও পুষ্ট, এর দৃশ্য তার প্রাণের আরাম ও মনের খোরাক। সে এই আশ্চর্য দেহকেই জেনেছে সত্য বলে, দেহস্থ চৈতন্যকে মেনেছে আত্মা বলে —পরমাত্মারই খণ্ডাংশ ও প্রতিনিধি বলে। তাই চৈতন্যময় দেহ তার কাছে মানুষ আর দেহ বহির্ভূত অখণ্ড চৈতন্য হচ্ছে তার কাছে মনের মানুষ, রসের মানুষ কিংবা ভাবের মানুষ।

সে জীবনবাদী, তাই বস্তুকে সে তুচ্ছ করে না, ভোগে নেই তার অবহেলা। তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যা কর্তব্য, তাতেই সে উদ্যোগী। সেজন্যেই

সে তার গরজমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তায় দেবতা সৃষ্টি করেছে। পারলৌকিক সুখী জীবনের কামনা তার আন্তরিক নয়—পোশাকীই। তাই সে মুখে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছিল, অন্তরে কোনদিন বরণ করেনি। তার পোশাকী কিংবা পার্বণিক জীবনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আচার আবরণ ও আভরণের মতো কাজ দিয়েছে, কিন্তু তার আটপৌরে জীবনে ঠাঁই পায়নি। সে জানে, চৈতন্যের অবসানে এ দেহ ধ্বংস হয়, চৈতন্যের স্থিতিতে এ দেহ থাকে সুস্থ, স্বস্থ ও সচল। তাই সে দেহকে জেনেছে কালস্রোতে ভাসমান তরী বলে। প্রাণকে বুঝেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র বলে আর চৈতন্যকে মেনেছে মন বলে। তাই এই জীবনটাই তার কাছে মন-পবনের নৌকার চলমান লীলারূপে প্রতিভাত হয়েছে, কাজেই পার্থিব জীবনই তার কাছে সত্য এবং প্রিয়। জীবনেতর জীবন অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে প্রসারিত জীবন তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারেনি কখনো। তাই বৈরাগ্যে সে উৎসাহবোধ করেনি, বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক।

তার দর্শন সাংখ্য, তার শাস্ত্র যোগ। তাই দেহতত্ত্বই তার সাধ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফীরা এ দেশের এ ঐতিহ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। চর্যাপদে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে, বাউল গানে, বৌদ্ধ বজ্র-সহজ-কালচক্র ও যন্ত্রযানে, শৈব-শাক্ত সাহিত্যে, বাউল-সুফী সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রী তত্ত্ব ও সাধনার সংবাদই পাই। ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম এখানে যক্ষ-দানব-প্রেত ও দেবতা-পূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সেনদের নেতৃত্বে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে কার্যত টেকেনি। আদিবাসী বাঙালীর জীবন-জীবিকার মিত্র ও অরিদেবতা—শিব, শক্তি (কালী), মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতিই পেয়েছেন পূজা।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে শরীয়তী ইসলাম এখানে তেমন আমল পায়নি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্, আর শিরনী পেয়েছেন সত্যপীর-জাফর-ইসমাইল-খান জাহান গাজীরা কিংবা বদর-বড়খাঁ-সত্যপীর। এদের কেউ পাপপুণ্য তথা বেহেস্ত-দোজখের মালিক নন, তাহলে এঁদের খাতির কেন ? সে কি পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার জন্যে নয় ?

কেবল এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহী বাঙালী, নতুনের অভিযাত্রী বাঙালী নব

নব চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে চিরকাল। বৌদ্ধযুগের শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, মীননাথের কথা কে না জানে? সেন আমলের জীমূতবাহনের মনীষা আজো বিস্ময়কর, নব্যন্যায় ও স্মৃতি বাঙালী মনীষার গৌরব-মিনার। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,—মানবিক বোধের ও মনুষ্যত্বের সুউচ্চ বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষের মর্যাদার ও মানবিক সম্ভাবনার বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, যিনি স্থূল চেতনার বাঙালীকে সূক্ষ্ম জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে তার চেতনার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সাম্য ও প্রীতির সুমহান মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বাঙালীচিত্তে মানব-মহিমা-মুগ্ধতার বীজ বপন করেছিলেন তিনি। তার পরেও রামমোহনের মনীষা ও মুক্তবুদ্ধি এক সঙ্কট থেকে, এক আসন্ন অপমৃত্যু থেকে সেদিন হিন্দুকে রক্ষা করেছিল, মুসলমান পেয়েছিল পরোক্ষ ত্রাণের পথ। তারও আগে পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণকেন্দ্রী মিলন-ময়দানের সন্ধান, আর পাই বাউলের উদার মানবতাবোধ। এভাবে দেশকালের প্রতিবেশে বাঙালী যুগে যুগে নিজেদের নতুন করে রচনা করেছে, গড়ে তুলেছে নিজেদের কালোপযোগী করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙালীর বীর্য বর্বর লাঠালাঠির জন্যে নয়, তার সংগ্রাম নিজের মতো করে বেঁচে থাকার। নিজের বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে নিজেকে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে গড়ে তোলার সাধনাতেই সে নিষ্ঠ। এসব তার সে-সাধনারই সাক্ষ্য ও ফল।

৩

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন তার স্বতন্ত্র জীবনবোধের ও মননের মৌলিকতার স্বাক্ষর রয়েছে, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি রয়েছে তার বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সাক্ষ্য।

সে চিরকালই শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তাই উত্তর ভারতীয় গুপ্ত শাসনে সে স্বস্তি পায়নি। এজন্যেই গুপ্তদের পতনের পর শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাঙালী একবার জেগে উঠেছিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার আত্মসম্মান-বোধ। গুপ্তযুগের বদ্ধবেদনা ও সঞ্চিত গ্লানি প্রতিহিংসার আগুনে নিঃশেষ হতে চেয়েছিল। এরই ফলে স্বাধীন ভূপতি বঙ্গ-গৌরব শশাঙ্ককে দেখতে পাই উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজা হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়।

তারপর একদিন বাঙালীর ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হয়েছিল।

আমরা পাল রাজাদের কথা বলছি। স্মরণ করুন, সেই গৌরবময় দিন, যেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। প্রজারা যেদিন 'গোপাল'কে রাজা নির্বাচিত করেছিল, সেদিন এই বাঙালীর জীবনে, মননে ও সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় হয়েছিল শুরু। স্বাধীনতার স্বস্তি তার জীবনে সেদিন যুগদুর্লভ স্বপ্ন জাগিয়েছিল। বাঙালীর হৃদয় সেদিন নব-সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নব-অনুভবের আবেগে। তার চিত্তলোক আন্দোলিত হয়েছিল নবীন জীবন-চেতনায়—জন্মলগ্নের বেদনায়, সদ্য উন্মোচিত জীবনবোধের রূপায়ণ-প্রেরণায় সে ছুটেছিল আদর্শের সন্ধানে। 'যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত' তারই প্রতীকী রচনা। মানুষের চেতনার রাজ্যে—আদর্শ-লোকের চিরন্তন প্রশ্নের গভীরতম সমস্যার সমাধানে সেদিন বাঙালী-মনন জয়ী হয়েছিল। তার সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। সে ত্যাগের নয়, ভোগেরও নয়, গ্রহণ করেছিল মধ্য পন্থা—Golden mean। ত্যাগ তার লক্ষ্য নয়, নিছক ভোগ তার কাম্য নয়, পার্থিব জীবনের সার্থকতার পথই তার বাঞ্ছিত। পরলোকের মিথ্যা আশ্বাসে সে বিধাতার সৃষ্টির জাগতিক জীবনের মহিমা খর্ব করতে চায়নি, কিংবা ভোগের পঙ্কে ডুবে কলঙ্কিত করেনি জীবনকে। পৃথিবীকেই সার জেনে, জীবনকে সত্য মেনে, মাটিকে ভালবেসে সে জীবনের বিচিত্ররস আহরণ করতে চেয়েছে, উপলব্ধি করতে চেয়েছে জীবনের প্রসাদ। এজন্যে তার লক্ষ্য হয়েছে জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোটানো, ফল ফলানো। এরই মধ্যে সে সমাজকে ভেবেছে উদ্যানরূপে, সংস্কৃতিকে জেনেছে সিঞ্চিত জল হিসেবে, ঐতিহ্যকে বরণ করেছে 'সার' বলে। সেদিন বাঙালীর আত্মোপলব্ধির জন্ম হয়েছিল, জীবন-ধারণায় তার মুক্তি ঘটেছিল, পেয়েছিল সে যথার্থ চলার পথের সন্ধান। তাই পাল আমল ছিল বাঙালীর জীবনে ও বাঙলার ইতিহাসে সোনার যুগ। ধনে, ঐশ্বর্যে সংস্কৃতিতে, সম্ভ্রমে, চেতনায় ও চিন্তায় বাঙালী সে-গৌরব, সে-সুখ, সে-আনন্দ পরে অনেক অনেক কাল আর পায়নি।

সব সুদিনের শেষ আছে। মৃত্যুর বীজ ঢোকে দেহে, তা-ই একদিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ঘটায় মৃত্যু। পালদেরও পতন হল শুরু। তার কারণ সে স্বাজাত্য ভুলল। হারাল আত্মবিশ্বাস, ছাড়ল অভিমান। শেষের দিকে বৌদ্ধ পাল রাজারা নিজেদের উদার সংস্কৃতি ছেড়ে উত্তর ভারতীয় বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার

জনপ্রিয় হল। বৌদ্ধমত ত্যাগ করে লোকে ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ করতে লাগল। সে-সূত্রে বাঙালীর দৃষ্টি হল বহির্মুখী। পতনের বীজ উপ্ত হল এভাবেই। স্বাজাত্য-বোধ গেলে সহধর্মিতা ও সহযোগিতা যায় উবে। অনেকতায় আসে অনৈক্য। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের প্রেরণা না থাকলে বাঁধন যায় টুটে। সেদিন বাঙালীর সোনার যুগ এভাবে হল অবসিত।

সেনদের পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যে—কর্ণাটে। হয়তো তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড়। পাল রাজত্বের অবসানে তাঁরা হলেন দেশপতি। কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে ছিল না তাঁদের আত্মার যোগ। উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তাঁরা ছিলেন ধারক ও বাহক। কল্যাণবোধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামীবশেই বাঙলাকে ও বাঙালীকে তাঁরা উত্তর ভারতীয় আদলে গড়ে তুলতে হলেন প্রয়াসী এই কৃত্রিম প্রয়াসে তাঁরা বাহ্যত সফল হলেন বটে, কিন্তু আত্মার ঐশ্বর্য হারাল বাঙালী। জীর্ণতা তার আত্মার কন্দরে বাঁধল বাসা। বাইরের আয়োজন-আড়ম্বর অগর্লোক করে দিল দেউলিয়া। তাই ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ মিশ্রের চোখের সামনে পালাতে হল লক্ষ্মণসেনকে।

রাজার সঙ্গে ছিল না প্রজার যোগ। স্বাজাত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন হয়েছিল শিথিল। তাই রাজার দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয়নি প্রজারা। নতুন অধিপতিকে ছেড়ে দিল রাজ্য-পাট।

বিদেশী-বিভাষী তুর্কীরা দখল করে নিল এদেশ। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থেই চাইল স্বাধীন হতে। বাঙালীর তাতে ছিল সায়। কেননা, বাঙালীর ধন তাহলে তেরো নদীর ওপারে দিল্লীর ভাণ্ডারে যাবে না। তুর্কীদের প্রতি বাঙালী বাড়াল সহযোগিতার হাত। তুর্কীরা লড়ল দিল্লী-পতির সাথে। বহু জয় পরাজয়ের পর অবশেষে ১৩৩৯ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি স্বাধীন সুলতানী-আমলে বাঙলা আর্থিক সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির গৌরব-গর্ব অনুভব করবার সুযোগ পেল। বিদেশাগত হলেও তখন সুলতানরা স্বাধীন ছিলেন বলে রাজস্ব মোটামুটি দেশেই খরচ হত। কিন্তু ১৫৩৯ সনে শের শাহের গৌড় বিজয় থেকে বাঙলার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। শূরেরা প্রায় বাইশ বছর বাঙলাদেশ শাসন করলেন বটে, কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিহারী এবং বহির্বঙ্গীয় স্বার্থ বিশেষ করে আফগান স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আফগান কররানীরা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং ১৫৭৫ সনে আকবর জয় নিলেন বাঙলাদেশ। তেরো নদীর ওপারের বাদশাহর রাজত্বে ও

রাজস্বে যত আগ্রহ ছিল, তার কণা পরিমাণও ছিল না বাঙালীর জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় উৎসাহ।

তাছাড়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬২৪ সন অবধি বাঙলায় এক রকম অরাজকতাই চল্‌ছিল। অবাঙালী বংশোদ্ভব স্থানীয় সামন্তরা প্রায় বিয়াল্লিশ (১৬১৭ সন অবধি) বছর ধরেই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁরা মুঘলের অধীনতা সহজে স্বীকার করতে চাননি, ফলে একরূপ দ্বৈতশাসনই চলেছিল—যার স্বরূপ ছিল পীড়ন ও লুণ্ঠন। তাছাড়া মুঘল সেনানীদের মধ্যেও ছিল অন্তর্বিরোধ এবং বিদ্রোহ। তবু সে-দিন পুরোনো সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বাঙালীরা এই বিদেশী সামন্তদের হয়ে সংগ্রাম করেছিল বাঙলার স্বাধীনতা এবং বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে। সামন্তদের ঐক্যের অভাবে বাঙালীর সে-প্রয়াস সে-দিন ব্যর্থই হয়েছিল।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ১৬২৪ থেকে ১৭০৭ সন অবধি বাঙলায় মুঘল শাসন দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু সেনানী ও বেনে-সুবাদারের শাসনে বাঙলা উপনিবেশের দুর্ভোগই কেবল ভুগেছে। তার উপর বাঙালীকে বইতে হয়েছিল আসাম, কোচবিহার ও চট্টগ্রাম অভিযানের বিপুল ও ব্যর্থ ব্যয়ভার। মুঘলশোষণ ছাড়াও য়ুরোপীয় বেনেদের শোষণে তখন দেশে আকাল। এদিকে ষোলশতকের প্রথম পাদ থেকে পর্তুগীজ দৌরাত্ম্যের শুরু, তার চরম রূপ দেখা দেয় সাজাহান-আওরঙ্গজেবের শাসনকালে। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রজার জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যেন তাঁদের নয়, কেবল রাজস্বের অধিকারই তাঁদের। তাই বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন, সুবাদারের ঔদাসীন্য সেদিন বাঙালীকে ধনেও কাঙাল, মনেও কাঙাল করে ছেড়েছিল।

বিজাতি-শাসিত বাঙালীর দেউলিয়া জীবনের সাক্ষ্য মেলে তাদের চিন্তার দৈন্যে, সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্ফলতায় ও রুচির বিকারে এবং ধর্মবোধের নতুনত্বে। সেদিন অসহায় বাঙালী আস্থা হারিয়েছিল পুরোনো ধর্মবোধে, ছেড়েছিল মন্দির, মসজিদ। জীবন ও জীবিকার ধাঁধায় পড়ে বিভ্রান্ত বাঙালী সন্ধান করেছিল নতুন ইষ্টদেবতার—যাঁরা পার্থিব জীবনে দেবেন দুর্লভ সুখ ও আনন্দ, আনবেন প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। সেদিন বিমূঢ় বাঙালী বৃহৎ ও মহতের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা কত ক্ষোভ ও হতাশায় না ত্যাগ করেছিল! সেদিন তার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' মুর্শিদকুলি-আলিবর্দীরা

বাঙালীর সে ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষাও সেদিন মেটানোর গরজ বোধ করেননি। তাই মুঘল যুগের শুরু থেকেই দুর্দিনের যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার ফলে সত্যপীর-সত্যনারায়ণকেন্দ্রী ইষ্টদেবতার পূজা-শিরনীর মাধ্যমে নিপীড়িত নিঃস্ব হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছিল। বল-বীর্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না আর। কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা সত্যপীর-সত্য-নারায়ণ, দক্ষিণরায়-বড়খাঁগাজী, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, ওলা-দেবী-ওলাবিবি, ষষ্ঠীদেবী-ষষ্ঠীবিবির পূজা-শিরনী দিয়েই স্বস্তি খুঁজছিল।

১৭০৭ সনে আওরঙজেবের মৃত্যুর পরে বাঙালীর আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছি, মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থায় প্রজা-শোষণ বেড়েছিল। কেননা তিনি মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন এবং দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। সামন্তরা হয়ে উঠলেন এ সুযোগে প্রবল। আলিবর্দী এঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই হলেন বাঙলার নওয়াব। এজন্যে এঁদেরকে শাসনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁর ষোল বছরের নওয়াবীকালে বারোটি যুদ্ধও করতে হয়েছিল। ফলে দেশে শোষণ-পীড়ন বেড়ে গেল। মারাঠার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে সেদিন আলিবর্দী একজন সেনাপতিও পেলেন না তাঁর সামন্ত-সিপাহীর মধ্য থেকে। কিশোর সিরাজুদ্দৌলা হলেন সেনাপতি। যুদ্ধ-প্রহসনের পরে আলিবর্দীকে ছাড়তে হল উড়িষ্যা, দিতে হল বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ। এভাবে মারাঠা শক্তিকে ঠেকিয়ে তিনি আরো কিছু কাল নওয়াবী করলেন।

কালের চাকা স্থির ছিল না। এই কুশাসন ও চরিত্রহীনতার পরিণাম, সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিল দুষ্টক্ষতরূপে। যুদ্ধ, ছল-প্রতারণা ও লুণ্ঠন-শোষণে মানুষের জীবন জীবিকায় এতটুকু নিরাপত্তা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত ছিল না লোকের, বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজস্বের হার। বেনিয়া-দালালের দৌরাত্ম্যে ঘরেও স্বস্তি ছিল না লোকের। অভাব, পীড়ন ও অনিশ্চয়তায় জনগণের দুঃখের ভরা হয়েছিল পরিপূর্ণ।

তারপরে পলাশীর প্রহসনে বদল হল শাসক, পালটে গেল নীতি, পরিবর্তিত হল রীতি আর দ্বারে এল নতুন যুগ। বিশ্বাসভঙ্গে মীরজাফরের সহযোগী ও সমকক্ষ এবং জামাতা, মীরকাসেম আলি খাঁ ঘুষে-লব্ধ নওয়াবী করতে গিয়ে টের পেলেন নিজেদের অবস্থা। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। জাল

তখন ইংরেজ প্রায় গুটিয়েই এনেছে। ফাঁদের দোর বন্ধ, কাজেই পরিণামে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাঁর ভাগ্যে।

ইংরেজ বেনেরা স্থিরই করতে পারল না পঁচিশ বছর ধরে—শাসন করবে কি শোষণ করবে!

ফলে ১৭৯৩ সন অবধি চলল এক প্রকারের দ্বৈত-অদ্বৈত শাসন, যার ফলে দেশে অরাজকতা, লুণ্ঠন, পীড়ন চলছিল অবাধে। এর মধ্যেই ঘটেছিল খণ্ড প্রলয়ের চেয়েও ভয়াবহ মন্বন্তর—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যার নাম। এ কেবল দুর্ভিক্ষ নয়—মহামারী, সে মহামারী অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল দেহের—মনের—আত্মার। মনুষ্যত্ব সেদিনকার বাঙলায় ছিল অভাবিত সম্পদ।

অবশেষে বেনেবুদ্ধির জয় হল। কোম্পানী স্থির করল তারা শাসনও করবে, শোষণও করবে। ১৭৯৩ সন থেকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় শাসন-শোষণ শুরু হল।

এর মধ্যে বাঙালী মুসলমানরা ওহাবী-ফরায়েজী প্রভৃতি ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে আজাদী আন্দোলনও চালাতে চেয়েছিল। মজনুশাহর ফকিরদল ছিল মূলত saboteurs—গেরিলাযোদ্ধা। ১৭৬০ সন অবধি এসব বিপ্লব চলছিল।

৪

কিন্তু তখন বিপর্যস্ত জীবনে শিথিল-চরিত্র জনগণের পক্ষে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ১৮৬০ সনের পর থেকে মুসলমানরা বৃটিশ-প্রীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সন অবধি অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা চাকরীর ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়। এর মধ্যে আজাদী-কামী স্বস্থ মুসলমানরা ও চাকরীর প্রত্যাশাহীন মোল্লা-মৌলানারা কংগ্রেসের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর অন্যেরা মুসলিম লীগের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছল্যলাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখে। এই সংগ্রাম মূলত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অফিসবাবুর বিরুদ্ধেই। তখন মুসলমানমাত্রেরই এই তিন শত্রু—ইংরেজ নয়। কিন্তু হিন্দু-বিরল অঞ্চলের অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানে মুসলিমদের হিন্দুবিদ্বেষ তেমন ছিল না, যেমন ছিল না মুসলিমবিরল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মনে মুসলিম বিদ্বেষ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের এই ক্ষোভের সুব্যবহার হয়েছিল। মুসলিম লীগের পতাকাতলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা সমবেত হল। ইংরেজ তাড়াবার জন্যে নয়,—হিন্দুর থেকে সম্পদ ও চাকরীর অধিকার ছিনিয়ে নেবার উত্তেজনায়। এটিই কালে কালে পৃথক ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিত্বের প্রলেপে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্রসত্তার স্বীকৃতিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রলাভের উদ্দীপনা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছিল। মুসলিম লীগ যে বৃটিশবিরোধী ছিল না, এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতাকামী ছিল, তার প্রমাণ, কংগ্রেসীদের জেলে যেতে হয়েছে, মুসলিম লীগ কর্মীরা কখনো বৃটিশের কোপদৃষ্টি পায়নি।

৫

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম বাঙলায়। কিন্তু বাঙালীর হীনমন্যতা এবং কিছুটা উদারতার জন্যে দুটোই হল হাতছাড়া।

এগুলোর নেতৃত্ব ও সাফল্যের কৃতিত্ব পেল অবাঙালীরা। অথচ পাকিস্তান এল বাঙালীর আন্দোলনে, স্বাধীনতাও এল ১৯৪২ সনের বাঙালীর আগস্ট-আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবে। ১৯৪৬ সনের কলকাতার দাঙ্গা, তার প্রতিক্রিয়ায় বিহার-নোয়াখালির হাঙ্গামাই স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছিল। আজকে যে-সব অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত, সেদিন বাঙলাদেশ ছাড়া আর কোথাও মুসলিম লীগ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, অথচ মুসলিম লীগের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের মা-বাবা আজ সে-সব অঞ্চলের লোকই। কেবল কি তা-ই? বাঙালীর দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রিক আনুগত্যেও সে-সব মোড়ল-মুরুব্বীদের সন্দেহের অন্ত নেই। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা কল্পনাতীত।

অবশ্য বাঙালীর এ ক্ষতি বাঙালীর দালাল-নেতাদেরই দান। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাষ্ট্রের নামে সর্বপ্রকার বঞ্চনা হল শুরু।

সৈন্য বিভাগে বাঙালী দেড়লক্ষ চাকুরীর হকদার। হীনমন্যতাগ্রস্ত বাঙালীর কাছে সেদিন সে-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী উচ্চারণও ছিল অশোভন ও অযৌক্তিক। পঞ্জাব-করাচী-বোম্বাইয়ের মুসলমানরা পাকিস্তানের অর্থনীতির চাবি-কাঠি রাখল নিজেদের হাতে। অর্থাগমের পথ রইল আগলে। ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানা রইল তাদেরই খপ্পরে। কেরানীগিরিতে ও তার 'উপরি' প্রাপ্তিতেই বাঙালী রইল কৃতার্থমন্য হয়ে।

আগে পদ ও পদবীর লোভে দালালি করে, পরে প্রসাদ-বঞ্চিত হয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে এসব দালাল-নেতারা মায়াকান্না শুরু করে দেয় জনগণের জন্যে, মুখস্থ ফিরিস্তি দেয় অবিচারের, ছদ্ম সংগ্রাম চালায় বাঙালীর অধিকার আদায়ের।

বাঙালীর থেকে সংখ্যা সাম্যনীতির স্বীকৃতি আদায় করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালীর যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনা বিরল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সুবিধাবাদ-নীতি বাঙালী রাজনৈতিক কর্মীদের করেছে আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন। স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা আজ এদলে, কাল ওদলে থেকে দেশের, গণ-মানসের ও গণ-চরিত্রের যে-ক্ষতিসাধন করেছেন, তা আমাদের উত্তরপুরুষের কালেও পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিষদে, মন্ত্রীসভায় কখনো বাঙালীর অভাব ছিল না কিন্তু তাঁদের দান কি, প্রয়াসের ফল কি ?— কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না।

জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের সে-ই জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফারসী ভাষায়। অধিকাংশ পাকি-স্তানীর প্রাণের যোগ নেই সে কওমী সঙ্গীতের সঙ্গে। খেতাবের ভাষাও ফারসী। কয়জন বোঝে তার গুরুত্ব ? সর্বত্রই এমনি বিড়ম্বনা।

পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের ভাষাই উর্দু নয়। চল্লিশ পঞ্চাশ জন উত্তর ভারতীয় Civilian এবং লিয়াকত আলির প্রভাবে ও দাবীতে দেশবহির্ভূত ভাষা উর্দু পেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার অধিকার ও মর্যাদা। অথচ যে স্তরেই থাকুক পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও মাতৃভাষারূপে আজো প্রীতি ও পরিচর্যা পাচ্ছে। এবং সেই প্রবণতাই লক্ষণীয়রূপে বাড়ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা না হলে যে কোন বিদেশী ভাষাই টিকে থাকতে পারে না, তার বড় সাক্ষ্য রয়েছে এদেশের ইতিহাসে। তুর্কী-মুঘল-ইরানীর প্রতিপোষণ পেয়েও এদেশের এক কালের রাষ্ট্রভাষা ফারসী তার অস্তিত্ব হারাল। কেননা, এটি সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলের লোকেরই মাতৃভাষা ছিল না। শাসক হয়েও সংখ্যালঘু বলেই শাসকেরা তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কীও ধরে রাখতে পারেননি। তাই কারো প্রীতির পরিচর্যা সে ভাষা পায়নি। ফলে মৃত্যুই ছিল তার অনিবার্য পরিণাম। উর্দুরও সে পরিণাম

সম্ভব ও স্বাভাবিক। তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ জেনে আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি উর্দু প্রচারে। উত্তর ভারতীয় Civilian কিংবা তাঁদের উত্তরপুরুষের প্রভাবের আয়ু কয়দিন! সিন্ধি, বেলুচী, পশতু ও সারাইকীভাষীরা যখন ঐ Civilianদের আসন এবং শাসনের দণ্ড ধারণ করবে, কোন্ মমতায় তারা বিদেশী উর্দুর লালনে উৎসাহ রাখবে? কাজেই অবিলম্বে উর্দু চালু না হলে, অদূর ভবিষ্যতে ভাষিক-দ্বন্দ্ব ভারতের মতো তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার ভাঁওতা দিয়ে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেশীদালালের মাধ্যমে পঞ্জাবীরা ও করাচীওয়ালারা আর কতকাল এখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাবে—এ জিজ্ঞাসার অবকাশ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নয়। স্ব-স্বার্থে মানুষ বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করে, কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বলকে বঞ্চিত ও শোষণ করা কতকাল সম্ভব!

অর্থনৈতিক কারণেই তো অধিকার-বঞ্চিত মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধুয়া তুলে পাকিস্তান চেয়েছিল। নানা অজুহাতে পাক-ভারতে সংখ্যালঘু হত্যার পশ্চাতেও এই সম্পদ-সংগ্রহের অবচেতন প্রেরণাই কাজ করে।

পাঁচকোটি হিন্দুস্তানী মুসলমানের স্বস্তি, সম্মান ও জীবন-জীবিকার বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় যদি সহ অবস্থান মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব না হয়, তা হলে কাদের হিতার্থে এ পাকিস্তান!

অতএব, যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জিকির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত, আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালী স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কিংবা অর্ধ-স্বাধীনতা দাবী করবে এই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তা-ই বলে।

[এবং প্রাসঙ্গিক বলা প্রয়োজন বাংলাদেশের জনগণ শেষ অবধি সে স্বাধীনতা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছে।]

বাঙলার গতর-খাটা মানুষের ইতিকথা

সাম্প্রতকালের নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে বাঙলা-বিহার-ওড়িশা-আসামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে মুখ্যত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, আলপীয় আর্য এবং মঙ্গোল-রক্ত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই প্রাচ্যভারতের জনগোষ্ঠীর এক অংশকে আদি অস্ট্রাল (Proto Australoid) বর্গের জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় তারা 'অস্ট্রিক' নামে পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের জনগোষ্ঠী 'দ্রাবিড়' নামে অভিহিত। মূলত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা [ভেড্ডিড] ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি। সেখান থেকেই তারা জলপথে কিংবা উপকূলীয় স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করে এবং দাক্ষিণাত্যে আর বাঙলা-ওড়িশায় বসবাস করে। এখানে এসেছে তারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

আবার হিমালয়ের মালভূমি ও উপত্যকা অঞ্চল থেকে এবং লুসাই পর্বত বেয়ে এসেছে মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর নানা বর্গের মানুষ।

প্রাচীন বাঙলায়, ওড়িশায় ও ছোটনাগপুর অবধি বিহারে আর যারা প্রাচীনকালে কিন্তু অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের পরে এসে বাস করে তারা আলপাইনীয় বা আলপীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠী। তারাও এসেছে সমুদ্রপথে বাঙলায় ও ওড়িশায়। আর সম্ভবত স্থলপথে এসে বালুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নিগ্রো বা নেগ্রিটো প্রভৃতি আর যারা নানা কারণে ও প্রয়োজনে এখানে এসেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

অতএব, আজকের বাঙালী-বিহারী-ওড়িয়া-অসমীয়া রক্তসঙ্কর জনগোষ্ঠী হলেও কোন কোন গোষ্ঠীর ও বর্গের মানুষ মনন-উৎকর্ষের ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করে। কৃষিজীবী ও বৃত্তিজীবী হয় ওরাই। দুর্বল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়েরা অনেককাল ছিল ফল-মূল-মৃগয়াজীবী ও আরণ্যক। তারা ছিল নিষাদ নামে পরিচিত।

কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোয়ওয়া প্রভৃতি আরণ্য ও আদিবাসী উপ-

জাতি আমাদের অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতি। কোচ-রাজবংশীরাও আমাদের জাতি।

ফল-মূল-মৃগয়াজীবী আরণ্য মঙ্গোলরা অভিহিত হত 'কিরাত' নামে। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক বিদ্বানের মতে আলপীয় আর্যভাষী বর্গের জনগোষ্ঠীই বাঙলা-ওড়িশা-বিহারে উন্নত মনন ও আবিষ্কৃত হাতিয়ার প্রয়োগে জীবিকা ক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করে এবং ক্রমে বিবর্তনের ধারায় প্রতাপে প্রবল হয়ে অন্যদের দাসে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগানদারে পরিণত করে। এবং এরাই পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যভাষী-প্রভাবিত সমাজে পেশানুসারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ রূপে পরিচিত হয়। এই আলপীয় আর্যভাষীরা বৈদিক আর্যভাষীদের অবজ্ঞেয় ছিল অনেককাল। কিন্তু জৈন-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারভুক্ত হওয়ার পর শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে নিজেরা হয়ে ওঠে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ও শরিক। কালে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে তারা হল তথাকথিত গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের সুখী মানুষ এবং নিম্নবর্ণের নিম্নবৃত্তির ও নিঃস্ববিত্তের দুর্বল অজ্ঞ মানুষের সেব্য ও প্রভু।

আর অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় বর্গের নরগোষ্ঠীরা রক্তসঙ্কর হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়েও আড়াই হাজার বছর ধরে রইল আত্মোন্নয়নের সুযোগবঞ্চিত ও জীবিকা নির্বাচনের অধিকাররিক্ত স্বল্প আয়ের অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী ও অস্পৃশ্য প্রাণী হয়ে।

এদের মধ্যে যারা ঐ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের ঘরে-সংসারে প্রাত্যহিক জীবনের আহার্য ও আবশ্যিক সামগ্রী যোগায় এবং যাদের প্রত্যক্ষ সেবা ও শ্রম ঘরে-সংসারে অপরিহার্য, তারাই পেল জলাচারযোগ্যরূপে কিছুটা অনুগ্রহ। তারাই সদ্গোপ, নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, গোপাল প্রভৃতি।

অন্যরা—মুচি, মেথর, চাঁড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম, কপালী প্রভৃতি রইল অস্পৃশ্য হয়ে।

ইতোমধ্যে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রও এদেরকে সমাজ-ভুক্ত করতে পারেনি।

কৃষিজীবী স্থায়ী ও স্থির নিবাসী সমাজেই সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। ফল-মূল-মৃগয়াজীবী যাযাবর ও আরণ্য সমাজে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে পারে না। যাযাবর কিংবা পথিক জীবনে প্রয়োজন সঙ্কুচিত করতে হয়, কেননা বোঝা মাত্রই চলমানতার বাধাস্বরূপ। তাই স্থির ও স্থায়ী নিবাস না হলে আকাঙ্ক্ষার প্রসার, চাহিদার বিস্তার ও উপকরণের বৃদ্ধি ঘটে না। এজন্যেই

কৃষিজীবী মানুষ বা সমাজই একসময় গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাই সংস্কৃতিবাচক শব্দ 'কৃষ্টি' ছিল কর্ষণসম্পৃক্ত। ক্রমে সমাজ-বিকাশের ও সমাজ-বিবর্তনের ধারায় হাতিয়ার প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও বাহুবলে, জনবলে কিংবা বুদ্ধি-বলে যারা প্রবল, তাদের প্রভাবে ও প্রতাপে তাদেরকে পরশ্রমজীবী অবসরভোগী সেবাগ্রাহী হবার সুযোগ করে দিল—তারা হয়ে উঠল শোষক ও শাসকশ্রেণী। তখন শ্রমসাধ্য কর্ষণ হল ঘৃণ্য, কিন্তু ভূমির বা জমির মালিক হওয়াটাই হল গৌরবের, গর্বের ও মানের এবং দর্প-দাপটের উৎস। এমনিভাবে চাষী হল প্রজা ও শাসনপাত্র আর ভৌমিক বা জমিদার হল মান্য প্রভু।

আমাদের দেশে এভাবেই গণমানব শাস্ত্রপতির, সমাজসর্দারের ও শাসন-কর্তার এবং তাদের গণ-গোষ্ঠীর শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণের পাত্র ও শিকার হয়েছে। শাস্ত্রপতি, সমাজপতি, ও শাহ্-সামন্তরাই ছিল গণমানবের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। এ ছিল একপ্রকার দাসপ্রথা। জানে-মালে কোন অধিকার ছিলনা গণমানবের, শাস্ত্র-সমাজ ও সরকার-নির্দিষ্ট গতর-খাটানো বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে কলুর বলদের মতো খেয়ে না খেয়ে, বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে জীবনপাত করতে হত তাদের অকালে। ঋণের দায়, খাজনার দায় ও পীড়নভয় এড়ানোর জন্যে নিঃস্ব নিঃসহায় মানুষ সেযুগে সপরিবারে পালিয়ে বেড়াত এ-ভৌমিকের ও ভৌমিকের অধিকারে। প্রভুর কাজে বেগার খাটতে হত সবাইকে, নজর-সম্মানী প্রভৃতি দিতে হত প্রভু পরিবারের উৎসবে-পার্বণে বিয়েতে শ্রাদ্ধে ও অন্নপ্রাশনে। তাছাড়া তারা ছিল ঘন ঘন খরা-বন্যা-ঝঞ্ঝা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর শিকার—তাই জনসংখ্যাও সহজে বৃদ্ধি পেত না।

শাস্ত্র-শাসন-ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল শাস্ত্রপতির, সমাজসর্দারের ও শাসনকর্তার গণ-গোষ্ঠীর হাতে। কামার-কুমার-চামার কিংবা হাড়ি-ডোম-তাঁতী-তিলি চাঁড়াল-বাগদী-কৈবর্তদের এযুগের চা-বাগানের কুলি কিংবা খনিমজুরের মতোই ধনী হবার কোন উপায় ছিল না। পূর্ণ মানব হিসেবে স্বীকৃত নয় বলে তারা প্রভুদের কাছে পেত অমানবিক ব্যবহার। স্বেচ্ছায় কর্মনির্বাচন বা জীবিকা নির্ধারণের অধিকার ছিল না বলে তাদের আত্মবিকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগার, সম্পদ-সুখের স্বপ্ন দেখার কোন সুযোগই ছিল না। আড়াই হাজার বছর ধরে ওরা ছিল গোত্রীয় বৃত্তিতে বদ্ধ এবং পীড়নের, বঞ্চনার ও মৃত্যুর সার্বক্ষণিক শিকার।

কালে কালে ধর্মান্তরিত হয়েও তারা সাধারণভাবে পেশা পরিবর্তনের কোন সুযোগ পায়নি। শোষিত-বঞ্চিতের অভিশপ্ত জীবনে ঘটেনি মুক্তি। মধ্যযুগ অবধি তাদের দেহ-মনের দুর্ভোগ-দুর্দিনকে তারা বিধিলিপি বলেই জেনেছে।

প্রতীচ্য জীবনের সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয়, যন্ত্রযুগের প্রসাদ, কৃৎকৌশলের প্রসার, কল-কারখানার দ্রুত বিস্তার, নগর-জীবনের প্রসার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহজতা, জীবনোপকরণের চাহিদাবৃদ্ধি, মুদ্রা-মাধ্যমে পণ্য ও শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ের ঋজুতা, যন্ত্র চালিত সংহত পৃথিবীতে দেশ-বিদেশের মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মের সঙ্গে সহজ পরিচয়, জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার তারে-বেতারে ও মুদ্রিত রচনার মাধ্যমে বিনিময়, প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি পুরোনো শাস্ত্র-সমাজ সরকার প্রবর্তিত ও প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও রীতি-রেওয়াজ যেমন ভেঙেছে, তেমনি যন্ত্রনির্ভর জীবনে নতুনতর জীবন-পদ্ধতির ও জীবিকা-সংস্থানের প্রয়োজন হয়েছে স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য।

ব্রিটিশ আমলে তাই ধীরে ধীরে শোষণ যেমন হয়েছিল বিচিত্র ও বহুধা, তেমনই আড়াই হাজার বছর ধরে বঞ্চিত-শোষিত বৃত্তিজীবী অস্পৃশ্য অবজ্ঞেয় মানুষেরও প্রাতিবেশিক কারণেই প্রায় অবচেতনভাবেই জাগছিল আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা, ভাগ্যপরিবর্তনের তাগিদ, শোষিত-বঞ্চিতের ক্ষোভ, ধনে-মানে অধিকারলাভের প্রয়াস এবং দ্রোহ ও সংগ্রামের বীজ হচ্ছিল তাদের মনে উপ্ত। গত দু'শ বছরে বহু জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে তাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তের বিস্ফোরণ ঘটেছে দ্রোহের ও সংগ্রামের আকারে।

১৮৮৬ সনের শিকাগো-হত্যাকাণ্ডের পর থেকে যেমন দেশ-দুনিয়ার শ্রমিকরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে, কৃষকরা যেমন মাটিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী মানুষও তেমনি ধনে-মানে ও প্রাণে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মেতে উঠেছে সর্বত্র। দেশ-দুনিয়ার কোথাও কোথাও কিছু গণমানব স্ব স্ব সংগ্রামে জয়ী হয়েছে ও হচ্ছে, অন্যদের আরো দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তবে দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষ যে একদিন হয়তো এ শতকেরই অন্তিম লগ্নে স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই—আত্মবিকাশের অবাধ অধিকার পাবেই, তা নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করা চলে।

আমাদের দেশে কৃষক-শ্রমিক বা বৃত্তিজীবী মানুষের চিন্তা-চেতনা তথা জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আশানুরূপ স্তরে উন্নীত হয়নি আজো—বহির্জগতের

সঙ্গে তারে বেতারে ও মুদ্রিত রচনার মাধ্যমে সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে। তাই আড়াই হাজার বছর ধরে তাদের দুর্গত-দুঃস্থ অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে। জমির রাজস্ব এক-পঞ্চমাংশ এক-চতুর্থাংশ থেকে ক্রমে আধিবর্গায় যেমন বিবর্তিত হয়েছে, তেমনি দিনমজুরের সংখ্যাও পেয়েছে বৃদ্ধি। তিনশ বছর আগে ত্রিশ টাকা দিয়ে কেনা জমির মালিকানা ক্রেতার বংশধর-দের উপর বর্তায় বটে, কিন্তু চৌদ্দপুরুষ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে-চাষী চাষ করে তাঁর কোন অধিকার বর্তায় না জমির বা ফসলের উপর। ভদ্রলোকের বিরোধিতায় 'তেভাগা' আন্দোলনও সফল হয়নি এদেশে—'লাঙল যার জমি তার' নীতিও তাই পাত্তা পায় না। আমাদের দেশের এ মুহূর্তের সামন্তমানসি-কতাদুষ্ট উঠতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ যদি এদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দিন দীর্ঘায়িত হবে।

আজকে বিবেকবান ভদ্রলোকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে—ওদের সাক্ষর করা, স্বাধিকার চেতনা দেওয়া, স্বাধিকার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা এবং নবজীবন-চেতনায় দীক্ষা দেওয়া ও নেওয়া।

বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, সংস্কৃতিকে ধরা যায় না; ছোঁয়া যায় না, কঠিন তরল বা বায়বীয় কোন পদার্থের মত সংস্কৃতিকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে একটা কিছু-যে আছে তা চেতনাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়—উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় এবং বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। সংস্কৃতির কোন বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা 'অন্ধের হস্তীদর্শন-ন্যায়ে'র মতো ব্যাপার। সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যতই আলোচনা করি, যতই মত-বিনিময় করি, মনে হয়, কোন দুইজন ব্যক্তির ধারণাই এ-সম্পর্কে হুবহু এক হবে না। কাজেই আমি যা বলব, তাও-যে আপনারা সবাই মেনে নেবেন, তেমন ভরসা আমার নেই। সংস্কৃতিকে যদিও ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কোন বস্তুর মত মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবহারিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার সংস্কৃতি নিহিত থাকে। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা—মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টার দ্বারা যে সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগৎদৃষ্টি অর্জন করতে চায়—তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবনচেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টনী-প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধিসম্পন্ন ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ—ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্বই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং তখন তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। বাঙালী সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃতি, য়ুরোপীয় সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি ইত্যাদি কথার তাৎপর্য

-এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

যে-কোন উদ্ভাবন-আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তার অনুভূতির ও প্রয়াসের ফল। সংস্কৃতির সঙ্গে এই উৎস্তাবনশক্তির সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, তাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা বা নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই। এজন্যে তারা গ্রহণশীল হয়েই সংস্কৃতিবান হয়। কাজেই সৃজনশীলতার সঙ্গে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। নইলে সংস্কৃতির ধারা সচল থাকে না।

এই যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনুভবযোগ্য একটা বিমূর্ত বিষয় সংস্কৃতি—একে বুঝবার চেষ্টা করা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো একটা ব্যাপার ছাড়া আর কি বলা যায়। আমাদের বাঙালাভাষী অঞ্চলের সামন্ত যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তাই এই অন্ধের হস্তীদর্শনেরই ব্যাপার।

সামন্ত যগে বাঙলাদেশ বা বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনও এক ছিল না, অখণ্ড ছিল না। বাঙালী জাতি কিংবা বাঙলাদেশ বলেও কিছু ছিল না। এই অঞ্চলের, এই ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে কোন একক ঐক্যচেতনা বা জাতীয় চেতনাও ছিল না। সুতরাং সামন্ত যুগের বাঙলাদেশ যখন বলা হয়, তখন আমাদের আজকের ধারণাই জনমনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—আরোপ করা হয় ভিন্ন এক দেশ-কালের উপর। অর্থাৎ অতীতকে বিচার করা হয় বর্তমানের অগ্রসর ধারণা দিয়ে।

হাজার বছর আগে অবধি এই ভূভাগ বিভক্ত ছিল ছোট ছোট রাজ্যে—জনপদ রাজ্যে। অনেকগুলো ছিল জনপদ রাজ্য। তাদের মধ্যে কতকগুলোর নাম পাওয়া যায়, location-এর কথা জানা যায় এবং কতকগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সেকালে ছিল এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-অভিজ্ঞতা-আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে—বড়জোর রাজ্যকে কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের আগে আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলেরা চট্টগ্রাম জয় করলে বাঙলা একচ্ছত্র শাসনে আসে। আসাম কখনও জয় করতে পারেননি মুঘলেরা—যদিও আসামও ছিল বঙ্গভাষী অঞ্চল। কাজেই ব্রিটিশ শাসনের আগে গোটা বঙ্গ বা গোটা ভারত কখনও কোন একক শাসনে ছিল না। আমরা জানি, একক শাসনে না থাকলে কখনও একক জাতি গড়ে উঠতে পারে না এবং তা কখনও গড়েও ওঠেনি ব্রিটিশপূর্ব আমলে। ১৮১৮ থেকে সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র ইত্যাদি প্রকাশ আরম্ভ হওয়ার আগে কোন সর্ববঙ্গীয়

সাহিত্যও ছিল না, কোন সর্ববঙ্গীয় একক চিন্তা-চেতনাও ছিল না। সর্ববঙ্গীয় চিন্তার আরম্ভ ইংরেজ আমলের ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনাপুষ্ট সাহিত্যে—উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে।

আমরা দেখেছি, ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলের বাইরে যায়নি। এখনকার বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশের বাইরে কখনও ধর্মমঙ্গল রচিত হয়নি। আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গের বাইরে কোথাও ক্বচিৎ লিখিত হয়েছে। আমরা ষোল শতকের চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে দশ হাজার বৈষ্ণব পদ পেয়েছি, এবং তিনশ'র মত পদকার পেয়েছি—দীনেশ সেন বোধহয় ২৮৭ জনের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। এই কবিদের কারও বাড়ি প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান বিভাগের বাইরে নয়। আমরা দেখেছি, এই যে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল—এর একটাও পূর্ববঙ্গে রচিত হয়নি। অতএব সারা বাঙলাদেশটা ১৮১৮ সনের আগে পর্যন্ত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কাজেই আমরা বলতে পারি—যখন থেকে কলকাতা শহর হতে পত্রিকা বের হচ্ছে—ইংরেজী শিক্ষিতরা বাঙলাতে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখছেন, তার আগে পর্যন্ত কখনও সর্ববঙ্গীয় সংহতিও ছিল না, সর্ববঙ্গীয় চিন্তা-চেতনাও ছিলনা এবং কখনও সর্ববঙ্গের মানুষ পরস্পরকে আপনও ভাবতে পারেনি। যে-পরিচয় থাকলে—হৃদ্যতা থাকলে—প্রশাসনিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকলে আপনত্বের একটা দাবী গড়ে ওঠে, তা হয়নি। এখন যেমন বাঙলাভাষীমাত্রেই আমরা বাঙালী বলছি—যদিওবা আমরা এক গোত্রীয় নই, তেমনি—একচ্ছত্র শাসনে থাকলে যেমন হয়—এক সময় আমরা পাকিস্তানীও ছিলাম—আমরা পেশোয়ারের, খাইবার পাসের লোককেও চিনতাম—তার political মত-পথের সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম এবং interested ছিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষের ছিলাম না, যেহেতু তা ছিল অন্য রাষ্ট্র। অন্য রাষ্ট্র হলেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়—পর হয়ে যায়। কাজেই সামন্তযুগে সব সময়ই আমাদের দেশ ছিল আঞ্চলিক।

আমাদের ঐতিহাসিক সূত্রের শুরু মৌর্য যুগ থেকে। মৌর্যরা উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ দখল করে রেখেছিল। পালেরা বাঙলাদেশের খণ্ডাংশে রাজত্ব করেছে বটে কিন্তু বাঙালী নয়। যে-কথাটা চালু রয়েছে, তা সত্য নয়। পালদের উত্থানও পাটনাতে—বিহারে, পতনও বিহারে। অবশ্য সেই বিহারের সীমা বোধহয় সে-যুগে আমাদের রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই

অঞ্চলটাতেই ছিলেন গোপাল। আর এতেই পালেরা পরিচিত হয়ে গেল বাঙালী বলে। আসলে পালেরা কখনও সমগ্র বাঙলাদেশের ওপর রাজত্ব করেনি। পাল আমলকে বাঙলার স্বর্ণযুগ বলা হয় বটে কিন্তু পাল আমলে বাঙলাদেশে পালদের তেমন কোন অবদানের দৃষ্টান্ত আমরা পাইনা। পালেরা যদি শুধু বাঙালী হত, তাহলে পালদের আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলো বাঙলাদেশে হত। নালন্দা এখানে নয়, উড্ডীয়ান এখানে নয়। শুধু মহাস্থানগড় এখানে, পাহাড়পুর এখানে। এগুলো, মনে করলে, বাঙলাদেশের অন্তর্গত ; আবার মনে করলে, সে যুগের বিহারের অন্তর্গতও।

কাজেই মুঘল আমলের আগে—বিশেষ করে ইংরেজ আমলের আগে—উনিশ শতকের আগে—বাঙলাদেশ—বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনও এক ছিল না, একক শাসনে ছিল না, ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বাঙলাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্য ছিল, বিভিন্ন রাজা ছিল, বিভিন্ন রাজবংশ ছিল। জনসাধারণের আনুগত্যও ছিল বিভিন্ন রাজায় ও সংস্কৃতিতে। তারা পরিচিতও ছিল বিভিন্ন দৈশিক নামে। গোত্রীয় সর্ববঙ্গীয় কোন সংহতিবোধ ছিল না, জাতীয়তাবোধ ছিল না—আধুনিক জাতীয় চেতনা থাকার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আজকের আলোচনায় আমাদের ভৌগোলিক অবস্থার কথা ভাবতে হবে—প্রাকৃত-অবস্থায় এই ভূভাগের মানুষের জীবনের কথা ভাবতে হবে। আজকের মন নিয়ে সে-কালের ঘটনা বিচার করতে গিয়ে আজকের অবস্থার সঙ্গে সে কালের অবস্থাকে গুলিয়ে ফেললে আমরা বিভ্রান্ত হব।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, দুই হাজার বছরের মধ্যে—অশোক শুদ্ধ ধরলে তেইশশ বছর হবে—এই তেইশশ বছরের মধ্যে আমরা বাঙালী বলে মাত্র একজন স্বদেশী রাজার নাম শুনি। তিনি শশাঙ্ক। তাও অন্য মত আছে। শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদে—কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনি আসাম থেকে এসেছিলেন। এই একজনের নাম পাই। আর কারও নাম পাই না। তারপর অনেক পরে নাম পাই আমরা এক বিদ্রোহী সামন্তের, নাম দিব্যক। দিব্যক, রুদ্রক আর ভীম মানে তিন পুরুষ। এই দেখি। আর আমরা বাঙালী শাসক দেখি না। হুসেন শাহ সৈয়দ হলে বাঙালী হন না। সৈয়দ হলে বাঙালী হওয়া যায় না—সে যুগে তো হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হুসেন শাহ হয় সৈয়দ হিসেবে সত্য, না হয় বাঙালী হিসেবে সত্য। আর এক বাঙালীকে জানি, যাকে

বাঙালী বলে স্বীকার করলেও করা যায়, না-করলেও কোন ক্ষতি হয় না—তিনি হচ্ছেন রাজা গণেশ। গণেশ ব্রাহ্মণ যদি হন, তাহলে বাঙালী হতেই পারেন না —বহিরাগত। তাঁর ছেলে যদু জালালুদ্দীন বা মহেন্দ্র এবং তাঁর পৌত্রসহ সবাই মিলে ১২/১৩ বছর রাজত্ব করেন। এ ছাড়া বাঙালী কখনও বাঙলাভাষী অঞ্চলে ১৯৪৭-এর আগে রাজত্ব করেননি। ১৯৪৭-এর পরের ইতিহাস বলার দরকার হয় না, আপনারা জানেন।

বাঙালী চিরকাল বিদেশী-শাসিত—বিজাতি-শাসিত। বাঙলাদেশের যেসব ধর্ম সেগুলোও বিদেশ থেকে আগত—হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম বিদেশ থেকে আসা, —উত্তর ভারত থেকে আসা, আরব থেকে আসা, এবং হিব্রু অঞ্চল থেকে আসে খ্রীস্টান ধর্ম। আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালীর যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব—তার কোনটাই বাঙালীর কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই যে শিলালিপির বাহাদুরী আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী—সেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগদী—যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য—তাদের কথা তো বাঙলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোন অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালীর ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালী বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা—তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা—তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি। যেমন একালের মুসলমানেরা বই লেখে, বই থেকে মুখস্থ করে, এবং মনে করে যে, তুর্কী-মুঘলরা তাদের স্বগোত্র। তারা ভাবে, ফিরোজ শাহ, শের শাহ, আকবর, আওরঙ্গজেব, সিরাজুদ্দৌলা তাদের স্বজাতি, স্বগোত্র। এবং এদের শাসনকে নিজেদের রাজত্ব মনে করে তারা গর্বে বুক স্ফীত করে। এতে তারা আত্মপ্রতারণা করে, আত্ম-প্রবঞ্চনা করে—মিথ্যা আস্ফালন করে। আমরাও বাঙলাদেশের ইতিহাস যখন বলি—তখন মিথ্যা গর্বে গর্বিত হতে চাই। তাতে স্বদেশের, স্বজাতির আসল

পরিচয় গোপন করে নানা কাল্পনিক কাহিনী দিয়ে মন ভরাতে চাই। কেন?

আজকাল যে কথাটা স্বীকৃত হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যদি অষ্ট্রিক-মঙ্গোলদের বংশধর হই, তাহলে সেই অষ্ট্রিক-মঙ্গোলেরা চিরকাল এদেশে ছিল নির্জিত, নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ মানুষ এখনও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের—অস্পৃশ্য। তারা কখনও মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। তাদের মধ্যে যারা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তারা সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। যারা এখানে ছিল তাদেরকে দেখছি দাস ও অস্পৃশ্য। এদের কিছুলোক উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন রকমে আসা লোকের সঙ্গে মিশে উচ্চবর্ণের হয়েছে, শাসক-শোষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকে কোন কোন বাঙালী যেমন স্বদেশকে ত্যাগ করেছে, বিলাতকে হোম মনে করেছে এবং সাহেব-ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা করেছে, ওদের সমাজে ওঠার চেষ্টা করেছে, লর্ড-সিন্‌হা পর্যন্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের মধ্য থেকেও যারা কিছুটা বড় হয়েছে, মাথা তুলবার চেষ্টা করেছে, তাদের কিছু কিছু শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা জাত বদলিয়েছে, খানদান বদলিয়েছে। যেমন আপনারা জানেন—নিজেরাও দেখেছেন—আজকে শেখ, কালকে খন্দকার, পরশু কোরেশী, তারপরের দিন সৈয়দ ইত্যাদি ব্যাপার এখনও চলছে। আজকে দাস, কালকে চৌধুরী বা মজুমদার, তার পরে দাসগুপ্ত সেনগুপ্ত ইত্যাদি খানদান পরিবর্তন ও জাতে-ওঠার প্রবণতা আজও আছে—প্রবলভাবেই আছে। খানদান ওঠা-নামার ব্যাপার চিরকাল ঘটেছে। এর সবটাই যে কৃত্রিম, অন্য রকমেও বলতে পারি। এই দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন ছিল বৌদ্ধ। সে সময়ে তাদের কোন জাতিভেদ ছিল না। তারপর আবার যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণ হল, তখন সেন আমলে, নতুন করে বর্ণবিন্যাস করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সমগ্র বর্ণ-বিন্যাসটাই হচ্ছে কৃত্রিম। অত্যন্ত কৃত্রিম। তার প্রমাণ বল্লালচরিতে আছে, কুলজীতে আছে, তার প্রমাণ জাতিমালা-কাছারিতে আছে। কাজেই আমাদের পরিপূর্ণ পরিচয়টা জানতে হলে, বুঝতে হলে, সর্বপ্রকার সংস্কার ও সঙ্কোচ ত্যাগ করে আরম্ভ করতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, 'বাঙালী-বাঙালী' 'বাঙলাদেশী-বাঙলাদেশী' করে চিৎকার করলেই আমাদের আত্মপরিচয় মিলবে না। আমাদের বুঝতে হবে বাঙলাভাষী বিশাল ভূখণ্ডে সেকালে আঞ্চলিকভাবে জীবন গড়ে উঠেছে, সমাজ

গড়ে উঠেছে, অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, ধর্ম গড়ে উঠেছে, রাজ্য ও রাজত্ব গড়ে উঠেছে, শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সামন্ত যুগে সর্ববঙ্গীয় বলে কোন কিছুই ছিল না—সমাজ ছিল না, রাজ্য ছিল না, ধর্ম ছিল না—কোন রকম সংহতিবোধই ছিল না। ধর্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু আমলে সারা বাঙলাদেশে একক দেবতার পুজো হয়নি। মনসার পুজো হয়েছে এক জায়গাতে, চণ্ডীর পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, শিবের পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, বিষ্ণুর পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে। এক ধর্মাবলম্বী হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ-পূর্বকালে, সামন্তযুগে—বাঙলাদেশে ছিল না।

অর্থনীতির দিক থেকেও সে-যুগে খণ্ড আঞ্চলিক রূপেরই সাক্ষাৎ পাই, কোন একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিস্থিতির পরিচয় পাই না। যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অবস্থার কোন মিল ছিল না। আজকের দিনে যেমন ঢাকার বাজারদর আর কক্সবাজারের বাজার-দর মোটামুটি একই থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে বাঙলা-দেশের অর্থনীতির সম্পর্ক থাকে, তেমন অবস্থা সেকালে কখনও ছিল না। তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেদিনের ব্যবসা-বাণিজ্য আজকের মতো নয়। তার প্রকৃতি অনেক ভিন্ন। কোন অঞ্চলই যেহেতু সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে না, সে জন্যেই বিনিময়ের প্রচলন হয়েছিল, বিনিময়ের মাধ্যমও তৈরি হয়েছিল। কাশ্মীরের শালের সেদিনও দরকার হয়েছিল। এই কমনসেন্সের কথা। এর জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক মুদ্রা আবিষ্কার জরুরী নয়। আমাদের একটা প্রবণতা হল—সবকিছুকে একটা সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার। বল্লালসেন কিংবা লক্ষ্মণসেন কিংবা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহর কালের কোন বিশেষ স্থানের অর্থ-নৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন একটি ঘটনাকে যখন সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখনই সত্যের অপলাপ হয়—ইতিহাস বিকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকালের কোন কিছুরই সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার উপায় নেই।

আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সেই খণ্ডরূপ। এক অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতি বলে সে-যুগের সংস্কৃতিকে অভিহিত করবার কোন উপায় নেই। এক অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের সংস্কৃতিও এক হয়নি, হতে পারেনি। সমাজে নানা রকম ভেদাভেদ ছিল। দাস-প্রভুর ভেদাভেদ ছিল। সামন্তপ্রভু আর কৃষকের মধ্যে ব্যবধান ছিল। ধর্মভেদ ছিল। জাতিভেদ ছিল। অধিকারভেদ ছিল। পোশাকে-পরিচ্ছদে,

খাওয়ায়-পরায়, চলায়-ফেরায়, কথায়-বার্তায়, চিন্তায়-ভাবনায়, জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল। ভেদাভেদ ছিল। তার প্রমাণ 'চণ্ডালঃ সপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ো' ইত্যাদি পাঁতি। মূল কথাটা হল, যারা চণ্ডাল, যারা ছোটলোক, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য তারা গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারবে না, গ্রামের বাইরে বাস করবে। দুই নম্বর, তারা পুরো চালের ভাত রেঁধে খেতে পারবে না, উচ্ছিষ্ট খাবে; যদি উচ্ছিষ্ট না পায় তবে তারা ক্ষুদ রেঁধে খাবে, ভাত রেঁধে খেতে পারবে না। পুরো কাপড়—নতুন কাপড় তারা পরতে পারবে না, তারা ছিন্নবস্ত্র পরবে।—এগুলোর অধিকার ছিল না। আমি নিজে দেখেছি ১৯৪০-এর আগে সব লোকের জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। যেমন পিয়ন-চাপরাশির সাহেবের সামনে জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। ছোটলোকে বড়লোকে ব্যবধান ছিল। গ্রামাঞ্চলেও ব্যবধান প্রখর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছে। পোশাকে-পরিচ্ছদে রীতিনীতিতে ভেদাভেদমূলক অনেক রীতি এখন উঠে গেছে। এগুলো আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি। কাজেই সংস্কৃতির কথা যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, মানুষের সংস্কৃতিতে সেকালে বারো আনা প্রভাব ছিল ধর্মের এবং পার্থিব ও সামাজিক নিয়মের। প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতি হচ্ছে চেষ্টা দ্বারা অর্জিত আচরণ। মানুষ উৎকর্ষ অর্জন করতে চায়। উৎকর্ষ অর্জন করবার—excell করবার—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবার, সুন্দরতমকে পাওয়ার, মহত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টার পেছনেই মানুষের সংস্কৃতির অস্তিত্ব। এই সংস্কৃতির অধিকার লাভের জন্যে একটা দৈশিক অবস্থা চাই, একটা বৈষয়িক পরিস্থিতি চাই, একটা আর্থিক পর্যায় চাই, একটা রাষ্ট্রিক স্তর চাই, শৈক্ষিক স্তর চাই। তা না হলে সুন্দরতম অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি অশিক্ষিত, অনভ্যস্ত, কোন উৎকর্ষ অর্জন করেনি, তাকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলেও তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সহজেই চোখে পড়ে। আমার বাসার চাকুরেকে আমার পোশাক পরিয়ে দিলেও সে চলতে পারবে না। যে ব্রাহ্মণ নয়, যে মৌলানা নয়, তাকে ব্রাহ্মণের বা মৌলানার পোশাক পরিয়ে দিলেও সেভাবে চলতে পারবে না, cheat হিসেবে সে ধরা পড়বে কিংবা লোকে তাকে cheat বলবে। তখনকার দিনে ধর্ম দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে এবং এসব বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে সাংস্কৃতিক মান

নির্ণীত হত। শিক্ষা দিয়েও নির্ণয় করা হত। কিন্তু এসব অর্জনের জন্যে জন্ম-গত অধিকার দরকার হত। আর্থিক সঙ্গতিও দরকার হত। জন্মগত অধিকার আর আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে জীবনে লাবণ্য ফোটাবার—সুন্দর চিন্তা করার এবং সুন্দর জীবন যাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হত। আমি যতই সুন্দর মনের অধিকারী হই, যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন হয় যে, আমার কোন অধিকারই নেই, কিংবা যদি আমার কোন আর্থিক সঙ্গতি না থাকে, তাহলে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, আমার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আর্তনাদে পরিণত হবে। সে যুগে এটাই হয়েছে কোটি কোটি মানুষের বেলায়। ইচ্ছা করলেই মানুষ সংস্কৃতির চর্চা বা সাধনা করতে পারে না। সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, আর্থিক এবং প্রথা-পদ্ধতি, আচারবিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছুর বাধা থাকে। সে যুগের বাঙলাভাষী এলাকা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল, বৈচিত্র্য ছিল। ধর্মের পার্থক্যের জন্যেও পার্থক্য ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধের সংস্কৃতি এক ছিল না, আর মুসলমানের ছিল আরও আলাদা। আবার সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর-ভেদের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল। এই ঢাকা শহরেই নীলক্ষেত এলাকার সঙ্গে পুরোনো ঢাকার—লালবাগ-ইসলামপুরের-সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। আবার গুলশান-ধানমণ্ডি ইস্কটন-বেলি রোডের সংস্কৃতি অন্য এলাকার সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্যের জন্যে এই পার্থক্য। জাতিভেদেও সংস্কৃতির পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-আশরাফ আতরাফে পার্থক্য ছিল। কাজেই সেকালের সংস্কৃতিকে ঢালাওভাবে বাঙালী সংস্কৃতি বললে ভুল করা হয়। সেকালের রাজ-নীতি, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য, জীবনপদ্ধতি, ধর্ম—এসবের কোনটারই জাতীয় রূপ কল্পনা করা যায় না। তা করতে গেলে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ক্ষতি হবে।

আমাদের দেশের পরিচয় নিতে হলে—জিওপলিটিকাল পরিবর্তনের কথা জানতে হবে। এই ভূখণ্ডে রাজ্য, রাষ্ট্র, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন যুগে যুগে কি-ভাবে হয়েছে—তা জনপদের যুগ থেকে আজকের বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত—সবটা জানতে হবে। জাতি পরিচয়ে আমরা অষ্ট্রিক মঙ্গোলদের বংশধর—তা স্বীকার করতে হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। আত্ম-অবমাননা বোধ করবারও কিছু নেই। আত্মপ্রবঞ্চনা করে মিথ্যা পরিচয়ে বড় হবার চেষ্টা করলে আমরা

বড় হতে পারব না। ছোট হব।

অষ্ট্রিক-মঙ্গোলদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। সেটাই চিরকাল বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা। তার প্রভাব থেকে বাঙালী কখনও মুক্ত হতে পারবে না। সে পরিচয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেও মুছে দেওয়া যাবে না। বাঙালীর চেতনায়, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে—যুগ যুগ ধরে চলছে। সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব—এগুলো হচ্ছে বাঙলার আদি মঙ্গোলদের দান, আর নারী-দেবতা, পশু-পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি হচ্ছে অষ্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনও মুক্ত ছিল না, আজও মুক্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ-বৈশিষ্ট্য বাঙালীর চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত। বাঙালী বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনও সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙালী রূপ নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে মহাযানী-দেহতত্ত্বে ও দেব-ভাবনায় অবসিক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গীতি-স্মৃতি-সংহিতা-বিরুদ্ধ লৌকিক দেব-পূজায় রূপায়িত, ইসলামও লোকায়ত রূপ পেয়ে পরিবর্তিত। এখানে এসে সব শাস্ত্রই বাঙালী চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবনে জীবিকার অরি-মিত্র দেবদেবী—মনসা, শীতলা, ওলাদেবী, সত্যনারায়ণ—হিন্দুর জীবন করছে নিয়ন্ত্রিত। তেমনি কেরামত আলীর ও ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদের প্রভাবও। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের ধর্ম ছিল তাবিজে-কবজে-পীরে-দরগায় এবং সত্যপীর-ওলাবিবি খাজাখিজির সেবায় সীমিত।

নির্ভেজাল মানব সংস্কৃতির কথা আমরা আজও ভাবতে পারি না। সম্প্রদায়-চেতনার কূপমণ্ডুকতা আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনা যখন শুনি, তখনও মিথ্যা আস্ফালন আর অতীত নিয়ে অযথা গর্বে বুক স্ফীত করার চেষ্টা দেখতে পাই। ভাবটা এমন যেন সংস্কৃতি একটা জিয়ল মাছ। রক্ষা করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে জিয়ল মাছের মতো সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো প্রবহমাণ—গতিশীল। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সচল থাকে। সেই চলমানতার প্রয়াস চালালে, নতুন সৃষ্টি দিয়ে কিংবা কল্যাণকর অনুকৃতি দিয়ে সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে পারলেই আমরা

কল্যাণবুদ্ধির পরিচয় দেব। সৃষ্টির ধারায় নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতির সকল রাষ্ট্রের মহত্তর যা কিছু, তা গ্রহণ করে নিজেদের সৃষ্টি-শক্তিকে বিকশিত করতে হবে। অন্যথায় বাঙালী সংস্কৃতির গর্বে—শুধু আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে—কোন মঙ্গলের ভরসা নেই।

লোকসংস্কৃতির মাহাত্ম্য কীর্তনের চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মধ্যে। লোক-সংস্কৃতি মানে কি? আমাদের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, জনসাধারণের এবং হাজার বছরের অতীতের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। সেই অজ্ঞতাকে, সেই কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করে আজ লাভ কি? এই বিজ্ঞানের যুগের দিকে পিছন করে অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চালালে তার পরিণতি কি হবে? আমাদের অক্ষমতা ও দীনতাকে বড় করে কি লাভ? ঢাকা শহরে আমরা নিজেদের জন্য কামনা করছি বিল্ডিং, ফ্যান-ফ্রিজ-ফোন-সোফা ইত্যাদি; অথচ এই ঢাকা শহরেই যাত্রা, জারী-পিঠা, শিকা-ডালের পাখা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর দ্বারা গণমানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আমরা নিজের জন্যে যা কামনা করি না, অন্যের জন্যে তা কামনা করা উচিত নয়। মাটির ঘর আর বেড়ার ঘরকে বড় করে দেখিয়ে নিজেদের জন্য এয়ার কণ্ডিশনের এই আয়োজনে প্রবঞ্চনা আছে—প্রতারণা আছে। গ্রামের মানুষ যে দুঃখে আছে, তা দেখে আমাদের কান্না পাওয়া উচিত। সে জায়গায় লোকসংস্কৃতির নামে এই প্রহসন করে—হাসির আর রঙ্গ-রসিকতার এই ব্যবস্থা করে লাভ কি? লোকসাহিত্য ধারা নষ্ট হয়ে গেল বলে বিল্ডিংএ থেকে এই দরদ দেখানো তো গণমানুষের প্রতি ব্যঙ্গ করারই শামিল। রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে এই প্রহসনে। লোকের নিঃস্বতার, দুর্ভাগ্যের, নিরক্ষরতার এবং সেইসঙ্গে লোকসংস্কৃতির অবসান চাই আমরা।

ইতিহাসচেতনা দিয়ে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হতে চাই তা হলে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সেজন্যে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা একটা নির্জিত জাতি, আমরা একটা পীড়িত জাতি। আমরা দুই হাজার বছর ধরে বিজাতি, বিভাষী, বিদেশীদের দ্বারা পীড়িত হয়েছি, নির্জিত হয়েছি। আমাদের স্বগোত্র স্বজাতি আজও নিরন্ন, নিপীড়িত, নিম্নবিত্ত ও মানবিক-মৌলিক অধি-

-কার-বঞ্চিত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদীরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি, আমাদের ভাই। আমাদের দেহে তাদেরই রক্তের ধারা বহমান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাঁওতাল, কোচ, গারো, খাসিয়া, চাকমা আমাদের ভাই। আমরা যারা আমাদের গোত্রপরিচয় মুছে দিয়ে আমাদের জাতিপরিচয় লুকিয়ে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি শাসক শ্রেণীতে মিশে যেতে চেয়েছি, শাসকের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেছি, শাসকের পরিচয়ে আত্মপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি, তারা ভুল করেছি, আত্ম-প্রবঞ্চনা করেছি—তার জন্যে আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। এটা আমাদের উপলব্ধিতে না এলে ইতিহাস চর্চা হবে অর্থহীন। মুসলমান হয়ে যারা তুর্কী-মোঘলদের জাতিত্বের পরিচয় দিয়ে, আরবী-ইরানী পরিচয় দিয়ে, নামের সঙ্গে সৈয়দ কোরেশী ইত্যাদি লাগিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করেছে তারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে—আমাদের সর্বনাশ করেছে। তারা নিজেরা দুইকূল হারাবার অবস্থায় পৌছবে। কারণ মিথ্যা কুলপরিচয়ে—নিজের বাপ-ভাইয়ের পরিচয়কে মুছে ফেলে—মিথ্যা খানদান পরিচয়ে—শেষ পর্যন্ত দাঁড়ানো যায় না। বাঙলাদেশে যত সৈয়দ আছে, কোরেশরা যদি প্রত্যেকে চৌদ্দটা করে বিয়ে করতো এবং প্রত্যেকের পঞ্চাশটা করে সন্তান হত তাহলেও বোধহয় এত হত না। ভেবে দেখুন আমরা কি মিথ্যা পরিচয়ে চলছি। গত আড়াই হাজার বছর ধরে যে-ই বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছে সে-ই বলেছে যে, বাঙালী চোর, মিথ্যাবাদী, ভীরু, কাপুরুষ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি। এর কারণ কি? কারণ আমরা পরাধীন ছিলাম। যে পরাধীন, যে দাস, সে-তো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মেরুদণ্ড ঋজু রাখতে পারে না, সামনা-সামনি কথা বলে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। তাতে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণতা ও কাপুরুষতা জাগে। স্বনির্ভর হয় না, ফিকিরে বাঁচতে চায় বলে চোর ও মিথ্যাবাদী হয়। সংঘশক্তি গড়ে ওঠে না। সংঘশক্তির জন্যে দরকার নতুন আত্মচেতনা। ইতিহাস যদি সেই আত্মচেতনা আমাদের মধ্যে জাগায়—অতীতের কলঙ্ক জয় করে যদি আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি, তা-হলেই এইসব আয়োজনের সার্থকতা। নইলে মিথ্যা আস্ফালন আর জাতীয় গর্বে—বাঙালী গর্বে—আমাদের কল্যাণ নেই।

এত পীড়নের মধ্যেও বাঙালী টিকে আছে। বাঙালী জনসাধারণ গণশক্তির

পরিচয় দিয়েছে। বাঙালী জনগণ সম্ভাবনাহীন নয়—সম্ভাবনাহীন হলে বাঙালী আজও টিকে থাকতে পারত না। বাঙালী সুস্থ এবং স্বস্থ হলে জয়ী হবেই।

কিন্তু আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার এবং দাসত্বের মনোভাব বদলাতে হবে। যে পরাধীন, পরাধীনতার মনোভাব যার প্রতি পদক্ষেপে—সে কখনও প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। বাঙালীকে মানুষ হতে হলে আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীন মানুষের চেতনা অর্জন করতে হবে। মোনাফেকের স্বভাব ত্যাগ করে, পেছনে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করে, কূর্ম-স্বভাব ত্যাগ করে, কালো পিঁপড়ের মতো তাড়া খেয়ে লুকোবার স্বভাব ত্যাগ করে, মেরুদণ্ড ঋজু করে দাঁড়াতে হবে। বাঙালীর চাই চরিত্র, চাই মনুষ্যত্ব, চাই মহত্ব, চাই আদর্শপরায়ণতা, চাই মহৎ ও সুন্দরের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম। এসব অর্জনের চেষ্টা করলে বাঙালীর সুপ্ত শক্তি, অবদমিত শক্তি, আড়াই হাজার বছরের অবদমিত শক্তি জেগে উঠবে। বাঙালী পৃথিবীর বুকে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে—প্রকৃত আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে। তখন পৃথিবীকে জানাবার মত একটা নতুন বাণী নিয়ে বাঙালী দাঁড়াবে।

বাঙালী নিজের মনের মত না হলে কিছুই গ্রহণ করে না, কিছুই মানে না। শক্তি দিয়ে যারা মানায়, তাদের শক্তি পশুশক্তি। পশ্বাচার মানুষের কাম্য হতে পারে না। মানুষের সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। সাধারণ বাঙালীর মধ্যে এই সাধনা দুর্লভ নয়। বাঙালী গণমানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—বারবার বিদ্রোহ করেছে—স্মরণাতীত কাল থেকে করেছে। পূর্ব বাঙলার বাঙালীরা করেছে, পশ্চিম বাঙলার বাঙালীরা করেছে—অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এই বাঙালীর বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা বিজাতি-বিভাষী-বিদেশীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারাই বাঙালীর সর্বনাশ করেছে। বিদ্রোহী বাঙালী পরাজয় মেনে নেয়নি। সাধারণ বাঙালী শাসিত হতে পারে, কিন্তু দাসত্ব মানেনি—তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকিয়ে দেয়নি। এই-যে বিদ্রোহী বাঙালী, তার জয়ের সম্ভাবনা অফুরন্ত।

সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরীবের এক সংস্কৃতি, অস্পৃশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রভুর এক সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণের এক সংস্কৃতি, ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মোনা-

ঞ্চকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। এক-দিকে জালেমের সংস্কৃতি, আর একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। আমরা কোন্ সংস্কৃতি চাই? আমরা কার পক্ষে? নাকি আমরা নিরপেক্ষ? নিরপেক্ষ তো ধূর্ত, কপট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, চালবাজ, সুবিধাবাদী, মোনাফেক, মক্কার। আমরা তাহলে কোন্ সংস্কৃতির প্রতিনিধি—জালেমের না মজলুমের?

ইতিহাসের আলোচনা থেকে এটাই আমাদের শিখতে হবে যে, আমাদের স্বস্থ হওয়া দরকার—আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। বাঙলাভাষী অঞ্চলের রাষ্ট্রসত্তার বিবর্তনের পরিচয় ভৌগোলিক পটভূমির আশ্রয়ে আমাদের বুঝতে হবে—ঐতিহাসিক প্রবণতা ও ইতিহাসের ইঙ্গিত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি একথা স্বীকার করার সৎসাহস অর্জন করি যে, আমাদের দেহে শেখ-সৈয়দ-কোরেশীর রক্ত নেই, তুর্কী-মোঘল-পাঠানের রক্তও নেই, আর্যরক্তও নেই—আমরা এই দেশের এই মাটিরই সন্তান, আমরা যদি মানতে পারি যে, আমাদের শতকরা সত্তর ভাগ অষ্ট্রিক, পঁচিশ ভাগ মঙ্গোল এবং বাকি পাঁচ ভাগ হাবশী, তুর্কী, মোঘল, আফগান, ইরানী ইত্যাদি সঙ্কররক্তের, এবং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে অষ্ট্রিক, মঙ্গোল, হাবশী, তুর্কী, মোঘল, আফগান, ইরানী সব আজ এক দেহে লীন, এবং আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাদের দেব-দেবী, ধর্মচিন্তা, আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি কোথা থেকে এসেছে এবং এগুলোর উৎস কোথায়, আদি কোথায়, তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারব, এবং অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হবে। আর্যরক্তের গৌরব করার একটা প্রবণতা সারা ভারত জুড়ে আছে, বাঙলার-বাঙলাদেশের মুসলমানেরও আছে। যে মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু, বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, সেও গর্বের সঙ্গে পরিচয় দিতে চায় এই বলে যে, ব্রাহ্মণের থেকে কনভার্ট হয়েছিল। যা কিছু ভাল, মহৎ, বড়, সবই আর্যের দান—এমন ধারণা আজও প্রচার করা হয়। আর্য-সভ্যতা বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারক বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টার আজও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যের অবদান কি? আর্যরা ঋগ্বেদের কিছু অংশ সম্বল করে পশ্চিমের পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যেহেতু তারা সংখ্যায় অতি অল্প—সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তুলনায় আর্য একেবারেই অল্প—কাজেই তারা তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে রক্ষা করে চলতে পারেনি। যেমন

মোঘল, পাঠান, তুর্কী, কেউই ভারতে এসে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি আর্যেরাও পারেনি। এজন্যেই ঋগ্বেদের ধর্ম তারা রক্ষা করতে পারেনি। ভারতীয় সম্পদ তারা গ্রহণ করেছে, দখল করেছে। এতে আমাদের বাঙলাদেশেরও দান আছে। আমাদের নিজেদের সম্পদ সাংখ্য, তন্ত্র এবং যোগ তারা গোড়াতেই গ্রহণ করেছে—গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, মন্দির উপাসনা, পশুদেবতা, বৃক্ষদেবতা ইত্যাদি, বার মাসে তের পূজা সবগুলোই আমাদের এখান থেকে তাদের নেওয়া। অতএব আর্য-ব্রাহ্মণ্য বললেই বড় হয় না। তারা শাসক বটে—কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিটা আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়েছে। অতএব এতেই আমাদের গৌরব যে আমরা চিরকাল এসবের উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলেছি, লালন করে চলেছি। ভারতের অন্যত্র লিঙ্গায়েত, শাক্ত, শৈব, রামনামী ইত্যাদির যে-কোন এক দেবতার পূজা প্রচলিত। শুধু বাঙালীই সব দেবতার পূজা করে। তাই পঞ্চোপাসক বলা হয় বাঙলার হিন্দু সমাজকে। আমাদের কৃতিত্ব হল এর সবগুলোই আমাদের দেবতা, আমাদের বানানো দেবতা—আমাদের প্রয়োজনে আমরা বানিয়েছি। আমাদের দেশী দেবতা। এইসব দেবতা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নামে, ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ্য নামে, মুসলমান যুগে মুসলমান নামে চালু ছিল। কালুরায় হিন্দুর কুমীর-দেবতা—মুসলমানের কালুগাজী, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ-সত্যপীর প্রভৃতি সেব্য দেবতা। বাঙালী মুসলমান যে শতকরা পঁচানব্বই জন হাড়ি, ডোম, বাগদী, চাঁড়াল, মুচি, মেথর থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে, হিন্দুর মধ্যে উনিশ শতক পর্যন্ত যেমন নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না তেমনই মুসলমানেরও ছিল না। ওরা যেমন দেবতার পূজা করে—নিম্নবর্ণের লোকদের দেবতা আলাদা, সেই রকম বাঙালী মুসলমানের দেবতাও আলাদা। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেমন নিজেদের কৃতি ও কীর্তির স্বাক্ষর নিজেরা রাখতে পারেনি তেমনি বাঙালী মুসলমানও পারেনি। বাঙালী মুসলমানেরা আজ অবধি সাতশ বছরেও একজন বাঙালী দরবেশ তৈরি করতে পারেনি। সব দরবেশ বিদেশী-বিভাবী—আল মাদানী, আল বোখারী, সমরখন্দী। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা কিছু করতে পারিনি, ফলে আমরা শুধু নিয়েছি। আমাদের দৃষ্টি এখনও আরব-ইরান-ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরে, আমরা এখনও আমাদের ঐতিহ্য সন্ধান করি স্বধর্মীর

সাহারায় ও গোবি মরুভূমিতে। সেজন্যেই বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ইতিহাসে মুসলমানের দান ইত্যাদি নিয়ে আজও বাঙালী মুসলমানের গর্ব-গৌরবের অন্ত নেই। এই করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। নিজের জাত-জন্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আত্মপরিচয় গোপন করে কুল-খানদানের মিথ্যা পরিচয় জোগাড় করে কোন জাতি বড় হয় না—হতে পারে না। স্বরূপে জানতে হয় নিজেকে। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল'—এই মনোভাব থাকতে হয়। ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়? চোরের ছেলে চোর না হয়ে ভাল মানুষও হয়। আবার মহাপুরুষের ছেলেও কাপুরুষ অমানুষ হয়। ঐতিহ্য কি করে? মহাপুরুষের বংশধরদের চিরকাল মহাপুরুষ করে তুলতে পারে না কেন ঐতিহ্য? এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। উত্তরের দরকারও নেই। আমাদের শুধু দরকার এই মনোভাব যে, আমাদের বাঙালীদের বড় হবার সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নেই—সব আমাদের করে নিতে হবে এবং সব আমরা করে নেব। ঐতিহ্য কি করে? ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়? গ্রীসের অনেক ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তারা আজ কোথায়? রোমের অনেক ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তারা আজ কোথায়? শের শাহের কি ঐতিহ্য ছিল? আফ্রিকার কি ঐতিহ্য আছে? তাই বলে আফ্রিকা কি উঠবে না কোন দিন? ঐতিহ্য না থাকলে কি হয়? আমাদের কিছু নেই, কিন্তু সম্ভাবনা তো আছে? আমরা গড়ে নেব, চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের কিছু আর্য, কিছু আরবী, কিছু ইরানী ইত্যাদি করে আমরা যেন আর আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। আমাদের প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচিত হবে জনপদভিত্তিক, মধ্যযুগের ইতিহাস হবে অঞ্চলভিত্তিক, আধুনিক যুগের ইতিহাস হবে বাঙালীর জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতিভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজব জীবিকাপদ্ধতিতে এবং সাংখ্য-যোগ ও তন্ত্র দর্শনে, মধ্যযুগে খুঁজব জীবন-জীবিকার অরি-মিত্র দেবকল্পনায় ও বিদেশীপ্রভাবে এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসে সন্ধান করব য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন-সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে, চেষ্টা করলে বাঙালী উন্নতি করবেই—এটা বিশ্বাস করি।

বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনজীবনে শাস্ত্র ও শাসকের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। শাস্ত্র ও সরকার বলতে গেলে জনজীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করত, বিশেষ করে এদেশের বর্ণে বিভক্ত তথা জীবিকায় বিভক্ত জনসমাজে শাস্ত্র ও সামন্তের দাপট ছিল প্রবল। তাই জন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বলতে গেলে সরকার প্রভাবিত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাছাড়া যখন শাসকগোষ্ঠী হত বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী ও বিভাষী, তখন দেশী-বিদেশী সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিত, তার পরিণামে গ্রহণে-বর্জনে যে মিলনমুখী মিশ্র-সংস্কৃতির ও সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব হত—তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ত সাহিত্য-সঙ্গীত, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিদেশী-বিধর্মীর সংস্পর্শে আসার ফলে এভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রথমে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় এবং তাতে দেশী মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার ও জগৎভাবনায় যে রূপান্তর ঘটে, তা সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্তি পায়। এই জন্যেই সাহিত্যাদির ইতিহাসে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও তজ্জাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাও আলোচনা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বাঙলাদেশ প্রায় চিরকালই ছিল বিজাতি বিজিত দেশ। কাজেই বাঙলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিকথা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একালেও আমরা বুঝি শাসক-প্রশাসকের শাসন নীতি, নৈতিক আদর্শ ও হিতচেতনার ধরনের ওপর নির্ভর করে জনমনের ও জনজীবনের বিকাশ-বিবর্তন কিংবা অবক্ষয় ও বন্ধ্যাত্ব। কাজেই শাসকবর্গের আনুকূল্য ও বিরূপতা জনমন ও মনন তথা সামাজিক-নৈতিক-বৈষয়িক-আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে জনজীবনের সব প্রচেষ্টার মধ্যেই শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকে। আজো পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোতে তা-ই হচ্ছে। কাজেই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পালাবদল তথা যুগান্তর-রূপান্তর ঋতুর প্রভাবের মতো প্রশাসনিক প্রভাবেরই ছাপযুক্ত।

বাঙলা সাহিত্যকে আমরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মোটা-মুটিভাবে তিনভাগে নির্দেশ করি, এবং অবচেতনভাবেই এ-বিভাগের ভিত্তি

করেছি রাজনৈতিক পরিবর্তন। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমল যদিও প্রাচীনযুগ নামে চিহ্নিত কিন্তু এই চার বংশীয়দের রাজত্বকাল অভিন্ন নয়। গুপ্ত ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ। আবার সেনেরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের লোক, তাঁদের রাজত্বও ছিল বাঙলার সীমায় নিবদ্ধ। পাল-রাজত্বের শুরু ও শেষ মগধে। বাঙলার অধিকাংশ অঞ্চল যেমন তাঁদের শাসনে ছিল তেমনি বিহার, ওড়িশা, মধ্য ও উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশও ছিল তাঁদের অধিকারে। আবার গুপ্তরা ছিলেন উত্তর বিহার সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশীয়। আর মৌর্যরা ছিলেন বৌদ্ধ ও মাগধী। কাজেই ধর্মীয় গোত্রীয় ভাষিক ও দৈশিক পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন এবং তাঁদের শাসন তথা আমল অভিন্ন যুগলক্ষণে চিহ্নিত করা চলে না। অতএব হাজার বছর কাল ধরে এই চার বংশীয়ের রাজত্ব-কাল চলেছে এবং লঘু-গুরু যাই হোক না কেন জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্তত চারটে যুগান্তর যে হয়েছিল তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। অবশ্য এই যুগের সবটা আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়। তাই একে আমরা 'প্রাচীনযুগ'—এই সাধারণ নামে চিহ্নিত করে রাখছি। তেমনি তুর্কী বিজয়ে শুরু হয় মধ্যযুগ। পরে যখন মুঘল বিজয় ঘটে তখন মুঘল আমলকেও আমরা মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করি। যদিও তুর্কো-আফগান-মুঘল শাসনকালে আরব-ইরানী ও মধ্যএশীয় বহু জাতি-উপজাতির প্রভাবে সুদীর্ঘ সাতশ বছরের সময় পরিসরে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রসার ও রূপান্তর ঘটেছে অনেক। জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবু আমরা এই সাতশ বছরের সময় পরিসরকে তুর্কীযুগ, মুঘলযুগ কিংবা আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগ বলে আখ্যাত করি। অবশ্য মানতেই হবে এর বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—তেমনি ব্রিটিশ বিজয়ে আধুনিক যুগের আরম্ভ মনে করি কিন্তু আঠারো শতকের আধুনিক যুগে আর বিশ শতকের আধুনিক যুগে পার্থক্য যে বিপুল ও বিচিত্র তা কে অস্বীকার করবে?

যা হোক শাস্ত্রিক সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যে মুখ্যত রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই প্রসূন এবং সেই তত্ত্ব বোধগত না হলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কিংবা পাঠ করা অনেকটা অসার্থক হয়, তা আমরা জানি ও মানি। সে পরিবর্তন বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীর বিজয়ে, আগমনে ও শাসনে শুরু হলে তা যুগান্তর ঘটায়। এ প্রভাব মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচারে-

আচরণে-মনে-মননে-পোশাকে-আসবাবে এমনকি জীবিকাপদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটায়। এমনি করে নতুন যুগে নতুন মানুষ নতুন কথা বলে। নতুন সম্পদ ও সমস্যায়, আনন্দ ও যন্ত্রণায় প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়, এমনকি একই বংশীয়ের শাসন আমলেও শাসকের মেজাজ-মর্জি এবং আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে শাসিত-জনের সমাজ-সংস্কৃতি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাঙলায় যে অংশ নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের শাসনে ছিল, সেই অংশে নিশ্চিতই কথ্য মাগধী-প্রাকৃত, লেখ্য শৌরসেনী-প্রাকৃত এবং জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি এবং উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রিক শাসনপদ্ধতি চালু হয়েছিল। এ সময় সংস্কৃত নয় বরং প্রাকৃতই যে দরবারী ভাষা ছিল, তার প্রমাণ মৌর্য যুগের বলে অনুমিত মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি। লেখ্যভাষা ব্যতীত অনুন্নত অস্ট্রিক গোত্রের প্রায় সব কিছুর বাহ্যত ইতি ঘটিয়ে মগধরাজ্যভুক্ত অংশের আর্যায়ণ বা আর্যীকরণ এইভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে। এই বৌদ্ধ-শাসকদের আমলে রাজ্যভুক্ত শাসিত জৈনদের ওপর যে পীড়ন হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোকেরই এক আদেশসূত্রে। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্ত আমলে নিশ্চয়ই এই দেশে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি-আচার-পার্বণ লক্ষণীয়রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই সাতশতকের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন প্রসঙ্গে য়ুয়ান চোয়ঙ বৌদ্ধ বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তেমনি বৌদ্ধ পাল আমলে বৌদ্ধরা স্বধর্মীর শাসনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে তারা তখন আত্ম-প্রত্যয়হারা এবং শঙ্করাচার্যের নব জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নির্জিত বৌদ্ধমতের পক্ষে মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায়—যার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এল। এই সময়েই নিম্নবিত্ত ও সমাজ বহির্ভূত বৌদ্ধরা পীড়ন ভয়ে হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম রক্ষা করে। নাথযোগী, ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজিয়া বৈষ্ণব-বাউল ও শৈব নাথপন্থীরা—সবাই ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত ঐ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ নিদর্শন বাঙলায় যেন সুপরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। আবার তুর্কী আমলে দেখতে পাই সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির রোষের ভয়ে এতকাল যারা তাদের বিশ্বাস-সংস্কারে গড়া লৌকিক দেবতার তথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ঋদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট ইষ্ট ও অরিদেবতার পূজা কিংবা মাহাত্ম্যকথা নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে-নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি, তারা বিদেশী-বিধর্মী তুর্কী শাসকের

প্রশ্রয়ে বা ঔদাসীন্যে কিংবা উৎসাহে ক্ষমতাবিচ্যুত সমাজপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে স্ব স্ব ইষ্ট ও অবিবেকতার মঙ্গল-গানে মুখর করে তুলল বাঙলার পরিবেশ। আবার ব্রাহ্মণ্যমত ও ইসলামের দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রসূন মেলে উত্তর ভারতীয় সন্ত-মতের আদলে সৃষ্ট চৈতন্যদেবের নব বৈষ্ণবমতে। শঙ্কর রামানুজ-মাধব-নিম্বার্ক-ভাস্কর-বল্লভ, কবির-নানক-দাদু-একলব্য-রামদাস-রামানন্দ কিংবা চৈতন্যদেবের নব প্রেম-ভক্তিধর্ম বিজেতার ধর্ম ইসলামের সঙ্গে পরিচয়েরই প্রসূন। এগুলোই আবার ইসলামের প্রসারে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মুঘল বিজয়ের প্রভাবে বাঙালী মনের ও সাহিত্যের যুগান্তর লক্ষণীয়। পীর-নারায়ণ-সত্যের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব, বাউল মতের প্রসার, ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব-বাহুল্য, উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা-প্রবণতা প্রভৃতি তার সাক্ষ্য। ব্রিটিশ অধিকারেও প্রতীচী-পরিচয়ের আলো-আঁধারির যুগে—যুগসন্ধিক্ষণে নতুন বন্দরনগরী কলকাতায় পাই হিন্দুর কবিগান ও মুসলমানের দোভাষী সাহিত্য। কাজেই শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও বৈষয়িক জীবনের সবক্ষেত্রেই রাজনীতিক-প্রশাসনিক প্রভাবের গুরুত্ব ছিল সমধিক। আজও তাই আছে।

অতএব আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যুগান্তর বা রূপান্তর কিংবা বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভাবপ্রসূত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই লৌকিক পৌরাণিক লোককাহিনীর জনপ্রিয়তা, বিধর্মী তুর্কীর প্রশ্রয়ে বা উৎসাহে শুরু হ'ল শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপজনক কর্ম—শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ। ব্রিটিশ আমলে যেমন ধন-যশ-মানলোভী হিন্দুরা বেপরোয়া হয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে ম্লেচ্ছ-স্পর্শ-দুষ্ট হতে গৌরববোধ করেছে, তুর্কী আমলেও তেমনি রৌরব নরকভীতি কিংবা সামাজিক নিন্দা উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থই এগিয়ে এলেন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদে। বর্ধিষ্ণু লোকায়ত ধর্মের অনাচার থেকে স্মৃতিশাসিত পৌরাণিক ধর্মরক্ষার প্রেরণাই ছিল এর মূলে।

অতএব তুর্কী আমলের শুরুতে পাচ্ছি লৌকিক কৃষ্ণকথা, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা, নাথ-গীতি, পালগীতি প্রভৃতি। পনেরো-ষোল শতকের দিকে তুর্কী প্রতিপোষণে পাচ্ছি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ। তুর্কীর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও সংঘাতমুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সনাতন ধর্মের সংস্কার ও

রক্ষণপ্রয়াস—রঘুনন্দন-রঘুনাথ-রামনাথ প্রমুখের ন্যায়-স্মৃতি ইত্যাদির চর্চায়।

আর চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে পাই দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় আদলে নব মত প্রচারের মাধ্যমে কাল-উদ্ভূত শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এবং এই প্রয়াসের প্রসূন হচ্ছে পদসাহিত্য, দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ, রাগ-তাল ও বাদ্য-যন্ত্র, চরিতগ্রন্থ প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ। ষোল-আঠারো শতকে মুসলিম কবির প্রণয়োপাখ্যান, শাস্ত্রগ্রন্থ ও চরিতগ্রন্থাদি, গাথা-গীতিকা, পীর-নারায়ণ-সত্য ও তাঁর চেলা পীর-দেবতাদের মাহাত্ম্য কাহিনী, সতেরো-আঠারো শতকে পাই সহজিয়া বাউলের নানা উপশাখার সাধনশাস্ত্র হঠযোগ গ্রন্থাদি, আঠারো শতকের শেষার্ধে কোম্পানী শাসনের গোড়ার দিকে মেলে কবিগান ও দোভাষী সাহিত্য।

এইসব সাহিত্যের উদ্ভবের ও বিকাশের মূলে সমকালীন প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। কাজেই কারণ-কার্য বোঝার জন্যেই বাঙলার রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের জানা আবশ্যক। এ-সূত্রে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলাদেশ কিংবা ভাষিক বাঙলা-দেশ ব্রিটিশ-পূর্ব কালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। কাজেই বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে বিকাশ-বিবর্তন পেয়েছে।

২

ইতিহাসবিরল এই দেশের অতীত বহু গবেষণায়ও এখনো কায়া ধারণ করেনি। এমনকি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের অবয়ব পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কাজেই কায়ার প্রতি-ভাসে ছায়াই আমাদের সম্বল।

নেগ্রিটো-মঙ্গোলীয় রক্ত-সঙ্কর অষ্ট্রিক বাঙালী জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ-পূর্ব কালে সভ্যতার কোন্ স্তরে ছিল তা আমরা স্পষ্টভাবে জানিনে। তবে পশ্চিম-বঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি দৃষ্টে মনে হয় একটা উন্নয়নশীল জাতি ও বিকাশমান সংস্কৃতি তাদের কোন কোন গোত্রের ছিল। মহাভারতিক পৌরাণিক (মৎস্য ও বায়ু) কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না। প্রাচীন বাঙালীর বর্ণমালা কিংবা লেখ্যভাষা ছিল না, তাদের যোগ-সাংখ্য-তন্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান থাকলেও আধুনিক অর্থে কোন Religion যে তখন গড়ে ওঠেনি, তা জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহজ প্রসার থেকে অনুমান করা চলে।

এও হয়তো সত্য যে গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বে তখনো তারা সর্দারতন্ত্রের আওতায় যৌথ জীবন যাপন করত। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে বর্ণিত মহাবীরের প্রতি রাঢ় অঞ্চলের লোকের আচরণ এই অনুমানের প্রবর্তনা দেয়। রাজা ও রাজ্য গড়ে ওঠার মতো সংস্কৃতি ও সভ্যতা তখনো তাদের অনায়ত্ত—তাই আর্যরা তাদের দস্যু ও পাখি বলে অবজ্ঞা করত, তাদের স্পর্শও আর্যদের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত হত। কাজেই উত্তর-পশ্চিমের আর্যীকৃত অঞ্চলের তথা পাটলীপুত্রের নন্দ-মৌর্য-শুঙ্গ-কাণ্বরাজারা জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশকালে রাঢ়ে-পুণ্ড্রে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা যেমন কোন এক নামে পরিচিত ছিল না, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল তেমনি গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিবেশিক রীতি-নীতির পার্থক্যও ছিল। যানবাহনের অভাব স্থূল জীবনযাত্রা এবং স্থানিক ও গৌত্রিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

উত্তর ভারতের সঙ্গে শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক যোগ স্থাপিত হওয়ার পরে আমরা প্রাচীন বাঙলাকে আদি-মধ্যযুগের সীমা অবধি গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, হরিখেল, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভক্ত দেখি। তারপরে পাই গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি নামের অঞ্চল। আবার প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে কিংবা প্রসিদ্ধি অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ-রাঢ়, উত্তর-রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালা, সুবর্ণবীথি, উত্তর মণ্ডল, সমতট মণ্ডল, হরিখেল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকার নাম পাই। ঐতিহাসিক কালে গ্রীক লেখক Pliny, Ptolemy এবং চীনা পর্যটক প্রভৃতির নানা উক্তিতেও বাঙলার কিছু পরিচয় মেলে। এ সময় বাঙলা ও বাঙালীর আর্যায়ণ পূর্ণতালাভ করে এবং পুণ্ড্র-বঙ্গ-বাসীরা তখন আর্যরূপে স্বীকৃত।

মোটামুটিভাবে আলেক্সান্দারের ভারত অভিযানকালে (৩২৬ খ্রী: পূ:) গঙ্গারিডই নামে গাঙ্গেয় বাঙলায় একটা রাজ্য ও প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে গ্রীকসূত্রে সংবাদ মেলে। এই সময়কার বাঙলারাজের নৌশক্তি ও গজশক্তি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। হয়তো পাটলীপুত্রের রাজারা তথা নন্দ-মৌর্য-শুঙ্গ-কাণ্ব বংশীয়রা রাঢ়-সুহ্ম-পুণ্ড্র শাসন করেছেন ৩১৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি গুপ্ত শাসনে ছিল বাঙলার বহু অঞ্চল। সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকে

বাঙলায় শাসন দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক ভৌগোলিক কিংবা ভাষিক সমগ্র বাঙলায় গুপ্ত শাসন এমনকি ইংরেজপূর্ব যুগে মুঘল শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়রা ব্যতীত আর কোন সার্বভৌম শাসকই হয়তো বাঙালী ছিলেন না। গুপ্তরা তো নয়ই, পালেরাও বাঙালী ছিলেন কিনা নিশ্চিত প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়ের শাসনকাল সর্বসাকুল্যে ত্রিশ বছরের বেশী হবে না। অতএব বাঙলাদেশ সাধারণভাবে চিরকালই বিদেশী শাসিত। কচিৎ দেশী সামন্ত স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যের সাময়িক অধিকারী ছিল।

গুপ্তরা প্রধানত পুণ্ড্রে ও গৌড়ে এবং শেষের দিকে বঙ্গেরও কিছু এলাকায় অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু রাঢ়-সুহ্মও তাদের শাসনে ছিল কিনা, থাকলেও কতকাল ছিল তা সঠিক বলা যাবে না। গুপ্ত অনুপ্রবেশের সময়ে রাঢ়ে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা যে রাজত্ব করতেন তার সাক্ষ্য মেলে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া তাম্রলিপিতে। কিন্তু এঁরা রাজপুত (যোধপুরী) কিংবা বাঙালী সেবিষয়ে সংশয় আছে। মেহেরাউলি লিপিতে প্রাপ্ত বঙ্গবিজেতা চন্দ্র এবং এই চন্দ্রবর্মা অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে করেন। গুপ্তদের পতনকালে ছয় শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ-সমতটে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন সামন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন বলে কিছু প্রমাণ মেলে। এঁরা ছাড়াও পৃথু রাজা, সুধন্যাদিত্য প্রভৃতি স্বাধীন সামন্ত বা ক্ষুদ্র রাজার নাম মেলে। কাজেই সেকালের পক্ষে এই বিপুল-বিস্তৃত দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্মৃতনাম রাজা ও রাজ্য ছিল।

সাত শতকের প্রথম দশকেই শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক প্রবলপ্রতাপ স্বাধীন গৌড়াধিপতির সাক্ষাৎ মেলে। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাঙলা এবং ওড়িশা ও বিহারের কিয়দংশে আপন আধিপত্য বিস্তার করে বাঙালীর গৌরব-গর্বের অবলম্বন হয়ে রয়েছেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধপীড়ক। গুপ্তদের ও শশাঙ্কের শাসনকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি প্রায় বিশ বছর প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে —বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটিতে। পূর্ববঙ্গেরও কিছু অংশ হয়তো তাঁর শাসনে ছিল। তিনি ছিলেন উত্তরভারতিক রাজা রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের উৎকল মগধ অংশ হর্ষবর্ধন এবং গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ দখল করে নেন। ভাস্করবর্মণের পরে

রাঢ়াধিপতিরূপে পাই এক জয়নাগকে। এর পরে রাঢ়-গৌড়ের প্রায় শতবছরের ইতিহাস অজ্ঞাত—এর পরই পাল রাজত্বের শুরু ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে এবং ৭৫০০-এর দিকে বঙ্গে দেখি শান্তিদেব বংশীয়দের রাজত্বের শুরু। ৭২৫-এর দিকে জয়বর্ধন নামে (নেপালী ?) শৈলবংশীয় এক রাজা কিছুকাল পুণ্ড্র শাসন করেন। মগধরাজ যশোবর্মণও আট শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলার কিছু অংশ জয় করে কিছুকাল শাসনে রাখেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কিছুকাল গৌড়-রাজ্যের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। য়ুয়ান চোয়ঙ-এর বঙ্গ ভ্রমণকালে সমতটে ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজপরিবারের সন্তান শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। সামন্তরাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সম্ভবত এই বংশীয় ছিলেন।

নেপালী-তিব্বতী-কামরূপী-মঙ্গোলীয় (?) খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ খড়্গোদ্যম, জাত-খড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজভট্ট সমতট শাসন করেন।

শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রজারা (আসলে সামন্তরা) স্ব স্ব স্বার্থে মাৎস্যন্যায়ের অবসানকল্পে এক সামন্ত গোপালকে সার্বভৌম রাজা করে আনু-গত্যের স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করল। গোপাল বাঙালী ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্যে গোপালের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধনে। কিন্তু এই উত্তরকালীন সাক্ষ্য সংশয় ঘোচায় না—কেননা পাল রাজত্বের গোড়ার দিককার প্রায় দুশোবছর ধরে আমরা পালরাজাদের অনুশাসনগুলি পাচ্ছি বাঙলা-বহির্ভূত অঞ্চলে। ওড়িশা ও মগধই ছিল তাঁদের রাজ্যের কেন্দ্রাংশ। তা ছাড়া গোটা আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা কখনো পালেদের অধিকারে ছিল না। ধর্মপালের আমলে উত্তর ভারতের পঞ্জাব অবধি তাঁর রাজ্যের বিস্তার দেখি এবং বিক্রমশীল, নালন্দা, উড্ডিয়ানা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি ছিল পালরাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। কেবল মহাস্থান-গড় ও সোমপুরী বিহারই ছিল উত্তরবঙ্গের প্রান্তে—আজকের বাঙলার সীমায়। রাষ্ট্রকূট ও কলচুরীদের সঙ্গে তাঁদের ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক। এসব তাঁদের অবাঙালী চেতনার সাক্ষ্য দেয়। রামচরিত পালদের ক্ষত্রিয়, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প দাস বংশোদ্ভূত এবং আবুল ফজল কায়স্থ বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া পাল রাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই। অতএব পালেরা বহুকাল যাবৎ বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও তাঁরা একান্তভাবে বাঙলার ও বাঙালীর শাসক ছিলেন না। পাল শাসনকালের দৈর্ঘ্য ও পালদের বৌদ্ধত্বই বাঙলার

ইতিহাসে ও বাঙালীর ঐতিহ্যে পালদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। উত্তর ভারতে ও বিহারে পাল অধিকার যতই সঙ্কুচিত হয়েছে, পালরাজারা ততই বাঙালী হয়ে উঠেছেন এবং তখন থেকেই তাঁদের তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাঙলায় সুলভ হয়েছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ ও রাজচক্রবর্তী সম্রাট হচ্ছেন ধর্মপাল। খালিমপুর তাম্রশাসনসূত্রে মনে হয় গোটা উত্তর ভারত অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর বশীভূত হয়েছিল। বাদাল স্তম্ভলিপির প্রমাণে বলা চলে দেবপাল (আনু: ৮১০—৫০ খ্রী:) অন্তত কিছুকালের জন্যে কম্বোজ থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও পশ্চিম সাগর অবধি তাঁর শাসন বা প্রভাব ব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর পরের রাজারা—বিগ্রহপাল ওরফে শূরপাল—নারায়ণপাল—রাজ্যপাল—গোপাল (২য়)—বিগ্রহপাল (২য়) অবধি (আনু: ৮৫০—৯৮৮ খ্রী:) পালদের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের কাল। এই সময় পালরাজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। এমনকি দক্ষিণ এবং পূর্ববঙ্গও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হরিখেলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম) কান্তিদেব এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ (৮১৪—৮০ খ্রী:), ওড়িশার শুলকিরাজ রণস্তম্ভ, প্রতিহাররাজ ভোজদেব, কলচুরীরাজ গুণাম্বুধি দেব যশোবর্মণ প্রমুখ দক্ষিণে, উত্তরে, রাঢ়ে, গৌড়ে, পুণ্ড্রে ও সমতটে পাল রাজাংশ দখল করে নেন। কেউ কেউ রাজ্যপাল ও নয়পালকে কম্বোজীয় বঙ্গবিজেতা বলে মনে করেন। এই কম্বোজ কোচ কিংবা কম্বোজীয় বলে অনুমিত হয়। মনে হয় মগধ ও উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র অংশে পাল রাজ্য এই সময় সীমিত হয়ে পড়ে। আবার মহীপাল (৯৮৮—১০৩৮ খ্রী:) হৃতরাজ্য ও হৃতগৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন। এর পরে আরো শতোর্ধ্ব বছর ধরে নয়পাল—বিগ্রহপাল (৩য়)—মহীপাল (২য়)—শূরপাল (২য়)—রামপাল—কুমারপাল—গোপাল (৩য়)—মদনপাল ও গোবিন্দ রাজত্ব করেন। তাঁরা প্রায় সবাই হৃতসম্পদ ও হৃতগৌরব পালবংশের ম্লান প্রতীক।

দেবপালের পরেই পাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙতে থাকে। তখন থেকে সাধারণভাবে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে-বঙ্গে-সমতটে বিভিন্ন সামন্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চাভিলাষী রণবীরেরা ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রের কৈবর্ত ভীম-রুদ্রক-দিব্য, রাঢ়ের সেনেরা, সমতটের চন্দ্ররা, পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা এবং সমতটের চন্দ্রদের পরে দেবরা প্রধান। বরেন্দ্রের কৈবর্তরাজ ভীম রুদ্রক দিব্য ছাড়া অন্যেরা বাঙালী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই।

প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস মূলত তাম্রশাসন ও শিলালিপি-নির্ভর—কচিৎ কোন রাজ্য সম্পর্কে গ্রন্থাদিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রশস্তিমূলক উক্তি মেলে। রামচরিত-বল্লালচরিত ব্যতীত কোন চরিতগ্রন্থ মেলে না। তা ছাড়া রাজার নাম ও সন্ধি-বিগ্রহের উল্লেখমাত্র ইতিহাস নয়, এমনকি ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালও নয়—ঝাড়-বর্তিকার টুকরো কাঁচমাত্র। এইখানে জনজীবন অনুপস্থিত, রাজকীয় জীবনের সাক্ষ্যও আত্মপক্ষের কিংবা সেসব অনুগ্রহজীবীর তোয়াজের ভাষায় বর্ণিত।

তাছাড়া রাজা গুণী-জ্ঞানী-বিবেচক বা বলবীর্যবান হলেই প্রজার সুখ নিশ্চিত তেমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই। কিংবা রাজা দুর্জন দুরাচারী-অজ্ঞ-অসমর্থ-উদাসীন হলেই প্রজা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-পীড়নের শিকার হবে, তাও নয়। কেননা জনগণ থাকে স্থানীয় শাসক-প্রশাসকের অধীনে, তাদের চরিত্রের ও মানবিক দোষ-গুণের ওপর মুখ্যত নির্ভর করে প্রজার জীবন-জীবিকার সুযোগ ও আপদ-সম্পদ। সেসব ইতিবৃত্ত আমাদের অনায়ত্ত। তবু কথায় বলে 'বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস মেলে, শিশিরেও সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়' কিংবা 'ঘটেও আকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব'। আমরাও এ বিরল ও ধূসর অতীতের কোন কোন বিষয় প্রমাণে-অনুমানে অনুধাবন করতে পারি।

সেনেরা ছিলেন কর্ণাটদেশীয় কানাড়ী ক্ষত্রিয়। রাঢ়ে আগত সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন থেকেই এ বংশের শুরু। তাঁর পুত্র বিজয়সেন সম্ভবত প্রথম স্বাধীন রাজা (১০৯৭—১১৬০)। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনই (১১৬০—৭৮) সেনবংশের মধ্যমণি। ইনি আধুনিক ভাষিক বাঙলাদেশ ছাড়াও বিহার-ওড়িশার কতক অংশ স্বাধিকারে আনেন। লক্ষ্মণসেন (১১৭৮—১২০২ বা ০৬) সগৌরবে রাজত্ব করে বৃদ্ধবয়সে রাজ্য হারান। এর পরও পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় সামন্তরা কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপসেন (১২০৬—২০) এবং কেশবসেনের (১২২০—২৩ খ্রীঃ) নাম অনুশাসনসূত্রে মেলে।

সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁরা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই বাঙলাদেশে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি, বর্ণানুগ শ্রেণীবিন্যাস, পার্বণ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবিত্তের মানুষ তাঁদের হাতে পীড়িত হয়েছিল। এককালের নাথযোগী (তাঁতী), ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজযানী, মীন-নাথ-গোরক্ষনাথপন্থী বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে শূদ্ররূপে ব্রাহ্মণ্য

সমাজের প্রান্তে ঠাঁই করে নিয়ে আত্মরক্ষা করে। বৌদ্ধের নির্বাণ ও সাম্যের সমাজ এভাবে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিণতি পায়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বের ও লাঞ্ছিতের অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শূদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিম্নবিত্তের পেশাদারী শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার হরণ করা হয়। কৃত্রিম বর্ণবিন্যাসের ফলে উচ্চ-বিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন আভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কোন্দলও সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তাই ঘটকের রচিত কৃত্রিম বংশাবলী এবং জাতিমালা কাচারী আঠারো শতক অবধি সমাজক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে দেখতে পাই। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে (১৩ শতক) বাঙলায় ছিল ব্রাহ্মণ ও ছত্রিশবর্ণের শূদ্র এবং তাদের অধিকাংশ ছিল বর্ণসঙ্কর বা মিশ্ররক্তের।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ঐ মতের সমর্থন মেলে। জৈন-বৌদ্ধ সমাজে যখন জীব নির্বিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও জীবিকার স্বাধীনতা ছিল, তখন এই নব-বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকারই অপহৃত হল। নিম্নবর্ণের বৃত্তিধারী তন্তুবায়, কর্মকার, চর্মকার, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি দরিদ্রদের তথা এদেশের মানুষকে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনেরা অপরিক্রত অন্ত্য বলে অবজ্ঞা করতেন। তাই উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্ত থেকে আর্যব্রাহ্মণ এনে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। গুপ্ত আমলে শাসনকার্যে জনগণেরও প্রতিনিধিত্ব থাকত ; তখন ভুক্তি (প্রদেশ), বিষয় (পরগণা), মণ্ডল (জিলা), বীথি (মহকুমা) ও গ্রামে বিভক্ত ছিল প্রশাসনিক কাঠামো। প্রশাসকরা ছিলেন যথাক্রমে উপরিক, বিষয়পতি, মাণ্ডলিক, বীথিপতি ও গ্রামপতি। মহত্তর নাগরিকদের প্রতিনিধি ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী (ব্যাঙ্কার), প্রথম সার্থবাহ (বণিক), প্রথম কুলিক (শিল্পী) ও প্রথম কায়স্থ। কার্যালয়ের নাম ছিল অধিকরণ, অন্যান্য অফিসারের নাম—চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, দাশাপরাধিক, তরিট, পুস্তপাল, মহাক্ষপটলিক, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, মহাদণ্ডনায়ক, ধর্মাধিকার, মহাপ্রতিহার, দাণ্ডিক, দাণ্ড-পাশিক, দণ্ডশক্তি, কোষ্ঠপাল, প্রান্তপাল, অমাত্য, মহামাত্য, সেনাপতি, গূঢ়পুরুষ (গুপ্তচর), করম (সহকারী), অধ্যক্ষ, দূত, মন্ত্রপাল (মন্ত্রী), মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, যূথপতি প্রভৃতি। কিন্তু পাল-সেন আমলে শাসক-প্রশাসকরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এভাবেও দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বেকার গণ-অধিকার অপহৃত হয়।

মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল অবধি জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। সে বিষয় আমরা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণ্য পীড়নে বাঙলাদেশ থেকে জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। গণমানব যে দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল তাও আর্যাসপ্তশতী, সদুক্তি কর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল, চর্যাগীতি, সেক শুভোদয়া প্রভৃতি গ্রন্থসূত্রে পাই। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল অবধি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও আচারের বহুল প্রচার সত্ত্বেও দেশের মানুষের চারিত্রিক দৌর্বল্যজাত সর্বপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্গাপূজার সময়ে, হোলি প্রভৃতি পার্বণে, নৃত্য-গীতে ও আচরণে অশ্লীলতার নিদর্শন ছিল। তারও সাক্ষ্য মেলে লক্ষ্মণসেনের আমলের সাহিত্যে এবং অন্যান্য সূত্রে। দৈবনির্ভরতা ছাড়াও রাজশক্তির বীর্যহীনতা ও জনগণের আদিরসাসক্তি ছিল। জনগণের পার্বণ দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসবে কিংবা কামোৎসবে অথবা বাসন্তী হোলিতে বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা ছিল প্রকট। গুপ্তরা ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, জনগণ ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন জড়বাদের সংস্কারপুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ। তার ফলেই মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী বিকৃত-বৌদ্ধ মতই এখানে জনপ্রিয়তালাভ করে লোকধর্মে পরিণত হয়। ফলে গৃহস্থের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা পান বজ্রধর ও বজ্রতারা এবং অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ। করুণা ও মৈত্রীর সূত্র ধরে লোকনাথকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ ভক্তিবাদ দৃঢ়মূল হয়। বজ্রনাথ আদিনাথ শিবরূপে পরবর্তীকালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা-হিসেবে অভিন্নরূপ লাভ করেন—নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য তারই পরিণাম প্রসূন। আবার অন্যদিকে লোকনাথ ভক্তিবাদনির্ভর বিষ্ণুতে বিলীন হয়েছেন। যে সংস্কার রক্তের মতো মনমানসের পোষ্টা তা শাস্ত্র কিংবা শাসকের হুকুম-হুমকিতে বিলীন হয় না। ধর্ম ধমকে নিয়ন্ত্রিত হবার নয়। তাই জনগণের দেবতা চণ্ড-চণ্ডী শিব-শক্তিরূপে লৌকিকরূপ শেষাবধি রক্ষা করেছেন, বিষ্ণুও লৌকিক রাধার-কৃষ্ণ হয়ে গৃহস্থের আপন দেবতা হয়ে আছেন। বৌদ্ধ যুগের লৌকিক ধর্ম, বাসলী, ক্ষেত্রপাল, গণেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। অভিজাতরা যখন সংখ্যাগুরুর লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন নিজেদের রুচিমতো এসব দেবতার একটা তাৎপর্যময় মহত্তররূপ সমাজ-মানসে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের আর্যাভিমান বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়; পুরাণ

এ উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই সব দেবতারই দুইরূপ—লৌকিক ও পৌরাণিক। বৌদ্ধ দেবতা ও অপদেবতা—ধর্ম, তারা, মনসা, যক্ষ, লোকনাথ, আদিনাথ, বাসলী পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার আবরণে এভাবে টিকে থাকলেন। যদিও সুপরিকল্পিতভাবেই যেন বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল বাঙলাদেশ থেকে সেন আমলে। তবু বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহতত্ত্ব স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখল। নামান্তরে এবং কচিৎ রূপান্তরে লৌকিক বৌদ্ধ দেবতা ও সংস্কার চিরকালের জন্যে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। তুর্কী বিজয়ে স্বস্থ গণমানব তখন পূর্ণ উদ্যমে লৌকিক দেবতার মহিমা-মাহাত্ম্য গানে-গাথায়-পাঁচালীতে প্রচার শুরু করে। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ও লিখিত সাহিত্যের এভাবে আরম্ভ। কাজেই আমাদের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রাচীন অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রভিত্তিক দেবতা ও তত্ত্ব, জীবনচেতনা, জগৎভাবনা ও আচার-পার্বণ বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য আবরণে স্থানিক ও কালিক রূপান্তরে আজো বিদ্যমান। তাই বাঙলা সাহিত্য আলোচনায় বৌদ্ধ প্রভাব ও তার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সে-পথে পথিকৃৎ।

৩

১২০২ বা ১২০৪ অথবা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খালজী নদীয়া-লক্ষ্মণাবতী জয় করেন। পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এবং পূর্ববঙ্গ অনেককাল তুর্কী শাসনের বাইরে থেকে যায়। এই তুর্কী বিজয় ও শাসন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-কারদের অনেক অভিযোগ। তেরো-চৌদ্দ শতকে এবং পনেরো শতকের মাঝামাঝি কাল অবধি অর্থাৎ মাহমুদশাহী রাজত্বের পূর্বাবধি তুর্কীর নির্যাতনে বাঙালীরা নাকি এমনি ত্রাস ও শঙ্কার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে যে, পয়ার-ত্রিপদী রচনার মতো মানস-স্বস্তি তাদের সুদীর্ঘ আড়াইশ বছরের মধ্যে একবারও মেলে নি। অবশ্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ তথ্যের স্বীকৃতি নেই। সাহিত্যের ইতিহাসকার পরিবেশিত তত্ত্ব যে ইতিহাস-সমর্থিত নয় বরং তার বিপরীত, তা দেখাবার জন্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal Vol. II থেকে বাঙলার তুর্কী শাসকদের শাসন-সম্পর্কিত ঐতিহাসিকের মন্তব্য তুলে ধরছি।

ক. খালজী আমীরদের শাসনে (১২০২-২৭ খ্রীঃ)

১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০২—০৭) : ১২০২ কিংবা ১২০৬ সনে 'নুদিয়া' জয় করেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এদেশ জয় করেন। তাই শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই ইনি সামন্ততান্ত্রিক শাসন-সংস্থা গড়ে তোলেন। আর একদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গঠনমূলক কাজে যেমন যত্নবান হন, তেমনি শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। 'Malik Ikhtyaruddin Muhammad devoted the next two years (1203-05) to the peaceful administration of his newly founded kingdom. He followed the usual practice of Muslim conquerors by pulling down idol temples and building mosques on their ruins, endowing Madrasa or College of Muslim learning and evincing his zeal for religion by converting the infidels. But he was not bloodthirsty and took no delight in massacre or inflinching misery on his subjects (pp 8-9)...(He) was indeed the maker of the medieval history of Bengal—He was a born leader of men, brave to recklessness and generous to a fabulous extent.' (p. 12)

২. মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহম্মদ শিরান খালজী (১২০৭-৮) : এক বছরের মত রাজত্ব। 'Shiran was a man of extra ordinary courage, sagacity and benevolence.' (p. 15)

৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (১২০৮—১০ খ্রীঃ) : ইনি বিদ্রোহী আমীর আলি মর্দানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দক্ষ শাসক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (He) was the most level headed politician, steadfast in ambition, unfettered by any scruple or sentiment, possessed of the rare gift of making himself acceptable even to his prospective rivals and too clever to place all his cards on the table a minute too soon. (p. 18)

৪. মালিক আলি মর্দান (১২১০—১৩ খ্রীঃ) : এঁর ঘটনাবহুল জীবন। বিদ্রোহ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃসাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, উন্মত্ততা,

উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির সমবায়ে ইনি বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মানুষ।

হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর হাতে সমভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। (He) was a man of undoubted ability as a soldier, but impolitical, blood-thirsty and of a murderous disposition......Partly out of policy but mai ly actuated by a feeling of vengeance against his Khilji kinsmen who had cast him out, he made the Khilji nobles suffer terribly at his hands. (p. 19)

৫. মালিক হুসামুদ্দিন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (পুনঃ ১২১৩—২৭): অত্যন্ত জনপ্রিয় সুশাসক। তিনি নৌবহর সৃষ্টি করেন। সম্ভবত তার নৌসৈন্যেরা হিন্দু ছিল।

(Iwaz) proved one of the most popular Sultans that ever sat on the throne of Gour (p. 21)...Iwaz built more than one Juma Mosque, other Mosques and Madrasas also arose on all sides (p. 25)···the kingdom of Lakhnawati and Bihar enjoyed uninterrupted peace for about twelve years under the vigorous and beneficient rule of Sultan Ghyasuddin Khilji till the first expedition of Sultan Shamsuddin-Iltutmish against Bengal 1225 A. D. (p. 25)···Sultan Ghyasuddin's reign of about fourteen years was a prosperity for his kingdom (p. 17)···Sultan Ghyasuddin in his exterior and interior graces was every inch a Padishah, just, benevolent and wise. (p. 28) 'বৃহৎবঙ্গে'ও (পৃ ৬১২) এর উচ্ছ্বসিত তারিফ আছে। এখানেই খালজী আমীরদের শাসনের অবসান ঘটে। তারপরে শুরু হয় দিল্লী সুলতানের মামলুক (ক্রীতদাস) শাসন।

খ. মামলুক (গোলাম) শাসনে (১২২৭—৮২)

৬. শাহজাদা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (১২২৭—২৯): সম্রাট ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড়ের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বছর মাত্র 'অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা

করিয়াছেন।' (বৃহৎবঙ্গ পৃ ৬১৩)।

৭. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বল্খ খালজী (১২২৯—৩০) ওরফে দৌলত-শাহ্ বিন মওদুদ : নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট ইলতুৎমিসের সেনানীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

৮. মালিক আলাউদ্দীন জানি (১২৩১—৩২) : সম্রাট ইলতুৎমিস এঁকেই গৌড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সম্রাট স্বয়ং গৌড়ে আসেন এবং অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে মালিক সাইফুদ্দীন আইবককে সুবাদারী দেন।

৯. মালিক সাইফুদ্দীন আইবক (১২৩২—৩৫) : 'He possessed all the noble qualities of his race and rose to the front rank of the maliks of his age." (p. 45)

১০. মালিক ইজ্জুদিন তুঘরল তুঘান খান (১২৩৬—৪৫) : ইনি রাঢ় অঞ্চলও দখলে এনেছিলেন। ফলে, বিহার, বরেন্দ্র ও রাঢ়ের অধীশ্বর হয়ে ইনি যোগ্যতার সঙ্গে শাসনদণ্ড চালনা করেন। 'He was adorned with all sorts of humanity and sagacity and graced with virtues and qualities and in liberality, generosity and power of winning men's heart he had no equal.' (p. 46)

১১. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান (১২৪৫—৪৭) : ইনি তুঘরল তুঘান খানের হাত থেকে গৌড় জবরদখল করেন। এঁর আমলে ওড়িশার গঙ্গবংশীয় রাজা নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রের অনেকখানি দখল করে নেন। কিন্তু তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

১২. মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭—৫১) : ইনি আলাউদ্দীন জানির পুত্র। এঁর উপাধি ছিল মালিক-উস্-শরক্। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

১৩. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেক (১২৫২—৫৭) : ইনি তিনবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এই দিগ্বিজয়ী, সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা গৌড়, বিহার ও অযোধ্যা জয় করেন এবং কামরূপ অভিযানে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করেন।

'Rushness and imperiousness were implanted in his nature and constitution ; but he was a man of undoubted ability as

soldier and proved a successful ruler too.' (p. 51)

১৪. মালিক ইজ্জুদ্দিন বলবন উজবেকী (১২৫৭—৫৯) : জবরদখলকার। তাঁর উল্লেখ্য কোন কৃতি নেই।

১৫. মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯—৬৫) : যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু। ইজ্জুদ্দিন যখন 'বঙ্গ' অভিযানে ব্যস্ত তখন তিনি লখনৌতিতে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড ঘটান।

'He was an impetuous and warlike man and had attained the acuse of capacity and intrepidity.' (p. 55)

১৬. তাতার খান (১২৬৫—৬৮) : আরসালানের পুত্র।

'Tatarkhan was a very capable ruler, renowned for his bravery, liberality, heroism and honesty.' (p. 57)

১৭. শেরখান (১২৬৮—৭২) : উল্লেখ্য কৃতিহীন।

১৮. আমীন খান : উল্লেখ্য কৃতিহীন।

সহকারী সুবাদার তুঘরল খান (১২৭২—৮১)।

১৯. মুঘিসুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৭২—৮১) : অল্পদিন সুবাদার আমীন খানের সহকারীরূপে থেকে গৌড়ের শাসনক্ষমতা লাভ করেন। তুঘরলের হিন্দু পাইক (পদাতিক) সৈন্যবাহিনী ছিল (p. 61)। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন অসংখ্য পরিকর সহ তুঘরলকে হত্যা করেন। গৌড়ে সে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

'Tughral possessed all the characteristic virtues of Turk, indomitable will, reckless bravery, resourcefulness and boundless ambition.' (p. 58)—'His court at Lakhnawati rivalled that of Delhi in power and magnificence and he was more popular with his people and much better served by them than Sultan Balban who was more feared than loved by his subjects—He was profuse in liberality, so the people of the city (of Delhi) who had been there, and also the inhabitants of that place (Lakhnawati) became very friendly to him. The troops and citizens having shaken off all of the Balbani chastisement, joined Tughral

heart and soul.' (p. 60-61)

এবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামলুক শাসনকালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক:

'The History of this period is sickening record of internal dissensions, usurpations and murders.···Here in Bengal the political maxim gained ground that whosoever could kill or oust the reigning ruler should be acknowledged without demur as its legitimate master and Bengalees, whether, Turks or Hindus remained generally indifferent to the fate of their rulers and enunciated a constitutional principle of their own that the loyality of a subject was due to the masnad (throne) and not to the person who happened to occupy it. (p. 42)···Another notable feature of the history of this period was the beginning of a sort of rapprochement between the conquerors and their Hindu subjects. The exodus of upper class Hindus on a wide scale from the Muslim Territory gradually stopped and now for the first time we come across references to Hindus as a class of inhabitants in the Muslim Capital. The Muslim rulers had no internal trouble with regard to their Hindu subjects of Varendra even when the Hindus of Orissa threatened the capital with a siege. (p.43)

গ. বলবন বংশের শাসনে (১২৮২—১৩০১)

২০. নাসিরুদ্দীন বঘরা খান (১২৮২—৯১) : কর্মকুণ্ঠ, বিলাসপ্রিয় কিন্তু হৃদয়বান সজ্জন। 'He was wise in counsel, weak in action and unaggressive by temperament. Though there was nothing to admire him he was a lovable and genial personality strong in human virtues. He reigned rather than ruled the kingdom of Bengal, but he enjoyed throughout the esteem of his nobles and popularity with his subjects in the land of his adoption.' (p. 47)

২১. রুকনউদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১—১৩০১) : নাসিরুদ্দীনের পুত্র। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

এবার বলবনী শাসনের ফলশ্রুতি যাচাই করা যাক : "The Balbani regime in Bengal was not only a period of expansion but one of consolidation as well. It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active piety, energy and foresight began prosetylising on a wide scale not so much by force as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low class of Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression. —About of a century after the military and political conquest of Bengal, there began the process of the moral and spiritual conquest of the land through the efforts of the muslim religious fraternities that now arose in every corner. By destroying temples and monasteries the muslim warriors of earlier times had only appropriated their gold and silver—the saints of Islam completed the process of conquest —moral and spiritual by establishing Dargahs and khankhas deliberately on the sites of these ruined places of Hindu and Buddhist worship.' (p. 69)

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসনে (১৩০১—২২)

২২. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ (১৩০১—২২) : 'Shamsuddin Firoz was a ruler of exceptional ability.' (p. 82) 'He died full of years of glory and a fame.' (p. 82)

২৩ক. গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্—Rebellious son of Firoz Shah.

খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্

গ. বহরম খান ওরফে তাতার খান (১৩২২—২৮)।

এখন থেকে কয়েক বছরের জন্যে গৌড় রাজ্যকে তিন-অঞ্চলে ভাগ করে

তিনজন শাসকের অধীনে দেওয়া হয় এবং শাসকদের নিজেদের মধ্যে দখল-বেদখলের কোন্দলও চলতে থাকে।

২৪ক. কদর খান (১৩২৮) : লখ্‌নৌতি

খ. মালিক ইজ্জুদ্দিন এহিয়া (১৩২৮) : সাতগাঁও

গ. বহরম খান ১৩২৮—সোনারগাঁও (মৃত্যু ১৩৩৭)

২৫ক. ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্‌ (১৩৩৮—৫০) : সোনারগাঁও।

'The lot of Hindu population in Fakhruddin's time was not very enviable for 'they are muleted' says Ibn Batuta "of half of their crops and have to pay taxes over and above that".' (p. 102)

খ. আলী শাহ্‌ (১৩২৮—৪২) : লখ্‌নৌতি

গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌—লখ্‌নৌতি, সাতগাঁও (১৩৪২—৫৭) : সোনারগাঁও (১৩৫৩—৫৭)

ঘ. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ্‌ (১৩৫০—৫৩)—সোনারগাঁও। ইখতিয়ার উদ্দিন ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্‌'র পুত্র।

ঙ. ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২—১৪১৩)

২৬. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌-ই শেষ অবধি গোটা গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়ে ওঠেন এবং তিনি ১৩৫৩ সন থেকেই গৌড়রাজ্যের স্বাধীন সুলতান।

২৭. সিকান্দার শাহ্‌ (১৩৫৭—৮৯) : ইলিয়াস শাহ্‌'র পুত্র। 'During the long period of peace that followed Sultan Sikandar adorned his capital with many noble monuments of architecture.' (p. 112)

২৮. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্‌ (১৩৮৯—১৪০৯) : এঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক হয়ে আছে। ইনি সিকান্দার শাহ্‌'র পুত্র। বিদ্যাপতি এঁরই গুণকীর্তন করেছেন।

২৯. সাইফুদ্দীন হামজা শাহ্‌ (১৪০৯—১০) : উল্লেখ্য কৃতিহীন।

৩০. শামসুদ্দীন (১৪১০—১৩) : ইনি হামজা শাহ্‌'র পুত্র। এঁর আমল রাজা গণেশের প্রভাবের যুগ। এ সময় সম্ভবত রাজপরিবারে গৃহযুদ্ধ ঘটে।

চ. গণেশ ও তাঁর বংশধরদের আমলে (১৪১৪—৩২)

৩১. রাজা গণেশ (১৪১৪—১৮) : জবরদখলকার । এঁর নিন্দা-প্রশংসা দুই আছে । তবে সুদক্ষ শাসক ।

৩২. মহেন্দ্র দেব (১৪১৮) : রাজত্বকাল কয়েকমাস মাত্র । ইনি হিন্দু দলের দ্বারা মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন ।

৩৩. যদু বা জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮—৩১) : যেসব ব্রাহ্মণ তাঁর প্রায়শ্চিত্তে অংশগ্রহণ করেও তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে নারাজ ছিল, তাদের তিনি লাঞ্ছিত করেন । মোটামুটিভাবে সুশাসক । 'We can well believe that the province grew in wealth and population during his peaceful reign.' (p. 129)

৩৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২—৩৩) : ইনি জালালউদ্দীনের পুত্র । 'His reign was darkened by his crimes and follies, till the nobles finding it intolerable, got him murdered through his slaves Shadi khan and Nasir khan in 1333 A. D.' (p. 129)

ছ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী আমলে (১৪৩৩—৮৬)

৩৫. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৩—৫৯) :

'Chosen by thepeople the new sovereign, who styled himself Nasiruddin Abul Muzaffar Mahmud, was able to enjoy an undisturbed and prosperous reign. He is described as a just and liberal king by whose good administration' the people, both young and old were contended and the wounds of oppression inflicted by Ahmad Shah were healed···his main interests probably lay in the arts of palace. A large number of inscriptions found all over his kingdom recording the erection of Mosques, khankas, gates, bridges and tombs, testify not only to the prevailing prosperity but also to the enthusiasm for public works and interest in the building art, which he inspired. (p. 130)

৩৬. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯—৭৬) : 'Histories praise him as "a sagacious and law-abiding sovereign in whose kingdom the soldiers and citizens alike had contentment and security'. কৃত্তিবাস এঁর প্রতিপোষকতা পেয়েছিলেন।

৩৭. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪—৮১) : মালাধর বসু এঁরই প্রতিপোষকতায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন।

'Nizamuddin described him as vastly learned, virtuous and an able administrator. He evidenced a special interest in the administration of justice and interested on the strict and impartial application of the law—like Alauddin, he totally prohibited the drinking of wine and frequently assisted the judges in difficult cases.' (p. 136)

৩৮. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ্ (১৪৮১—৮৭)

'Fateh is stated to have been an intelligent and liberal ruler who maintained the usages of the past and in whose time the people enjoyed happiness and comfort.' (p. 137)

এবার এখানে ইলিয়াস শাহী রাজত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন উদ্ধৃত করছি :

'The dynasty deserved well of Bengal, for with remarkable consistency it produced a succession of able rulers. They were tolerant, enlightened administrators and great builders. In shaping the economic and intellectual life of the Bengali people for nearly a century and a half ; the Ilyas Shahi kings played the leading part. Tolerance was their greatest asset. To have ruled over a people of an alien faith for eight generations was in itself a great achievement, to be instated on the throne after twenty five years' exclusion by a local dynasty was an even greater one. It was a singular proof of their popularity —a popularity which rested on their past services.' (p. 137)

ছ. হাবসী গোলাম আমলে (১৪৮৭—৯৩)

৩৯. সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৭—৯২) : প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে প্রভুপত্নীর অনুরোধে বিশ্বস্ত হাবসী-গোলাম আমির আন্দিল 'সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ্' নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন।

'He is credited with having ruled justly and efficiently. His reputation as a soldier inspired respect and awe and his attachment to the Ilyas Shahi house made the people forget his race. His kindness and benevolence evoked warm praise from the historians'. (p. 139)

৪০. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (২য়) : (১৪৯০—৯১) : এক বছর কাল রাজত্ব করার পর সিদিবদরের হাতে নিহত হন।

৪১. শামসুদ্দীন মুজাফফর ওরফে সিদিবদর ওরফে দিওয়ানা (১৪৯১—৯৩) : রক্তপিপাসু নরদানব।

'His was a perfect reign of terror…Commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword fell equally heavily on the Hindu nobility and princes suspected on opposition to his sovereignty.' (p. 140)

জ. হোসেন শাহী আমলে (১৪৯৩—১৫৩৮)

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৯)।

হোসেন শাহী শাসন সম্বন্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নেই, বরং তারিফ আছে প্রচুর। কাজেই আমরা ইতিহাস আর ঘাঁটতে চাইনে।

আমরা বাঙলার ৩১৫ বছরের ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম। এ ধরনের শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্যার 'তাণ্ডবলীলা' প্রত্যক্ষ করেছেন, গোপাল হালদার দেখেছেন কেবল 'রক্ত আর আগুন', আর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতাই পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা কিংবা বলপ্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ারখালজী (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৫১৯) অবধি মোট বিয়াল্লিশ জন শাসক গড়ে সাত বছর করে গৌড়রাজ্য শাসন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ স্বাধীন, কেউবা দিল্লীর সম্রাটের সুবাদার। সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিধি-বদ্ধ শাসনতান্ত্রিক কানুনের অনুপস্থিতি, সিংহাসনের উত্তরাধিকারে 'দাবী' ও যোগ্যতা বিষয়ে ধর্মীয় কিংবা শাসনতান্ত্রিক বিধানের অভাব এবং অঞ্চল হিসেবে গৌড়ের প্রান্তিকতা গৌড় শাসকদের উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল হতে সহায়তা করেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিপুলতার কারণও এ-ই। তাই সুবাদার বদল হয়েছে ঘন ঘন। এতেই শাসক সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-যুগে সুলতানেরা সাধারণত আমৃত্যু রাজত্ব করেছেন।

এঁদের মধ্যে হিন্দু পীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন: ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০২—০৭) আলী মর্দান (১২১০—১৩), মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯—৬৫), সোনারগাঁয়ের ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ (১৩৫৩—৫৭), শামসুদ্দীন মুজাফফর ওরফে সিদিবদর (১৪৯১—৯৩)। এঁদের মোট রাজত্বকাল পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরই 'দুধে চোনা' কিংবা দুধে গরলের মতো গোটা তুর্কী আমলকে 'রক্ত ঝরানো ও আগুন জ্বালানো' শাসনরূপে পরিচিত করেছে। সে যুগে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণ নাকি এ-ই।

আমরা জানি, তুর্কী শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেননি, রাজ্য বিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান ১২৭২—৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না। আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজার প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে-নয় মাসেই পৌঁছত। সামন্তযুগে প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন কিছু ছিল না। এ সম্পর্কে মামলুক শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়। যুগান্তকর পলাশী

যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করেছিল ? শহরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এদেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, '৪৬, ও '৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রীঃ) বাঙলা বিজিত হল বটে ; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্তশক্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। জাহাঙ্গীর-শাহ্‌জাহানের বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য, কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না ; আবার আওরঙজীবের আমলে বাণিজ্যক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহ-যোগিতা যে ছিল না তা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৯) ওড়িশা বিজয়কালে শত্রুর আশ্রয়রূপে 'দেউল-দেহারা' ভেঙে বাঙলার হিন্দু মনেও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-শাসনে তাঁর দক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রজাহিতৈষণা এবং তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে শীঘ্রই লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রখ্যাত করে। তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন নুসরৎ শাহ্ কিংবা তাঁর পৌত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ এবং তাঁর পুত্র আবদুল বদর ওরফে গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্—প্রজাপীড়ক বলে এঁদের কারও নিন্দা ছিল না। হোসেন শাহ্‌র চট্টগ্রামস্থ লস্কর পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর প্রতিপোষক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র (১৫৩৮—৩৯) হুমায়ুন ও শের শাহ্‌র হাতে রাজ্য হারানোর সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলার স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান ঘটে। শের শাহ্, তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ ও অক্ষম বংশধরগণ ১৫৫৮ অবধি প্রায় বিশ বছর বাঙলাদেশ শাসন করেন। দিল্লী-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন এই-ভাবেই পুনরারম্ভ হয়। ১৫৫৮ থেকে ১৫৭৫ অবধি ওড়িশার সোলেমান কর্‌রানী ও তাঁর পুত্র দাউদ খান কর্‌রানী স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করেন। শের-শাহী কিংবা কর্‌রানী শাসন ছিল আফগানী বা পাঠান শাসন।

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আকবর বাঙলাদেশ জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই জয় সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বিয়াল্লিশ বছর লেগেছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬১৭ সন অবধি মুঘলদের সঙ্গে পাঠান শক্তি ও ভুঁইয়া নামের স্থানীয় সামন্তদের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যুদ্ধ করে করে ক্রমে ক্রমে ভুঁইয়াদের স্বতন্ত্রভাবে পরাজিত ও বশীভূত করে বাঙলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই দ্বন্দ্ব-কোন্দলের বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রকম অরাজকতাই চলেছিল। জনসাধারণ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীদের তথাকথিত দ্বৈত শাসনে। বিদ্রোহী ভুঁইয়ারা এবং মুঘল প্রশাসকরা উভয় পক্ষই রাজস্ব আদায় করত। অবস্থাটা ছিল এরূপ: দুই পক্ষই শাসন এবং শোষণের দাবীদার ছিল, কিন্তু পালন-পোষণের দায়িত্ব স্বীকার করত না। অবশেষে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের আমলে বাঙলাদেশ মুঘলের করতলগত হয়। কিন্তু তখন বাঙলাদেশ লুণ্ঠনের আরো এক ভাগীদার জুটে গেছে—হার্মাদদের উপকূলাঞ্চল লুণ্ঠন শুরু হয়ে গেছে। শাহজাহানের আমলে আরো এক পক্ষ প্রবল হয়ে উঠল। এভাবেই মুঘল শাসক-মঘ-হার্মাদ লুটেরা এবং য়ুরোপীয় বেনেরা বাঙলাদেশে অবাধে শোষণ, লুণ্ঠন ও ব্যবসা মাধ্যমে স্বাধীন সুলতানী যুগের বাঙলার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে নিল। আওরঙজীবের আমলেও বাঙালীর দুর্ভোগ-দুর্দশা ক্রমাবনতি লাভ করতে থাকে। এর মধ্যে শাহজাহানের বিদ্রোহকালে, মীর জুমলা-শায়েস্তা খাঁর আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযানকালে বাঙলাদেশকে বহন করতে হয় যুদ্ধের ব্যয়। দিল্লী সাত সমুদ্রের না হলেও তেরো নদীর ওপারে ত বটেই। তাই স্বাধীন সুলতানী আমল অবসানের (১৫৩৮) পর থেকে বাঙলাদেশ আর কখনো দেশের ধন দেশে রাখতে পারেনি। বস্তুত ১৯৭২-এর আগে বিগত চারশ তিরিশ বছর ধরে বাঙলাদেশ ছিল বিদেশী শোষিত।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙজীবের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব-কোন্দলের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—সেই দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের সুবাদারগণ প্রবল হয়ে ওঠে। অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবং অন্যেরাও প্রকৃতপক্ষে নামেমাত্র দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনভাবে নওয়াবী করতে থাকে। বাঙলায় মুর্শিদকুলি খাঁ এক রকম স্বাধীনভাবেই ১৭১২ থেকে ১৭২৭ সন অবধি প্রবল প্রতাপে 'সুবেহ বাঙ্গালা' শাসন করেন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে তিনি দেশব্যাপী যে মধ্যস্বত্বভোগী এজেন্ট নিয়োগ করেন, তারাই উত্তর-

কালে তালুকদার-তরফদার-জোতদার নামে প্রজাশোষক মধ্যস্বত্বভোগী নতুন শ্রেণীরূপে দেখা দেয়। এবং ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিদ্র ধরে জমির প্রকৃত মালিক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক শ্রেণী ভূমিদাসে পরিণত হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁর পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন ও দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ এবং তারপরে আলিবর্দী খাঁ বাঙলার মসনদে বসেন। কিন্তু ১৭২৭ থেকে ১৭৫৭ অবধি এই কালপরিসর ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল। সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর গিরিয়ার যুদ্ধ এবং মীরজাফরের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফলগত। আলিবর্দী ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান শাসক। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়-পরাজয়ে টিকে ছিলেন। মীরজাফর ছিলেন নির্বোধ ও ভীরু, তাই তাঁর পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। আর মীরকাসিম স্বাধীনতাকামী, সাহসী ও বুদ্ধিমান হলেও বিশ্বাসঘাতক এবং জমিদার ও মহাজন-পীড়ক হিসেবে সাধারণের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরও পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আমরা তুর্কী-মুঘল শাসকদের প্রায় নামসার কিন্তু ধারাবাহিক পরিচয় নেবার প্রয়াস পেলাম। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এই ধারা-বর্ণনার গুরুত্ব অতি সামান্য। আমাদের প্রয়োজন তিনটি তত্ত্বে—আর্থিক, ধার্মিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লোকজীবনে শাসক-প্রশাসকের নীতি-আদর্শের প্রভাব।

আর্থিক ক্ষেত্রে ১২০২-৬ থেকে ১৩৩৮ অবধি দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসন-শোষণ কিভাবে চলতো তার স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে প্রমাণে-অনুমানে বোঝা যায়, তখন ক্ষমতার লড়াই যত প্রবল ছিল শোষণের স্পৃহা তত তীব্র ছিল না। তাছাড়া তখনো দেশী সামন্তরাই প্রত্যক্ষভাবে প্রজা শাসন করতেন। কাজেই রাজস্ব দিল্লী পাঠানোর আগ্রহের চেয়ে সেই রাজস্বে যেন সৈন্যদল পোষণের প্রবণতাই ছিল তাঁদের বেশী। দুশ বছর ধরে বিদেশী সুলতানেরা (গণেশ ও হোসেন শাহ্ বংশীয়রা ছাড়া) একটানা স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করে। শাসকদের স্বদেশী মধ্য এশিয়ার কিছু লোক বড় চাকুরে হিসেবে কিছু ধন-রত্ন কখনো বিদেশে নিয়ে গেলেও রাজস্ব হিসেবে একটা কানাকড়িও এ দুশ বছর ধরে বাইরে যায়নি। কাজেই সেই যুগে নগণ্য সংখ্যক ধনী-মানী ছাড়া দেশের জনসাধারণের মোটা ভাত-কাপড়ের অনাড়ম্বর জীবনে দারিদ্র্য-

দুঃখ তেমন না থাকারই কথা। অবন্ত-খরা-বন্যা-ঝড়-মহামারী প্রভৃতি দারিদ্র্য-অনাহার-মৃত্যু প্রভৃতি বিপর্যয় এড়ানো সেকালে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুঘল আমলে মুঘলেরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসারে শাসন ও শোষণের অধিকারলাভ করেছিল, পালন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। তাছাড়া বাঙলাদেশে আদায়-কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়েই মুঘলেরা চট্টগ্রামে-আসামে ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করেছে। আবার শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ সুবাদারগণ দিল্লীতে বর্ধিত হারে রাজস্ব পাঠিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। তা ছাড়া শায়েস্তা খাঁ, আজিমুশ্শান, মুর্শিদকুলি খাঁ প্রমুখ বাঙলার অনেক সুবাদারই ব্যক্তিগতভাবে লবণ, সুপারী প্রভৃতি নানা দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা করেও বাঙলাদেশের সম্পদ চিরকালের জন্য অপহরণ করেন। শাসকেরা তো এভাবে লুণ্ঠন করেইছেন—তার ওপর মগ-হার্মাদদের ধন-জন লুণ্ঠন নদীতীরাঞ্চলে ও উপকূলাঞ্চলে আওরঙজীবের আমল পর্যন্ত এক রকম অব্যাহত ছিল। আবার মুঘল আমলে য়ুরোপীয় বেনেরা বিশেষ করে ইংরেজ-ফরাসীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বলতে গেলে সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের গোড়ার দিকে গোটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য তাদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। এইসব কারণে পনেরশ আটত্রিশে যে আর্থিক দুর্ভাগ্যের শুরু হয় সতেরশ সত্তর সনের মন্বন্তরে তা পূর্ণতালাভ করে। আঠারো শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই অবক্ষয়ের চিত্র সত্যপীর পাঁচালীতে ও ভারতচন্দ্রের রচনায় সুপ্রকট।

দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসনের আমলে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী শাসনে স্থানীয় শাসিত সমাজে নিশ্চয়ই বিচলন এসেছিল। পরবর্তীকালে রচিত শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মায় দেখতে পাই, নির্জিত বৌদ্ধেরা বিজয়ী তুর্কীদের মুক্তিদূতরূপে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সেন আমলে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিহার-চৈত্য প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বাঙলাদেশে যে কোনকালে বৌদ্ধ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল তা অনুমান করবার মতো কোন নিদর্শনাদি ছিল না। কিন্তু গায়ের ওপর জোর খাটে, মনের ওপর খাটে না। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার জনগণের ওপর ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতি-নীতি জোর-করে চাপিয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তারা পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারই লালন;

করত। তুর্কী বিজয়ের ফলে বিদেশী রাজশক্তির প্রশ্রয়ে সমাজপতির শাস্তির ভয়-মুক্ত হয়ে তারা তাদের লালিত পূর্ব বিশ্বাস-সংস্কার নতুন করে সগৌরবে ও অত্যুৎসাহে প্রকাশ করতে লাগল। তার ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ দেব-দেবী স্বনামে ও বেনামে যথা তারা, বাসুলী, যক্ষ, বিষ্ণু, আদিনাথ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি ঘট, পাথর ও মূর্তির মাধ্যমে পূজা পেতে থাকেন। আনুষঙ্গিকভাবে এঁদের মাহাত্ম্য-কথা আসরে-অনুষ্ঠানে গান-গাথা-পাঁচালী-কথকতার মাধ্যমে চালু হতে থাকে। উচ্চবিত্তের সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জনগণের এই লোকায়ত ধর্মের কাছে হার মানল। লোকধর্মই বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধর্মের ঠাঁই গ্রহণ করল। এবং স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষের দিকে ঐ-সব দেব-কথা বিপুল কলেবরে পাঁচালী-কাব্যে পরিণতি পায়। এভাবে ষোল-সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশী লৌকিক দেবতা বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ সময়েই বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর প্রভাবে দেশী মানুষের চেতনায় যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তারই প্রমূর্ত রূপ মেলে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে। জৈন-বৌদ্ধ সাম্য-করুণা-মৈত্রীর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দেশে ইসলামী সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনুকূল পরিবেশে। চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশীর ভাব সমন্বয়ের প্রসূন। দেশী নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে লৌকিক ইসলাম গড়ে তুলল। বিভাষায় রচিত বিদেশী ইসলামী শাস্ত্রে তাদের অনধিকার এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ও লালিত অনপনেয় বিশ্বাস-সংস্কার এই লৌকিক ইসলাম সৃজনে স্বাভাবিক প্রবর্তনা দিয়েছে। এই ইসলাম ছিল মূলত পীর বা গুরুবাদী ইসলাম। তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক পীরতত্ত্বে, অলৌকিক কেরামতিতে, বৌদ্ধ-স্তূপের আদলে পরিকল্পিত দরগাহ পূজায়, জলদেবতা খাজা খিজিরের প্রতি অবিচল আস্থায় ও মানৎ-সিন্নি-তাবিজ-কবচ ঝাড়-ফুঁকে এই ইসলাম ছিল সীমিত। আবার বাঙলাদেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী আফগান-মুঘলের করতলগত হল তখন আর্থিক জীবনের অবক্ষয় অবক্ষভাবীরূপেই শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করল। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক বিপর্যয় বা অবক্ষয় প্রশাসনিক ঔদাসীন্য বা পীড়নেরই ফল। দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষকের হাতে পড়ে, তখন আর্থিক জীবনে যে অবক্ষয় দেখা দেয়, আত্মপ্রত্যয়হীন নির্বোধ অসহায় মানুষ বাঁচবার তাগিদেই সে অবস্থায় অলৌকিক শক্তিরই আশ্রয় কামনা করে। বাঙলাদেশে

এই আর্থিক বিপর্যয়কালে—ষোল শতকের শেষ পাদ থেকে পীর-নারায়ণ-সত্য ও তাঁর চেলা পীর-উপদেবতাগণ নির্জিত বাঙালীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অবলম্বন দেবতা হিসেবে উদ্ভাবিত হলেন। এক্ষেত্রে নির্জিত মানুষ হিসেবে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর একই আদর্শে, উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে মিলন ঘটেছিল। গীতা-স্মৃতি ও মন্দিরে আস্থা হারিয়ে হিন্দুরা এবং মসজিদে আস্থা হারিয়ে মুসলমানেরা পীর-দেবতার অনুগ্রহে বাঁচবার প্রয়াসী হল। বাঙালীর সেই দুর্দিন-দুর্যোগ-দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে সত্যনারায়ণের পুঁথি, পীর-মাহাত্ম্য কথা ও উপদেবতা পাঁচালী। বাঙালীর শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকৃতি এইসব গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল অবধি শাসকরূপে যাঁদের নাম ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে ছকে তাঁদের 'পীঠিকা' দেয়া হল :

[বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে সনতারিখের পার্থক্য লক্ষণীয়।]

মৌর্যবংশ : আনুঃ ৩২৪—১৮৬ খ্রীঃ পূঃ

চন্দ্রগুপ্ত ; বিন্দুসার ; অশোক ; কুণাল (?) ; দশরথ ; সম্প্রতি ; বৃহদ্রথ।

গুপ্তবংশ : আনুঃ ৩২০—৬০০ খ্রীঃ

শ্রীগুপ্ত ; চন্দ্রগুপ্ত ; সমুদ্রগুপ্ত ; চন্দ্রগুপ্ত (২য়) ; কুমারগুপ্ত ; স্কন্দগুপ্ত ; দামোদর গুপ্ত ; কুমার গুপ্ত (২য়) ; মহাসেনগুপ্ত।

বাঙলার স্বাধীন সামন্ত (৬ষ্ঠ শতক)

১. গোপচন্দ্র : আনুঃ ৫০০—৩৩ খ্রীঃ
২. ধর্মাদিত্য : আনুঃ ৫৩৩—৩৬ খ্রীঃ
} কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত ৫ খানি, মল্লসারুলে প্রাপ্ত ১ খানি ও বিহার জয়রামপুরে প্রাপ্ত ১ খানি তাম্রশাসন সূত্রে লব্ধ তথ্যানুসারে।

৩. সমাচার দেব (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের রাজা আনুঃ ৫৩৬—৫০ খ্রীঃ)

৪. বন্য গুপ্ত (সমতট, রাজধানী—শ্রীপুর, ৫০৭ খ্রীঃ)

৫. সুধন্যাদিত্য

৬. পৃথুবীর

বাঙালী রাজা : শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) আনুঃ ৬০৫—৩৫ খ্রীঃ)

[গৌড়-মগধ-দণ্ডভুক্তি-উৎকল অধিপতি]

গৌড়

জাহৃয় বর্ধন (৬ষ্ঠ শতক)

জয়নাগ (৫৫০—৬৫০)

যশোবর্ধন (৭২৫—৩৫)

সামন্ত (কুমিল্লায়) সামন্ত রাজবংশ (৭ম শতক)

শ্রীজীবধারণরাত
|
শ্রীধারণরাত

ত্রিপুরার সামন্ত লোকনাথ
(৬৩৬—৪০ খ্রীঃ, তাম্রশাসন)

সমতট : আনুঃ ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ—আনুঃ ৬৫০—৭০০ খ্রীঃ

খড়্গোদ্যম
|
জাত খড়্গ
|
দেবখড়্গ
|
রাজরাজ ভট্ট (৭ম শতকের শেষের দিকের চীনা পরিব্রাজক সেঙ-চি কর্তৃক উল্লেখিত)

সমতটের দেববংশীয় রাজা : আনুঃ ৭৫০—৮০০ খ্রীঃ

১. শান্তি দেব
|
২. বীর দেব
|
৩. আনন্দ দেব
|
৪. ভব দেব
|
৫. কান্তি দেব

পালবংশ

সিংহাসনারোহণ/আনুমানিক রাজত্বকাল

১. গোপাল ৭৫৫—৭৮১

২. ধর্মপাল (বিরুদ বিক্রমশীল) ৭৮১—৮২১

৩. দেবপাল ৮২১—৮৬১

৪. বিগ্রহপাল ওরফে শূরপাল ৮৬১—৮৭৬

[ধর্মপালের ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র, জয়পালের পুত্র]

সিংহাসনারোহণ/আনুমানিক রাজত্বকাল

৫. নারায়ণপাল ৮৭৬—৯২০

৬. রাজ্যপাল [মগধ, বরেন্দ্র,
ত্রিপুরাধিপতি] ৯২০—৯৫২

৭. গোপাল (দ্বিতীয়) ৯৫২—৯৬৯
[মগধ, বরেন্দ্র, ত্রিপুরাধিপতি]

৮. বিগ্রহপাল (২য়) ৯৬৯—৯৯৫
[হৃতরাজ্য]

৯. মহীপাল [পাল রাজত্বের ৯৯৫—১০৪৩
নব প্রতিষ্ঠাতা]

১০. নয়পাল ১০৪৩—১০৫৮

১১. বিগ্রহপাল (৩য়) ১০৫৮—১০৭৫

১২. মহীপাল (২য়) ১০৭৫—১০৮০

১৩. শূরপাল (২য়) ১০৮০—১০৮২

১৪. রামপাল ১০৮২—১১২৪

১৫. কুমারপাল ১১২৪—১১২৯

১৬. গোপাল (৩য়) ১১২৯—১১৪৩

১৭. মদনপাল ১১৪৩—১১৬১

১৮. গোবিন্দপাল ১১৬২

বরেন্দ্র কৈবর্ত : আনুঃ ১১০০—২০ খ্রীঃ

(রাঢ়ে : ১১ শতকের শেষ ভাগ) ঈশ্বর ঘোষ, রাজধানী—ঢেক্করী

ক. দিব্য

খ. রুদ্রক

গ. ভীম

হরিকেল রাজা : আনুঃ ৮০১—৯০ খ্রীঃ (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম)

১. ভদ্র দত্ত
|
২. ধন দত্ত
|
৩. কান্তি দেব (৯ম শতকের ১ম পাদ, সম্ভবত ভবদেবের দৌহিত্র)

সমতটের চন্দ্র বংশ

আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবত মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে। সমতট অঞ্চলে হয় ঐ বিতাড়িত চন্দ্ররা কিংবা তাঁদের জ্ঞাতি সামন্তশাসক বংশীয়রা রাজত্ব করেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের রাজপরম্পরার 'পীঠিকা' দেওয়া হল :

চন্দ্রবংশ : ৮০০—১০৭০

রাজা/রাজত্বকাল

১. পূর্ণ চন্দ্র ৮০০—৮৪০ খ্রীঃ সামন্ত (?) রাজ
২. সুবর্ণ চন্দ্র ৮৪০—৯০০ ,,
৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র ৯০০—৯৩০ ,,
৪. শ্রীচন্দ্র ৯৩০—৯৭৫ ,,
৫. কল্যাণ চন্দ্র ৯৭৫—১০০০ ,,
৬. লড়হ চন্দ্র ১০০০—১০২০ ,,
৭. গোবিন্দ চন্দ্র ১০২০—১০৪৫ ,,
৮. ললিত চন্দ্র ১০৪৫—১০৭০ ,,

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজত্ব : ১০৮০—১১৫০ খ্রীঃ (?)

১. বজ্র বর্মণ
২. জাত বর্মণ
৩. হরি বর্মণ
৪. শ্যামল বর্মণ ১০৭৯ খ্রীঃ ?
৫. ভোজ বর্মণ

সেনবংশ : ১০৭০—১২০২ খ্রীঃ

১. সামন্তসেন
২. হেমন্তসেন ১০৭০—১০৯৭

৩. বিজয়সেন ১০৯৭—১১৬০

৪. বল্লালসেন ১১৬০—১১৭৮

৫. লক্ষ্মণসেন ১১৭৮—১২০২/৬

পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শাসক

৬. বিশ্বরূপসেন ১২০৬—১২২০, লক্ষ্মণসেনের পুত্র

৭. কেশবসেন ১২২০—২৩

৮. অন্যান্য রাজারা ১২২৩—৪৬

পূর্ববঙ্গের দেবৰংশ : আনুঃ ১১৬০—১২৯০ খ্রীঃ

১. পুরুষোত্তম দেব
|
২. মধুমথন সূদন দেব ১১৬০—১১৮০
|
৩. বাসুদেব ১১৮০—১২০৪
|
৪. রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব ১২০৪—১২৩০
|
৫. দামোদর দেব ১২৩০—১২৫৪
|
৬. অরিরাজ দনুজমাধব দশরথ দেব (১২৫৪—১২৯০, রাজধানী বিক্রমপুর)

শ্রীহট্টের দেববংশীয় রাজা ১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ

১. খরবাণ দেব
|
২. গোকুল দেব
|
৩. নারায়ণ দেব
|
৪. কেশব দেব
|
৫. ঈশান দেব

মধ্যযুগ : তুর্কী বিজয়

তুর্কী বিজয়ের ফলে দেশে যুগান্তর ঘটে, যেমন ঘটেছিল ব্রিটিশ বিজয়ের সময়। এর নাম মধ্যযুগ।

ক. খালজী শাসন : ১২০২—১২২৭ খ্রীঃ

১. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী ১২০২—০৬

২. মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খালজী ১২০৭—০৮

৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ
(দু'বার) ১২০৮—১০।১২১৩—২৭

৪. মালিক আলি মর্দান ১২১০—১৩

খ. মামলুক শাসন : ১২২৭—১২৮২ খ্রীঃ

১. শাহজাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ১২২৭—২৯

২. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলখ খালজী ১২২৯—৩০

৩. মালিক আলাউদ্দীন জানি ১২৩১—৩২

৪. মালিক সাইফুদ্দীন আইবক ১২৩২—৩৫

৫. মালিক ইজ্জুদ্দীন তুঘরল তুঘান খান ১২৩৬—৪৫

৬. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান ১২৪৫—৪৭

৭. মালিক জালাল উদ্দীন মাসুদ জানি ১২৪৭—৫১

৮. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেকী ১২৫২—৫৭

৯. মালিক ইজ্জুদীন বলবন উজবেকী ১২৫৭—৫৯

১০. মালিক তাজুদ্দীন আরসালান খান ১২৫৯—৬৫

১১. তাতার খান (আরসালানের পুত্র) ১২৬৫—৬৮

১২. শের খান ১২৬৮—৭২

১৩. আমীর খান ১২৭২—৭৩

১৪. মুঘিসউদ্দীন তুঘরল তুঘান খান ১২৭২—৮১

গ. বলবন বংশীয়ের শাসনে : ১২৮২—১৩০১ খ্রীঃ

১. নাসিরউদ্দীন বঘরা খান ১২৮২—১২৯১

২. রুকন উদ্দীন কায়কাউস ১২৯১—১৩০১

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসনে : ১৩০১—১৩২৮ খ্রীঃ

১. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ১৩০১—১৩২২

২. লাখনৌতি-সপ্তগ্রাম-সোনারগাঁও এই তিন ইক্তায় :

(ক) গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ্

(খ) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্

(গ) বাহরাম খান ওরফে তাতার খান ১৩২২—২৮

৩. (ক) কদর খান—লাখনৌতি ১৩২৮

(খ) মালিক ইজুদ্দীন এহিয়া—সাতগাঁও ১৩২৮

(গ) বাহ্‌রাম খান—সোনারগাঁও ১৩২৮

ঙ. স্বাধীন সুলতানী আমল

১. ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ্—সোনারগাঁও ১৩৩৮—৫০

২. আলাউদ্দীন আলী শাহ্—লাখনৌতি ১৩২৮—৪২

৩. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্—লাখনৌতি, সাতগাঁও ১৩৪২—৫৭

সোনারগাঁও ১৩৫৩—৫৭

৪. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ্—সোনারগাঁও ১৩৫০—৫৩

(ফকরউদ্দীনের পুত্র)

চ. ইলিয়াস শাহী বংশ : ১৩৪২—১৪১২ খ্রীঃ

১. লাখনৌতি-সাতগাঁওর ইজারাদার শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাঙলার ও বিহারের কিয়দংশের স্বাধীন সুলতান হন। ১৩৪২—৫৩/১৩৫৩—৫৭ খ্রীস্টাব্দ।

২. সিকন্দার শাহ্ ১৩৫৭—৮৯

৩. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ ১৩৮৯—১৪০৯

৪. সইফুদ্দীন হামজা শাহ্ ১৪০৯—১০

৫. শামসুদ্দীন ১৪১০—১২

ছ. বায়াজিদ শাহী বংশ : ১৪১২—১৪১৪ খ্রীঃ

১. শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ্ ১৪১২—১৪

২. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ১৪১৪

জ. গণেশ বংশীয় সুলতানগণ : ১৪১৫—১৪৩৩ খ্রীঃ

১. রাজা গণেশ ওরফে দনুজমর্দনদেব ১৪১৫, ১৪১৭—১৮

২. জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ বা যদু ১৪১৫—১৬, ১৪১৮—৩১

৩. মহেন্দ্র দেব (গণেশ পুত্র) ১৪১৮

৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ্ ১৪৩২—৩৩

ঝ. মাহমুদ শাহী বা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ : ১৪৩৩—৮৬ খ্রীঃ

১. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১ম) ১৪৩৩—৫৮

২. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ ১৪৫৯—৭৬

৩. শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ ১৪৭৬—৮০

৪. সিকান্দর শাহ ১৪৮০—৮১

৫. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (মাহমুদ শাহের অন্যপুত্র)—১৪৮১—৮৭

ঞ. সুলতান শাহজাদা ও হাবসী আমল : ১৪৮৮—৯৩ খ্রীঃ

১. বারবক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭

২. সইফউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪৮৮—৯০

৩. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়) ১৪৯০—৯১

৪. শামসুদ্দীন মুজাফ্‌ফর ওরফে দিওয়ানা ১৪৯১—৯৩

ট. হোসেনশাহী বংশ : ১৪৯৩—১৫৩৮ খ্রীঃ

১. সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩—১৫১৯

২. নাসির উদ্দীন নুসরৎ শাহ ১৫১৮—৩২

৩. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২—৩৩

৪. গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ ওরফে আবদুল বদর ১৫৩৩—৩৮

ঠ. সুর বংশ : ১৫৩৯—৫৯ খ্রীঃ

১. শের শাহ

২. ইসলাম শাহ

ড. কররানী বংশ : ১৫৫৯—৭৫ খ্রীঃ

১. সোলায়মান কররানী

২. দাউদ খান কররানী

ঢ. মুঘল আমল : ১৫৭৫—১৭৫৭ খ্রীঃ

১. আকবর ১৫৭৫—১৬০৫

সুবাদার

ক. মুনিম খান ১৫৭৪—৭৫

খ. হোসেন কুলি বেগ ১৫৭৫—৭৯

গ. মুজাফফর খান তুরবতী ১৫৭৯—৮২

ঘ. খানে আজম মির্জা আজিজ ১৫৮২—৮৩

ঙ. শাহবাজ খান ১৫৮৩—৮৪

চ. সাদিক খান ১৫৮৪—৮৬

ছ. ওয়াজির খান ১৫৮৬—৮৭

জ. সাঈদ খান ১৫৮৭—৯৪

ঝ. রাজা মানসিংহ ১৫৯৪—১৬০৬

২. জাহাঁগীর: ১৬০৫—২৭ খ্রীঃ

ক. কুতুবউদ্দান খান কোকা ১৬০৬—০৭

খ. জাহাঁগীর কুলি খান ১৬০৭—০৮

গ. ইসলাম খান ১৬০৮—১৩

ঘ. কাসিম খান চিস্তি (স্বল্পকালের জন্যে ১৬১৩—১৭
শেখ হুসাম)

ঙ. ইব্রাহিম খান ১৬১৭—২৪

চ. দারাব খান (শাহজাহান অধিকৃত ঢাকায়) ১৬২৪—২৫

ছ. মহব্বত খান ১৬২৫—২৬

জ. মুকররম খান (স্বল্পকালের জন্য আজাদ খান) ১৬২৬—২৭

৩. শাহজাহান : ১৬২৮—৫৮ খ্রীঃ

ক. ফিদাই খান ১৬২৭—২৮

খ. কাসিম খান জুঈনী ১৬২৮—৩২

গ. খানে আজম মীর মুহম্মদ বকর ১৬৩৩—৩৫

ঘ. ইসলাম খান মাশহাদী ১৬৩৫—৩৯

ঙ. (মুহম্মদ) শাহ শুজা ১৬৩৯—৬০
(স্বল্পকালের জন্য সইফ খান)

৪. আওরঙজীব : ১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ

ক. মুয়াজ্জম খান ওরফে মীর জুমলা ১৬৬০—৬৩

খ. শায়েস্তা খান ১৬৬৪—৭৮

গ. মুহম্মদ আজম (স্বল্পকালের জন্য ফিদাই খান) ১৬৭৮—৮৮

ঘ. খান-ই জাহান ১৬৮৮—৮৯

ঙ. ইব্রাহিম খান ১৬৮৯—৯৭

চ. আজিমউদ্দীন ওরফে আজিমুশশান ১৬৯৭—১৭০৭

৫. বাহাদুর শাহ (১ম) ১৭০৭—১২ খ্রীঃ

ক. আজিমুশশান ১৭০৭—১২

৬. জাহান্দর শাহ ১৭১২—১৩ খ্রীঃ

ক. খান-ই-জাহান ১৭১২—১৩

৭. ফখরুখ শিয়ার : ১৭১৩—১৯ খ্রীঃ

৮. রাফিদ্ দরাজ : ১৭১৯ খ্রীঃ

৯. রফিউদদৌলা : ১৭১৯ খ্রীঃ

ওরফে শাহজাহান (২য়)

ক. মীরজুমলা ১৭১৪—১৬

খ. মুরশিদ কুলি খান ১৭১৭—১৯

১০. মুহম্মদ শাহ : ১৭১৯—৪৮ খ্রীঃ

দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে এ সময় থেকে বাঙলার সুবাদারী পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয়। মসনদ দখল করে নওয়াবেরা সম্রাট থেকে নিয়োগ পত্র বা সনদ আদায় করতেন।

ক. মুরশিদ কুলি খান ১৭১৯—২৭

খ. শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান ১৭২৭—৩৯

গ. সরফরাজ খান ১৭৩৯—৪০

ঘ. আলিবর্দী খান ১৭৪০—৪৮

১১. আহমদ শাহ : ১৭৪৮—৫৪ খ্রীঃ

ক. আলিবর্দী খান ১৭৪৮—৫৪

১২. শাহ আলম (২য়) : ১৭৫৪—১৮০৬ খ্রীঃ

ক. আলিবর্দী খান ১৭৪৮—৫৬

খ. সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬—৫৭

গ. মীর জাফর আলি খান ১৭৫৭—৬০

ঘ. মীর কাসিম আলি খান ১৭৬০—৬৩

ঙ. মীর জাফর আলি খান (পুনঃ) ১৭৬৩—৬৫

চ. নাজিমুদ্দৌলা ১৭৬৫—৬৬

ছ. সইফুদ্দৌলা ১৭৬৬—৭০

ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী

ভারতবর্ষ বর্ণ-সঙ্কর জাতি অধ্যুষিত দেশ। গ্রীক, শক, হুন, কুষাণ, তুর্কী, মুঘল ও ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস তো ঐতিহাসিক ব্যাপার। তারও আগে যারা এদেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও আরো কত জাতি এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছে—সে খবর কারো জানা নেই সত্য, কিন্তু অনুমান করা যায়, এই জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল।

ইতিহাস বলছে, এদেশে যারাই যখন এসেছে কিছুকাল পরে তারা বীর্যহীন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের উপর আধিপত্য করেছে। এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়ারই প্রতিক্রিয়া।

আসল কথা, কোন জাতির চারিত্রিক বিকৃতি না ঘটলে তার পতন হয় না। এ বিকৃতির দরুন যখন সমাজে ধর্মে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ দেশের বেশীর ভাগ লোক নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে ; ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে ; মহৎ ও বৃহতের সাধনায় পরাঙ্মুখ হয়, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পুরাকালের কোন খবর ইতিহাস দিতে পারে না। কিন্তু মধ্যযুগের কোন কোন ব্যাপারে আমরা এ বিপর্যয়ের আভাস পাচ্ছি। মধ্যযুগে বিদেশী বহু দরবেশ ও প্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। তাঁদের অনুচররূপে আসে নানা মন ও মতের বহু লোক। এদেশের সমাজ ও শাসন সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকেরও অভাব ছিল না এদের মধ্যে। রাজনীতি-সচেতন স্বদেশপ্রাণ ও স্বজাতি-বৎসল কেউ কেউ হয়তো এদেশের দণ্ডশক্তির দৌর্বল্যের খবর দিয়ে স্বজাতি-স্বদেশীকে এদেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্তত আজকাল ঐতিহাসিকেরা তা-ই অনুমান করেন।

এ-অনুমানের সপক্ষে অন্তত কিছু তথ্যের আকস্মিক যোগাযোগও রয়েছে। হযরত খাজা মঈন-উদ্দীন চিশতির আগমনের পর মুসলমানদের দিল্লী রাজ্য দখল, গৌড়ে জালালউদ্দীন তাবরেজীর আগমনের পরে বঙ্গ বিজয়, বাবা আদমের আগমনে সোনারগাঁ জয়, শাহ্ জালাল ও বদর আল্লামাহর 'থানকা' করার পরে

যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম বিজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুমানের পরিপোষক। এভাবেই ইংরেজ-ফরাসী-পর্তুগীজের রাজ্যলাভ তো একরকম চোখে-দেখা সত্য। অবশ্য দরবেশ-প্রচারকদের ওপর এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেউ আরোপ করে না।

ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার কথাই বলি, য়ুরোপীয় বেনেরা এল বাণিজ্য করতে। এদেশের আদর্শচ্যুত নির্বোধ দণ্ডধরদের দুর্বলতা টের পেয়ে শুরু করল লুঠপাট আর জনগণের ওপর উৎপীড়ন। বাধা না পেয়ে বেড়ে গেল তাদের সাহস ও লোভ। আর বেনেবৃত্তি হল একসময়ে রাজ-শক্তিতে রূপান্তরিত। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পলাশী আর অর্ধভারতের ভাগ্যবিধাতা দুর্ধর্ষ মারাঠাগণ। কিন্তু তাদের সঙ্ঘ শক্তি ছিল না। তাই ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিল, সাত সাগরের ওপারের কুমীর এসে জুড়ে বসল। এমনি-ই হয়। আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমশীল জিগীষু মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এদেশে ক্ষাত্রধর্মের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই 'শক হূন দল পাঠান মুঘল' শক্তি একই পথে লোপ পেল।

২

এজন্যেই ভারতবর্ষ সঙ্কর জাতির দেশ। বাঙলাদেশের পক্ষে এ কথা আরো খাটি। আদি কাল থেকে এদেশে নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়া, রাঢ়া প্রভৃতি যে গোত্রবাচক শব্দ, তা বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। এগারো বারো শতকের সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এদের বহুবচনের রূপ পাওয়া যাচ্ছে—গৌড়াঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ প্রভৃতি। এতে বোঝা যায়, এক এক গোষ্ঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল বাসিন্দাদেরই গোত্রীয় নামে পরিচিত হত।

অষ্ট্রিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গ-গৌড় রাজ্য গড়ে ওঠে। চর্যাপদে 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও (আঃ ৫ম শতক) 'বঙ্গ' শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী' বা 'অদঅ বঙ্গাল দেশ লোড়িউ' আর সর্বানন্দের 'অমর কোষে' (১১৫৯ খ্রীঃ) 'বঙ্গাল বচ্চার' শব্দ

পাচ্ছি। নিত্যাহ্নিকতিলকে (লিপিকাল ১৬৯৫ খ্রীঃ) 'বঙ্গিদেশ' ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলেই কেবল গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চল 'সুবা-ই-বঙ্গাল' নামে আখ্যাত হয়। ফলে কয়েক শ' বছরের অব্যবহারে অন্য নামগুলো অপরিচিত হ'য়ে উঠল, আর 'বঙ্গ' নামটি গোটা সুবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কাজেই 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতা চর্যাপদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের প্রাচীনতার ও প্রামাণিকতার ওপর নির্ভর করে।

কোল, ভীল, ওরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, দ্রাবিড়, চাকমা, নাগা, কুকী, আর্য, শক, হুন, তুর্কী, মুঘল, আরব, ইরানী, হাবসী প্রভৃতি দুনিয়ার নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির সমবায়ে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালী জাতির মধ্যে তাই বিচিত্র আচার-সংস্কার, মননধারা, চারিত্রিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও রুচি-সংস্কৃতির আভাস আজো দুর্লভ নয়। দেহাকৃতিগত বৈচিত্র্যও কি কম!

৩

আমাদের দেশে 'আর্য' ছাড়া আর সব গোত্রীয় মানুষই 'অনার্য'—এই সাধারণ নামে পরিচিত। সংস্কারবশত আমরা 'অনার্য' বলতে অসভ্যই বুঝে থাকি, যেন অনার্য 'অসভ্য'-এর প্রতিশব্দ। দেশের পুরোনো ইতিহাসের যেসব উপাদান পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সবগুলোই আর্য ভাষায় ও আর্য প্রভাবে লিখিত বা উক্ত। তাই ঋগ্বেদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনার্যদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক। অনার্যেরা বিজেতার গৌরব-গর্বী আর্যদের কাছে মানুষ নামের যোগ্যও ছিল না। এজন্যই বিভিন্ন গোত্রের অনার্যেরা আর্য সমাজে দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য, প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আদিতে এগুলো ছিল 'টোটেম' নাম। কিন্তু আর্যেরা ব্যবহার করেছে অবজ্ঞার্থে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, রাক্ষসকুলে রাবণ, নাগকুলে বাসুকী-জরৎকারু, যক্ষকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনী আমরা পাচ্ছি। মহাভারত ও পুরাণাদিতে অনার্যদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। অথচ এ যুগে আমরা জানতে পারছি কোন কোন অনার্য গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়েরা আর্যদের চেয়েও সভ্য ও উন্নত ছিল। তার প্রমাণ—কেবল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও কোটদিজির আবিষ্ক্রিয়ায় নয়—আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তরকালের আর্য শাস্ত্র

গ্রন্থগুলো যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে শুধু যে অনার্য দেবদেবীরাই ভীড় জমিয়েছে তা নয়—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্যদর্শনও গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবে অনার্য-প্রভাব প্রসূত।

মহাভারতে বর্ণিত 'ময়' দানবের কৌরবের সভা সাজানোর কাহিনীটি অনার্যশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। ভক্তিবাদের উদ্গাতা শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ও ব্যাসদেব অনার্য রক্তসম্ভূত। 'নবঘনশ্যাম' কৃষ্ণ আর 'নব দূর্বাদল শ্যাম' রামও হয়তো অনার্যের রক্তে ঋণী। নারীদেবতা এবং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা একান্তভাবেই অনার্য। দেবকী, বাসুদেব, শিব, উমা প্রভৃতি অনার্য নাম। আর্য দেবতা প্রকৃতির প্রতীক। কিন্তু অনার্য দেবতা গুণ ও ভাবকল্পের প্রতিমূর্তি। এভাবে আমরা নানা সূত্রে আর্যদের ওপর অনার্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। প্রতিমাপূজা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও নারীদেবতার পূজা, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, মন্দিরোপাসনা, যোগ, তন্ত্র ও সাংখ্যদর্শন, ধ্যান, সন্ন্যাস এবং ভূত, যক্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পূজা অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতিরই প্রসূন। উপনিষদ যদি বিদেহ (বিহার) অঞ্চলের হয়, তাহলে তাও অনার্য অবদান। আর বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম তো অনার্য-মনন প্রসূত বটেই।

আর্যরা বিজয়ী হিসেবেই বিদেশ থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়। আমরা অনুমান করতে পারি আর্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের উচ্চবিত্তের ও আভিজাত্যের লোকগুলো আর্য সমাজে মিশে গিয়েছিল। নইলে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা উচ্চবর্ণের আর্যশ্রেণীভুক্ত হল কি করে? আর্যদের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত 'আর্যাবর্তে' পরিণত হল। ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে সাবেক দ্রাবিড় আজো রয়ে গেছে। এদিকে মগধ পেরিয়ে বহুকাল অবধি আর্যেরা আধুনিক বাঙলাদেশের খবর নেয়নি। এই 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ সম্বন্ধে আর্যদের যেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল, তেমনি এর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ধারণাও তারা পোষণ করত। এভাবে কতকাল কেটেছে জানা যায় না, তবে গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চলে যে বর্বর-প্রায় গোত্রগুলোর বসতি ছিল, তার আভাসও জৈন আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

৪

অনেককাল অবধি আর্য-অনার্যের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই চলেছিল, বৈদিক-পৌরাণিক ইন্দ্র-কথা থেকে এও অনুমান করা কষ্টকর নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অনার্য রাক্ষস, নাগ, দৈত্য প্রভৃতি গোত্রশক্তিকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রণে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে চিরদাসে পরিণত করতে বা এদের উচ্চবিত্তের লোকগুলোকে আর্যসমাজভুক্ত করে নিতে আর্যদের সময় লেগেছিল অনেক। যারা বশ্যতা স্বীকার করেনি, তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে কিংবা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। যেসব বিত্তহীন অজ্ঞ মানুষ আর্যসমাজে দাসরূপে ঠাঁই পেল, তারা কিরূপ উৎপীড়িত হত ও অবজ্ঞা পেত, তার চিত্র মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্রাহ্মণ্য সংহিতার পাঁতিগুলো থেকে পাওয়া যায়। আর্যেরা সম্ভবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি করে এক সময় যখন বিজেতা-বিজিতের স্মৃতি গণমন থেকে মুছে গেল অথচ বেশীর ভাগ অনার্য সমাজে হীনবর্ণরূপে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তখন জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথামত ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজ বিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। গৌতম-পূর্ব বহু বোধিসত্ত্বের এবং জৈনদের মহাবীর-পূর্ব তেইশ জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধে উঠছিল, সাফল্য আসে তথা পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় মহাবীর ও গৌতমের নেতৃত্বে। এই দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী বিপ্লবীদ্বয়ের অনুশাসন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্য সমাজদেহ কিরূপ বিষাক্ত করে তুলেছিল। তাঁরা দুজনেই প্রচলিত ধর্ম দর্শন তথা সমাজ ব্যবস্থা অস্বীকার করলেন। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড, বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য—এক কথায় তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সব-কিছুরই বিলোপ সাধনে ব্রতী হলেন। মানুষের দুঃখ ঘোচাতে গিয়ে, মানুষের প্রাণ ও আত্মার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়ে তাঁরা সর্বজীবের জীবনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রচারে এগিয়ে এলেন। এতবড় কথা এর আগে আর কোথাও কেউ বলেননি। সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীবাহক মানবতার এই মহাসাধকগণ সেদিন কোটি কোটি নিপীড়িত নরনারীকে [দেবী পূজার যুগেও আর্যসমাজে নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না, শূদ্রের চেয়ে নারীর মর্যাদা বেশী ছিল না।] সম্প্রদায়বিশেষের খামখেয়ালী অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়ে-

ছিলেন। আর্য-অনার্যের বিভেদ উঠে গেল, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ঘুচে গেল। সাধারণের 'বুলি' অভিজাত ভাষার আসনও কেড়ে নিল। নিম্নবর্ণের নরনারী নতুন ধর্মচ্ছায়ায় ও সমাজাশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। [উচ্চবর্ণের খুব কম লোকই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করেছিল।]

এই বিদ্রোহ বিপ্লবের লক্ষণটা আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার : দেবতার নাম করে বামুনেরা শোষণ ও পেষণ করত। গৌতম দেবপূজা অস্বীকার করলেন—আত্মা-নরক-পিণ্ড প্রভৃতির ব্যাপারে নিরীহ লোকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে পীড়ন করা হয়। তাই বুদ্ধ বললেন—সব মিথ্যে। বর্ণাশ্রম-দুষ্ট সমাজে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখা দিল। তাই প্রচারিত হল সাম্যবাদ। দেব ও দ্বিজের দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে উঠল—তাই দেব-দ্বিজ পূজা অস্বীকৃত হল। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অধিকার ছিল না—তাই গণভাষা পালি ও প্রাকৃত মর্যাদা পেল। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদকে অনার্য অভ্যুত্থান বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে। গৌতম জন্মেছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুতে। তিব্বতী ভোটচীনা লিচ্ছবীরা ছিল তাঁর মাতৃকুল। মহাবীরও ছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত তথা আর্যাবর্ত বহির্ভূত অঞ্চল দক্ষিণ বিহার সম্ভূত।

যে-দেবতাকে নিজের সুখ-দুঃখের কথা নিজ মুখে নিবেদন করা চলে না, যে-ধর্মের ক্রিয়া-কাণ্ড নিজের আচরণসাধ্য নয়, যে-ধর্মের বাণী নিজ মুখে উচ্চারণ ও নিজ কর্ণে শ্রবণ সম্ভব নয়, তার সঙ্গে কারো আত্মিক যোগ থাকার কথা নয়। এ-কারণে লোকেরও কোন অন্ধসংস্কারের বন্ধন ছিল না। তাই ভারতময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সহজেই প্রচারিত হতে পেরেছিল।

আর্য-অনার্যের বিভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ অবিশেষের কাছে বুদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পক্ষে কোন বাধা রইল না। এ সময়েই প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মগধের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়ে পুণ্ড্রে তথা আধুনিক বাঙলাদেশে নবধর্ম প্রচারের জন্যে উপস্থিত হলেন। এদেশের বর্বর-প্রায় জনগণের মধ্যে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির আবরণে এই দ্রোহী-ধর্ম অর্থাৎ জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হল। এদের লিপি ছিল না, সাহিত্যের শালীন ভাষা ছিল না, উঁচু মানের সংস্কৃতি ছিল না, তাই আর্যধর্মের (নামত অবশ্য) সঙ্গে আর্যভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হল। এভাবে বাঙলা-দেশে অল্পকালের মধ্যে আর্যধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করল এবং এই

সঙ্গে কিছু সংখ্যক তথাকথিত আর্যও এদেশে প্রচার উপলক্ষে বসবাস করতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করতে বাধা নেই।

৫

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনকে আমরা অনার্য অভ্যুত্থানও যে বলতে পারি, তার পক্ষে কিছু তথ্য আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণে দস্যু সর্দারের রাজ্যলাভ এবং নাপিতপুত্ররূপে ঘৃণিত নৃপতির কথা আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'শূদ্রগণ অনার্য বংশসম্ভূত ......শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন—মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয় করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া 'একরাট' পদবী লাভ করিতে পারেন নাই।'

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে যদি ত্রুটিও থাকে, তবু আমরা বলতে পারি, মহানন্দ, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোক—এ তিনজনের যে-কোন একজনের নেতৃত্বে অনার্য অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। রাজবংশী প্রভৃতি কৈবর্ত শূদ্রগণও এক সময় আর্য শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহিতা এতই তীব্র ছিল যে, নির্বাণকালে তিনি নাকি সংস্কৃত-চর্চা করতে নিষেধ করে যান। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের দস্যুবৃত্তির ও যুদ্ধের এবং মহাভারতে আর্য-অনার্যের যুদ্ধ-বিগ্রহের বহু কাহিনী আছে। বাসুকীর বিদ্রোহ, বৃত্রের দেবতা তাড়ন, রাবণের সীতাহরণ, প্রহ্লাদের আর্যধর্ম গ্রহণ, রামের হরধনু ভঙ্গকরণ, রামের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণলাভ, অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা প্রভৃতি আর্য-অনার্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ এবং মিলনের কাহিনী। ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম অনার্যার গর্ভে। আর্যেরা যে অনার্য সুন্দরীদের ধর্ষণ করত, এগুলো তারও নজির।

৬

মনে করা যাক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে বাঙলাদেশে আর্য-

প্রভাব পড়েনি। কিন্তু দেশে মানুষ ছিল, অথচ তাদের ভাষা ছিল না, সুখ-দুঃখের গান বা গাথা ছিল না, ছড়া ছিল না ,'বচন' ছিল না, কিংবা ধর্ম-সম্রান্ত সংস্কার ছিল না—এমন হতেই পারে না। কাজেই মেনে নিতে হয় যে, আর্য-পূর্ব যুগে এদেশে কোন একটি সর্বজনীন ভাষা কিংবা গোত্রীয় ভাষাগুলো চালু ছিল। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করে নিয়ে তারা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে উন্নত আর্যভাষা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ও বস্তুর নির্দেশক কিছু কিছু শব্দ ও বাগ্‌বিধি আর্যভাষার (সম্ভবত মাগধী প্রাকৃত) সঙ্গে মিশে গেল। কোন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিণত থাকলে সেগুলোকে উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে পড়ে অপমৃত্যু বরণ করতে হয়। সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন অবস্থায় এ বিপদ এড়ানো যায় না। বাঙলা সেদিন এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কোন ভাষা সেকালে কোন ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার বিকাশ দ্রুততর হত—একালে যেমন হয় রাষ্ট্রভাষা কিংবা কোন মতবাদের বাহন হলে। এর প্রসারও হত, কারণ কোন ভাষা কোন ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার প্রভাব এড়ানো সে-ধর্মে দীক্ষিত জাতির পক্ষে অসম্ভব। এবং যে-কোন ভাষার প্রসার নতুন ভাব, চিন্তা ও নতুন বস্তুভিত্তিক। জৈন ধর্ম নয়—বৌদ্ধ মতবাদই বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা আত্মরক্ষা কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এজন্যেই আজো কোল, ভীল, মুণ্ডা, কুকী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি নিজেদের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, দেখতে পাই। এসব ভাষাকেই সম্ভবত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' (৮ম শতক) 'অসুরভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে : 'অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা।' কিংবা ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়াংসি'র বুলি বলে নিন্দিত হয়েছে।

৭

ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতির উপায়রূপে জনগণ বৌদ্ধ ও জৈন মত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলেও প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় ধর্মে নানা বিকৃতি দেখা দিল। কারণ, এ দুটো ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন জৈব ধর্মের এতই প্রতিকূল যে তা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণসাধ্য নয়। সাধারণভাবে, মানুষের জীবনে সাধনা হচ্ছে ধন-জন-মানের সাধনা। অন্তরের অভাব ও অতৃপ্তিবোধই

আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মপ্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়, ভোগেচ্ছাবিহীন জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল কথা—বৈরাগ্য—তৃষ্ণাবিহীন জীবনসাধনা—অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে পঙ্গু ও অথর্ব করে তোলা। তাই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও বৌদ্ধদের নৈতিক-চারিত্রিক দৌর্বল্যের সুযোগে শঙ্করাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য শক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষে দেদার হত্যাকাণ্ড, বহু অত্যাচার ও নানা উৎপীড়ন যে হয়েছিল, তার প্রমাণ সে যুগের পুঁথিপত্রে নানা সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'শঙ্কর বিজয়ে' আছে : দুষ্টমতাবলম্বিনঃ জৈনান অসংখ্যাতান অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত্যতেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণেচূর্ণীকৃত চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসম আচরণ নির্ভয়ো বর্ততে। [অর্থাৎ : অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজ্যমুখ্যদিগকে অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে, অনেক উদুখলে নিক্ষেপ করে, মুষল দ্বারা চূর্ণ করে, এইরূপ দুষ্টমত ধ্বংস আচরণ করে তিনি নির্ভয়ে থাকতেন।] এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধগণ নির্মূল হয়ে গেল। তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিও বৌদ্ধদ্বেষী নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক হয়তো বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছিল।

বাঙলাদেশের কথায় আসা যাক। বাঙালীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল সত্য, কিন্তু ধর্মের অনুশাসনের সাথে জনগণের আন্তর যোগ ছিল না, তাই নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য বৌদ্ধ চৈত্যগুলো ক্রমে বহু দেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি নানা মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কারণ সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে স্বস্তি ও প্রবোধ পাবার জন্যে একটি মহাশক্তিকে অবলম্বন স্বরূপ পাওয়া চাই। নইলে ভরসা কি? বাঙলার পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম নামত টিকে ছিল। সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের প্রতিকূলতায় বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হল। বাঙলাদেশে কোনকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তা অনুমান করবার সামান্য উপাদান পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। এতেই বোঝা যায়, কি অসামান্য উগ্রতা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মধ্বজীগণ বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গেও জনসাধারণের

বিশ্বাস ও সংস্কারের যোগ নিবিড় ছিল না। রাজধর্ম বলে সেনবংশীয় শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুসৃত হলেও, আসলে, ধর্মগ্রন্থ, মন্দির, দেবতা প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক ব্রাহ্মণের মারফত হত বলে, তা কখনও অকৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (সেন রাজবংশের পতনযুগেই এর সূচনা) রাজরোষের ভয়মুক্ত জনসাধারণ স্ব স্ব বিশ্বাস-সংস্কার দিয়ে নিজেদের ইষ্টদেবতা পুনঃসৃষ্টি করল। এটাই বাঙলাদেশে ও সাহিত্যে লৌকিক ধর্মান্দোলন। মনসা, চণ্ডী, ওলা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, নাথপন্থ প্রভৃতি দেবতার ও মতের সৃষ্টি হল এবং পূজার প্রসার ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকল। এগুলো মূলত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনার্য ধর্ম। অবশ্য এতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রচুর। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রামায়ণ অথবা মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে। গভীর তাৎপর্যে, লোকায়ত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাহ্মণ্যবাদ লৌকিক দেবতা ও লোকায়ত মত স্বীকার করে স্মৃতি-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে আপোসে সহাবস্থানের সুযোগ করে নিয়েছিল।

এসব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এক কালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী ? গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে ? যে উপায়ে হোক। তারপর যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তাই নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।' রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য একটু কঠোর। আসলে সমাজে যে স্তরের লোক দ্বারা এসব লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচিসংস্কৃতি কোন কালেই উঁচু ছিল না। যে পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে মানুষের মন ও মননের বিকাশ ও প্রসার হয়, তা চিরকাল এদের কাছে রুদ্ধ ছিল, তাই এদের অপরিণত মন-বুদ্ধি-বোধিরই নগ্নরূপ ধরা দিয়েছে দেবতার কায়িক শক্তি ও ঐশ্বর্য পরিকল্পনায়।

খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকে অর্থাৎ পাল রাজত্বের শেষের দিকে রচিত

সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এসব লৌকিক দেবতার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' আশুতোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ) যা বলেছেন তা অনেকটা সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, সেন রাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এত কালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যতঃ না হউক গৌণতঃ হইলেও এই সমাজদেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়েরই সংঘাতমুহূর্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।···তাহারা (বাঙালী হিন্দুগণ) নূতনকে (ব্রাহ্মণ্যধর্মকে) যেভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল ; এই দেশীয় প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গল কাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়।··· তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।'

৮

'বৈদিক মতাবলম্বী ও স্মার্তনীতিতে বিশ্বাসী সেনবংশ বাংলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন,তাহার সহিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের কিছু মাত্র যোগ ছিল না—তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সুড়ঙ্গপথে গতায়াত করিতেছিল।' (অসিত বন্দ্যো : বাঃ সাঃ ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭)। অতএব সেন আমলে ধর্মের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লঘু-গুরুভাবে চলছিল। তাছাড়া লক্ষ্মণসেনের আমলে বাঙালীর নৈতিক দৌর্বল্য, চারিত্রিক বিকৃতি ও সামাজিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', শূন্যপুরাণ বা ধর্মপূজাবিধানের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতিতে এর আভাস আছে। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা সন্ধান করা

বাহুলতা মাত্র—কারণ এতে তা নেই। বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়নের রেশ তখনো ছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতেও শিথিলতা এসেছিল। মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধিদৈবিক শক্তির ওপর একান্ত নির্ভরতা এ যুগের প্রাসাদ ও কুটিরবাসীর চিত্তদৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সেন আমলের রণনীতির একটু নমুনা :

'তুকতাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রুসৈন্য যদি চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অং হুং হালিয়া হে মহেলি বিহঙ্গহি সাহিনেহি

মশানেহি থাহি লুকহি কিলি কিলি কালি হুং ফট স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বতোদয় মন্ত্রজপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্য বিজয়ঃ"। (ডক্টর সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী)।

দেশের দণ্ডশক্তির যখন এমনি অবস্থা, তখন মুসলিমশক্তি দেশ দখল ব্যাপারে বিশেষ বাধা পেয়েছিল বলে মনে হয় না। কাজেই 'ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার কারণ ঘটেনি। বরং ডক্টর সুকুমার সেনের অপর একটি উক্তি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—'আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মত দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্যবিধান বলে মেনে নেওয়া।... তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।' (মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী)। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ও তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ সেন আমলের বাঙালীর চরিত্রশৈথিল্যের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

৯

তুর্কী অভিযানের সময় বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল।

বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেউলদেহারা ও দেশীয় সামন্তশক্তির ওপর হামলা করতে যে বাধ্য হয়েছে তা অস্বীকার করারও কারণ দেখি না। দেশী শাসক-প্রশাসক-ব্যবসায়ীর স্থানে গায়ের জোরে বসল বিদেশী। কাজেই অনেকেরই সর্বনাশ হল ধনে-জনে মানে-মনে। প্রাণ হারাল অনেকেই। বিজেতাগণের উত্তমমন্যতা ও বিজিতদের হীনমন্যতার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক যে কিছুকাল অবজ্ঞা ও বিদ্বেষদুষ্ট ছিল তাও সত্য। তুর্কী অভিযান তথা ভারতে মুসলমান বিজয় যে ধর্মসম্পৃক্ত নয়, তা সবাই স্বীকার করেছে। সুতরাং শাসক-বিশেষের অত্যাচার-উৎপীড়ন জাতীয় কলঙ্করূপে চিত্রিত হওয়াও উচিত নয়। যেমন, গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন যে কয়জন ব্রাহ্মণকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন, তা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল। ইসলাম বা মুসলমানের এর সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজধানীতেও হিন্দু আধিক্য তার প্রমাণ। তুর্কী মুসলমানেরা রাজত্ব করতে এসেছিল, ধর্মপ্রচার করতে নয়। অবশ্য মুসলমান বিজয়ের আনুষঙ্গিক ফল পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় এবং বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোতে হিন্দুর ওপর বিশেষ করে ব্রাহ্মণের ওপর অত্যাচারের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায় এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন অহেতুক ছিল বলে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেও স্বদেশী সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতির ওপর দলীয় স্বার্থে ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রূঢ় ও কঠোর হতে বাধ্য হয়। বিরোধী দল একে অকারণ অত্যাচার-উৎপীড়ন বলে রটিয়ে থাকে। কে না জানে সকারণ শাস্তি চিরকালই শাস্তিভোগীর দ্বারা অকারণ উৎপীড়ন বলে বর্ণিত হয়? আত্মপক্ষ সমর্থন সহজাত বৃত্তি। আবার কোন কোন মুসলমানের কাফেরদের প্রতি অবজ্ঞা, কাফের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন উক্তি ও কার্য পুঁথিপত্রে বিধৃত থেকে গোটা মুসলমান জাতিরই কলঙ্ক ঘোষণা করছে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের মধ্যে যেভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছিল এবং হবার কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে কারণ থাকার কথা নয়। ওটাতে প্রতিবেশীসুলভ বহুকাল পোষিত আক্রোশের রেশ ছিল, এটাতে ছিল না। কেননা, দীক্ষিত মুসলমানের বিরলতার দরুন মুসলমান তখনো হিন্দুর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী হয়ে ওঠেনি। তখন কেবল বিদেশী প্রশাসক মুসলমান ও দেশী হিন্দুই ছিল—অনেকটা ইংরেজ শাসক ও ভারতীয় প্রজার মতো।

মুসলিম রচিত রসুল বিজয়, হানিফার দিগ্বিজয়, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতির মধ্যেও দেখি মুসলমানদের কাফেরের প্রতি নয় কুফরীর প্রতিই অশেষ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ, তাই তাদের কাহিনীতে রাজা ও ব্রাহ্মণই ইসলামে দীক্ষাদানের লক্ষ্য—দ্বন্দ্বও সর্বত্র রাজা ও ব্রাহ্মণের সঙ্গেই।

হিন্দু ও শাসক মুসলমানের বিরোধই সত্য ছিল, সম্প্রীতি মিলন কাহিনীই কি মিথ্যা? 'এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে সব ঐতিহাসিক নজীর দিন দিনই নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।' (ক্ষিতি-মোহন সেন)।

তুর্কী রাজত্বের প্রথম যুগে রাষ্ট্রশক্তির স্থিরতা ছিল না। রাজা ও রাজ-পুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ সময় দেশে হিন্দু-পীড়নে আগ্রহ না থাকারই কথা। কিন্তু ইলিয়াসশাহী শাসনে দেশে যে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ সময় থেকেই মুসলমান শাসকগণ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে তৎপর হন। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীক্ষার মাধ্যমে রক্তসম্পর্কও ব্যাপক হতে থাকে। কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত লাম্পট্যে হিন্দু রমণী ধর্ষণ যে চলেনি তা নয়, তবে এগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত নয়—কামজ। সুন্দরীর প্রতি পুরুষসুলভ আকর্ষণজাত। যেমন রাজা গণেশের দরবেশ-পীড়ন একান্তই রাজনৈতিক কারণপ্রসূত।

শাসকগোষ্ঠী চিরকাল আলাদা একটা জাতি। তাঁদের স্বার্থ ও সুখের প্রেরণাতেই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা চালিত। তা জনসাধারণের পক্ষে কখনো কখনো বিপদের কারণ হয়ে ওঠে মাত্র। শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ নরশ্রেষ্ঠ, আবার কেউবা নরদানব। এসবই হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্রনির্ভর ব্যাপার। কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের সঙ্গে সুশাসন-কুশাসনের সম্পর্ক সন্ধান নিতান্ত নিরর্থক। বাঙলার তথা ভারতের মুসলমান নৃপতিদের অনেকেই সুশাসক ছিলেন, নরদানবও ছিলেন কেউ কেউ। তাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ স্বজাতি-বিজাতি সমভাবে ভোগ করেছে। আস্তিক মানুষেরা কেবল স্বধর্মকেই সত্য বলে জানে। পর-

ধর্মে আস্থার অভাবহেতু ধার্মিকমাত্রেই পরধর্মের প্রতি অবজ্ঞাপ্রবণ। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক ও রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বুদ্ধি যে প্রবল ছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ। প্রতাপ-শিবাজীর মুসলমান অনুচর ছিল বহু। আওরঙজীবের হিন্দু সেনা ও সেনাপতির সংখ্যাও কি কম! তারপর যেসব সূত্রে আমরা বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার, হিন্দুর ওপর মুসলমান উৎপীড়নের সংবাদ পাচ্ছি, তাতে লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ নিশ্চয়ই রয়েছে। যেমন, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন আছে, তেমনি সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছাও কম নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ বিরোধের কথা ফলাও করে বলে বেড়ায়, আবার কেউ সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে। অথচ সত্য থাকে এ দুয়ের মাঝখানে। '১২০০ থেকে ১৪৫০ পর্যন্ত আড়াই শ বছর যাবত মুসলমানগণ বাঙলা দেশে অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার ফলেই এ সময়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করবার জন্যেই আমাদের এত কথার অবতারণা করতে হল।

১০

আমাদের ধারণা, তুর্কী বিজয় ও তারপরের বাঙলার অবস্থা নিম্নরূপই ছিল :

তুর্কীদের বাঙলা অভিযানকালে তারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, ধন-রত্ন প্রাপ্তির আশায় এবং পলাতক শত্রুর সন্ধানে দেউলদেহারা আক্রমণ করেছে ও ভেঙেছে। বিজয়ী হয়ে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে দেউলদেহারা ভাঙবার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বা আক্রোশ-বশে সামন্তশ্রেণীর কোন কোন হিন্দুর ওপর পীড়ন যে করতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তেমন অত্যাচার থেকে মুসলমানও নিষ্কৃতি পায়নি। সাধারণ মুসলমানের উত্তমমন্যতা ও সাধারণ হিন্দুর হীনমন্যতাজাত পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ তাদেরকে কিছুকাল অনাত্মীয় করে রেখেছিল বলেও অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা অত্যাচার করতে পারেনি। কারণ :

১. 'রাজ্যশাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।' (ডঃ সুকুমার সেন)। 'অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।...এই জায়গীরগুলির

ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।' (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস)

২. সাধারণ মুসলমানরা বিশেষ করে প্রচারক দরবেশরা চাইতেন এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার হোক। কাজেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যও সাধারণ মুসলমানকে সংযত হয়ে চলতে হয়েছে। বিশেষত গৌড়েই হযরত জালালউদ্দীন তাবরেজী ও আলাউল হক তাঁর পুত্র হযরত নূর কুতবে-আলম প্রভৃতি অবস্থান করতেন।

৩. গৌড়ের প্রথম দিককার সুলতান ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও মারামারিতে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে হিন্দু প্রজাদের [যারা ছিল শতকরা প্রায় আটানব্বই জন] তাঁরা উৎপীড়ন দ্বারা উত্তেজিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া তখনো গাঁয়েগঞ্জে মুসলমান ছিল দুর্লভ বা নগণ্য। ইলিয়াসশাহী শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গৌড়ের সুলতানের অধীনে হিন্দুরাও অন্তত মন্দের ভালো রূপে মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে মনে করত। অন্তত অনুগত ও তুষ্ট প্রজা ছিল। এজন্যেই মুঘলের বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তারা কখনো উদাসীন ছিল না। ধর্ম ব্যাপারেও পারস্পরিক সহনশীলতার ভাব বিরাজ করত। বৃন্দাবন দাস বলেন—

> 'হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
> আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
> হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম।
> আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম॥'

এবং বৈষ্ণবদের হাতে অনেক মুসলমান স্বধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইলিয়াসশাহী আমল থেকেই বাঙলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপতি ও কবি-চূড়ামণি, মহাচার্য রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র এ-সময়কার পরপর কয়েকজন

সুলতানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। হোসেনশাহী আমল বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণযুগ। এ-সময়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হল। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। দীনেশ চন্দ্র সেন (বৃহৎ বঙ্গ) বলেন—"বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।...এই পাঠান যুগে সর্ব প্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে, তাহারা গরুড়পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন। তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মপ্রচার—এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্য শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই।'

মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, নবদ্বীপ-সম্ভব কোন ব্রাহ্মণ বীর মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে বলে গুজব রটে, ফলে হোসেন শাহ চঞ্চল ও সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হওয়ায়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বপ্নসৌধ ধ্বসে গেল। রঘুনন্দন, রামনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য

সংহতির প্রতিবন্ধী বলেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে হোসেন শাহ গোড়ার দিকে চৈতন্যের মত প্রচারে পরোক্ষ সহায়তা দান করেন।

১১

ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের বাহন দেবভাষা সাধারণ বাঙালীকে বহুকাল মূক করে রেখেছিল। বাঙালী তার বুকের আশা মুখের ভাষায় বহুকাল প্রকাশ করতে পারেনি। সেন রাজাদের আমলে 'শূদ্রমাত্রেরই উচ্চ শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।...এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল।' (দীনেশ সেন—বৃহৎ বঙ্গ)। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালীর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ নানা ধারায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে আর্য-প্রভাবমুক্ত পৃথক জাতিরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন শুভযুগ বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর আগে বা পরে কোনদিন আসেনি।

সেক শুভোদয়া বা গীতগোবিন্দের ভাষা তো প্রসিদ্ধ গোড়ীয় রীতির তুলনায় নিকৃষ্ট। সেক শুভোদয়ার ভাষা তো অবিমিশ্রও নয়, তবু এঁরা দেশীভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে সাহস পাননি দেব-দ্বিজের ভয়ে। সহজ ও নাথপন্থীদের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখযোগ্য নয়—কারণ হিন্দু বাঙালীর সমাজে তাঁদের কোন প্রভাব ছিল না। সুতরাং একান্তভাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই, মুসলমানেরা কেবল সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা পাঠক ছিলেন না, সাহিত্যসৃষ্টিতেও হাত দিয়েছিলেন হিন্দুদের সাথেই। আর এ-ব্যাপারে তাঁদের কোন বাধাও ছিল না। বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান তো হিন্দু থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। কাজেই অনুকূল পরিবেশে তারা যে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহবোধ করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

১২

তবু পণ্ডিত ও প্রতিভাবানদের কাছে এ-ভাষা মধ্যযুগে কোনদিন কদর পায়নি। তাঁরা সংস্কৃত ও ফারসীকেই স্ব স্ব অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁরা সেবা করেছেন তাঁদের প্রতিভা খুব উঁচুদরের ছিল না। তাই কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি যতই পাণ্ডিত্যাভিমান দেখান না কেন, আলাউল,

দৌলতকাজী, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম যত বড় প্রতিভার পরিচয় দিন না কেন, কেউই সমসাময়িক সংস্কৃত বা ফারসী সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা রেখে যেতে পারেন-নি। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের মতো অধিকাংশ লেখকও যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তা অনুমান করা চলে। এজন্যেই চার শ বছর ধরে অনুশীলিত হয়েও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য আশানুরূপ ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও এসব রচনা রূপকল্পে না হোক, রসকল্পে তথা মনন-ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে বাঙলায় সংস্কৃতির কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

কোন জাতির মুখের বুলিও যে সাহিত্যসৃষ্টির বাহন হতে পারে, তা অসামান্য প্রতিভা ছাড়া কারো মনে জাগেও না, তাই বাঙলায় হিন্দুদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, জনগণের মধ্যে লৌকিক দেবতার পূজা প্রচারের আগ্রহ ও গরজই তাঁদেরকে বাঙলা লেখায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এজন্যেই হিন্দুর হাতে আমরা নিছক সাহিত্য-শিল্প পাইনি। গোড়া থেকেই কিন্তু মুসলমানরা এ-কাজে হাত দেন। বাঙলার মাধ্যমে ধর্ম-কথা শোনানোর সাথে সাথে উত্তর ভারতীয় ও ইরানী রস-কথা শোনানোর ব্যাপারেও তাঁরা উদ্যোগী হলেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে সম্ভবত বাঙলা ভাষাতেই প্রথম রোমান্স রচিত হয়। এ-কৃতিত্ব 'ইউসুফ জোলেখা' রচয়িতা শাহ্ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯—১৪০৯ খ্রীঃ)। কিন্তু এ প্রয়াস দেখা দেয় সেকালের মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে মাত্র। জনসাধারণ তাদের দিকে চেয়ে বসে ছিল না। তাদের সাহিত্যের ভাষা না থাক, মুখের বুলি ছিল। আরো ছিল জৈব-রস পিপাসা ও হৃদয়-নিঃসৃত বক্তব্য। তাই শিল্পসৃষ্টির মহৎ আদর্শে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই জৈব-প্রয়োজনে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক বুলিতে অঞ্চলবাসীর উদ্দেশ্যে গান, গাথা, ছড়া, বচন, রূপকথা ও রসবার্তা তৈরী করে তারা মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। এগুলোই আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় 'লোকসাহিত্য' বা 'পল্লীসাহিত্য'। বহু মুখের স্পর্শে এগুলোর রূপ ও রস বদলেছে, তাই এসব রচনা আর ব্যক্তিক নেই। এ কারণেই এগুলোকে 'গণ-রচনা' বলে নির্দেশ করা হচ্ছে আজকাল। দেশের লেখ্যভাষায় রচিত নয় বলে, এসব রচনা কোন কালেই অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারেনি। আগেই বলেছি 'পল্লীসাহিত্য' সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াসপ্রসূত নয়। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতাই এগুলোকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। আর আজকাল মর্যাদা পাচ্ছে সাহিত্য হিসেবে। আমাদের মঙ্গল কাব্যও,

বলেছি, দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়াসেরই ফল। তবু আনুষঙ্গিকভাবে তাতে সাহিত্যরস ও সাহিত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। তাই এগুলোও সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর দেব-লীলার-অনুধ্যান ও সাধন-ভজন-কীর্তনের বাহনরূপে রচিত হয়েছে গীতিকবিতা।

অতএব, অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের মাধ্যমরূপে বা গেঁয়ো লোকের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশের বাহনরূপে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, আমাদের বাঙলা বুলির সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরের ইতিহাসও সেরূপ। এর জন্মতারিখ জানা নেই, তবে এর জন্ম-পদ্ধতি ও জন্মের ইতিকথা আঁচ করা যায় সহজেই।

১৩

এবার যে-বাঙালী এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তাদের মন-মননের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যাক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বুঝবার জন্যে বাঙালীকে তথা বাঙালীর চরিত্র জানা আবশ্যিক। কেননা, জীবের বিশেষত মানুষের কর্ম ও আচরণে তার আন্তর সত্তার (Innerself) নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। মানুষের কর্ম ও আচরণ তার অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ। আর অভিপ্রায় হচ্ছে মন-মনন প্রসূত। এবং ব্যক্তির বা জাতির মন-মনন গড়ে ওঠে তার Heredity (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি) ও environment-কে (পরিবেশ) ভিত্তি করে। যেহেতু মানুষের কর্ম ও আচরণ তার ভাব-চিন্তা ও অনুভূতি-উপলব্ধিরই প্রতিমূর্তি, এবং যেহেতু ভাষা-সাহিত্যও জাতির কর্ম ও আচরণের অন্তর্গত, সেহেতু ভাষা ও সাহিত্য ব্যক্তির বা জাতির মানস-সন্তান—মানস-ফসল। আবার আমরা এও জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ারই কারণ রয়েছে, তেমনি সব কারণেরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। কাজেই ঘটনার বিশ্লেষণে ও বিচারে পূর্ব-ইতিহাস জানা আবশ্যক। কারণ আমরা জানি, ব্যক্তিকে না জানলে তার কর্ম ও আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তার ফলে ব্যক্তির কর্ম ও আচরণের গুরুত্ব-লঘুত্ব ও যাথার্থ্য বিচারেও ভুল হয়। কাজেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তথা স্বরূপ জানতে হলে বাঙালীর চরিত্রও জানা দরকার। আর চরিত্র জানতে হলে অতীতে ঘটা পৌন-পুনিক ক্রিয়া ও আচরণের সাধারণ লক্ষণ বিচারেই তা সম্ভব।

আগেই বলেছি, বাঙালী সঙ্কর জাতি। নানা গোত্রের-রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে তাদের জীবনে।

এর ফলে বাঙালী চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালী যখন কাঁদে, তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে, তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি—ফলে অভিভূতি—গভীর। কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়—যেহেতু উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালীর গীতি-প্রাণতার উৎস এখানেই।

দুহাজার বছর ধরে নির্জিত-শোষিত বাঙালী কালো পিঁপড়ের মতো অতি চালাক ও নিঃসঙ্গ স্ব-নির্ভর। তাই সে ধূর্ততা যত জানে বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না, ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। তাই তার সঙ্ঘশক্তি নেই, অভাবপীড়িত বাঙালী ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের অবদান গ্রহণে অক্ষম।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী', গণভাষায় 'জীবনবাদী' এবং নীতিবিদের ভাষায় 'ভোগবাদী'। এজন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার ওপর বার বার জয়ী হয়েছে। নৈরাত্ম্য ও নিরীশ্বরবাদী এবং নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালী মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র, সেজন্যেই তার অন্তরের জীবন-সাধনা ধর্মের ওপর জয়ী হল, তাই বৌদ্ধচৈত্য হল দেব-দেবীর আখড়া। নির্বাণের নয়—জীবনের ও জীবিকার আরাম ও বিলাসের দেবতা রূপে পূজিত হলেন তাঁরা। পারত্রিক নির্বাণ নয়, ঐহিক ভোগই হল কাম্য। যেহেতু বাঙালী কর্মকুণ্ঠ, তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জীবনোপভোগের প্রয়াস তাদের ছিল না। মহাজ্ঞান, তুক্-তাক্, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা

'সিঁদ ফাঁক' আরম্ভ করে খিড়কীধার দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হ'ল। পালদের আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য-উপশিষ্যেরা সেন রাজশক্তির সহায়তায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন, তখন বাঙালী বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করে নিল, কিন্তু হৃদয়ে জিইয়ে রাখল তার জীবন-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা। তাই 'মায়াবাদ', পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্মা-পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোন উৎসাহ ছিল না। শুধু তা-ই নয়, এতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে চণ্ডী (অন্নদা, দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পুজো দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এসব দেবতা তার পারলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না। একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে, বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলাদেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতাকে ও ইস্‌লামের নির্দেশকে ছাপিয়ে ওঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড়খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি জীবন ও জীবিকার ইষ্ট ও অরি-দেবতা। অতএব বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙালীর কোন কালেই ছিল না। সে একান্তভাবে জীবন-সেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। বঞ্চিত দরিদ্র বাঙালী যেখানেই ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানেই তার লুব্ধচিত্ত কাঙাল হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। দু'হাজার বছরের বঞ্চনার ফলে ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা হয়েছে তার মজ্জাগত। তাই জীবনধারণের প্রয়োজনে দেবনির্ভর হওয়া তথা অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় খোঁজাই ছিল তার আদর্শ। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরীয়া হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈব ধর্ম বিরোধী নির্জলা অধ্যাত্ম-চিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করেনি। সে আদর্শবাদের বন্ধনভীরু এবং জীবন-সাধনায় ও ভোগে অদম্য।

বাঙলায় ও বাঙালীর যা গৌরব-গর্বের অবদান, তা সব সময়েই ছিল ব্যক্তিক অবদান, সামগ্রিক জীবনে তা কচিৎ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই বাঙালীর মহৎ

পুরুষদের মহা অবদানের ফলভোগে ধন্য হতে পারেনি তারা। এই বাঙলা-দেশেই চিরকাল নতুন চিন্তা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু লালন পেয়েছে সামান্য। তবু যখন আমরা স্মরণ করি এই মাটির বুকেই—এই মানুষের মনোভূমেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ কিংবা ব্রাহ্মদর্শন, তখন গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। আবার যখন স্মরণ করি, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, রামনাথ, রঘুনাথ, চৈতন্যদেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, তীতুমীর, শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদেশেরই সন্তান, তখনো নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালী সাহিত্যে বাঙালীর এই চারিত্র—এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্টদেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণপ্রাচুর্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্ব-ধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন ধর্মই সে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয়নি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা একালে ক্ষেত্রবিশেষে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

কোম্পানী আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালী

[বাঙালী মুসলমান]

১. রিজলি, বিভার্দি, হান্টার প্রভৃতি নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকেই দেশজ মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছে। বি.এস. গুহ ও নীহার রায় বাঙালীতে আর্য-রক্তের অভাব স্বীকার করেন। অতএব, বাঙলার বর্ণহিন্দুর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের একাংশ বিদ্যায় ও বিত্তে, প্রভাবে ও প্রতাপে, সমাজে ও প্রশাসনে নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক ছিল বটে, কিন্তু আর্য ছিল না। কারো কারো মতে তারা আলপীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর কোন বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাঙলা-ওড়িশা-বিহারে এসে বসবাসের আগে। আদিশূর-বল্লালসেনী ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণের সংখ্যাও বাঙলায় নিতান্তই নগণ্য।

২. তুর্কী মুঘল আমলে শাসকরা ছিল অবাঙালী। খুব কম সংখ্যক অবাঙালীই এদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে স্থায়ী নিবাস করেছে। গৌড়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা ও হুগলি প্রভৃতির শহর-বন্দর এলাকায় অবাঙালী বাসিন্দা সীমিত। অবাঙালীর এখানে বাস করার অনীহার প্রমাণ শাহজাহানপুত্র সুবাহদার সুজার ঠাঁই পরিবর্তনের আবেদন এবং 'দোজখ-ই-পুর-নেয়ামত' থেকে তুর্কী, মুঘল চাকুরেদের চাকরির মেয়াদ অন্তে আর পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে বিদেশী মুসলিমের বাঙলাদেশ ত্যাগ প্রভৃতি।

৩. মুঘল আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি বাঙলা বলতে বিহার-ওড়িশাকেও বুঝতে হবে। তুর্কী-মুঘল আমলেও দেশজ মুসলমান উচ্চপদে ছিল বলে প্রমাণ মেলে না। এমনকি ১৮৬০ সন অবধি কোলকাতায় যাঁরা রাজসরকারের নানা কাজে মুসলমানের হয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন বাঙলা না-জানা মুসলমান। তাই আমরা রামমোহন প্রভৃতির সমকালে কিংবা রাজনারায়ণ, দেবেন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমকালে ইংরেজী শিক্ষিত আবদুল লতিফকেই কেবল বাঙলা-জানা উর্দুভাষীরূপে পাচ্ছি। মীর মশাররফ হোসেনের পিতা গ্রামে নিবাসী অবাঙালীর বংশধর, তিনি বাঙলায় কথা বলতেন কিন্তু শিক্ষিত হয়েও বাঙলা বর্ণমালা শেখেননি।

৪. দেশজ মুসলমান মোল্লা, খোন্দকার, মৌলবী, মুয়াজ্জিন, উকিল (মুনশী)

কাজী, কেরানী গোমস্তা প্রভৃতির ওপর কোন কাজে নিযুক্ত ছিল না। সিপাই কেউ কেউ হয়তো ছিল, কিন্তু ফৌজদার প্রভৃতি নিশ্চয়ই দুর্লভ ছিল। মীর-কাসিম পরবর্তী মীরজাফর-পুত্রদের আমলেও বাঙালী পল্টনে উত্তর বিহার ও উত্তরপ্রদেশের লোকই দেখতে পাই। অবাঙালী মজনুশাহর কিংবা ভবানী পাঠকের ফকির-সন্ন্যাসী দলই তার প্রমাণ। এমনকি, একশ বছর পরেও ১৮৫৭ সনে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে আমরা বাঙালী সৈনিক পাইনে।

৫. কাজেই নিম্নবিত্তের নাথযোগী (তাঁতী), বৌদ্ধ ও নমঃশূদ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকেই মুখ্যত দেশী মুসলিম সমাজ গঠিত। ধর্মান্তরে এদের অনেকের পেশান্তর ঘটেনি। জোলা, কৈবর্ত, কাহার, মুলুকী, কুমার, বেদে, কাগজী, নিকারী, বারুই প্রভৃতি তার প্রমাণ। তাদের শিক্ষার ঐতিহ্যই ছিল না। মুসলিম হয়েও তাই তারা শিক্ষার পথে তুর্কী-মুঘল আমলে যায়নি। তবু শাস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক বাধার অনুপস্থিতির ফলে উচ্চাভিলাষীরা আরবী, ফারসী ও বাঙলা কিছু শিখেছিল। এদের সর্বোচ্চ পেশা ও পদ ছিল উকিলের (মুন্শীর) ও কাজীর।

৬. এসব শিক্ষিত পরিবারে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রতি বিরূপতার বিশেষ প্রমাণ নেই। সৈয়দ আমীর হোসেন ১৮৮০ সনে তাঁর মুসলিম শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় মুসলিমদের জন্যে কোলকাতা মাদ্রাসা অঙ্গনেই বি. এ. কলেজ স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথাপ্রসঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষা তখন মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮—৯৩) রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের ১৮৬৩ সনেই ইংরেজী শিক্ষামুখী করতে চেয়েছেন। তিনি ১৮৬৮ সনে মুসলমানদের জন্যে তিন প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন—ইংরেজী শিক্ষায় অনিচ্ছুকদের জন্যে কেবল আরবী মাদ্রাসা, অন্যদের জন্যে অ্যাঙলো-পার্শিয়ান এবং তার সঙ্গে চার বছর মেয়াদী বিশুদ্ধ কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে ইচ্ছুকদের জন্যে। কলেজ কোলকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত হয়নি বটে, তবে নওয়াব লতিফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সন থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে (প্রাক্তন হিন্দু কলেজে) মুসলিম ছাত্রদের পড়ার অধিকার দেওয়া হয়।

৭. কোলকাতায় যারা হাঁটা পথে আসতে পারত, তারাই কোলকাতায় কোম্পানীর প্রসাদ ও ইংরেজী শিক্ষা গোড়া থেকে গ্রহণ করেছে। এরা কায়স্থ

ও ব্রাহ্মণ—বৈত্ত ও শূদ্ররা আর দেশী মুসলমানরা সাধারণত এ সুযোগ গ্রহণ করেনি। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ইংরেজীশিক্ষা বিরোধী পরিবার ছিল, বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস তার প্রমাণ।

৮. শিক্ষায় ঐতিহ্যসম্পন্ন মুসলমান পরিবারে বিশেষ করে উকিল ও কাজী পরিবারে ইংরেজী শিক্ষা গোড়া থেকেই ছিল। ১৮২৪ সনে নওয়াবের আগ্রহে নওয়াব পরিবারের ও পদস্থ কর্মচারীদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্যে কোম্পানী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদাবাদে। কাজেই ইংরেজীর প্রতি অনীহার ও ইংরেজী বর্জনের প্রমাণ নেই স্বয়ং হৃতরাজ্য ও হৃতপ্রভাব শাসকদের মধ্যেও। শেখ এহতেশামউদ্দিনের 'বেলায়েত নামা' (১৭৮০) সূত্রে জানা যায় তিনিসহ অন্তত আট জন মুসলিম কোলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গোমস্তা ছিলেন। এবং আমরা জানি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গোড়া থেকেই ত্রিশোর্ধ্ব শিক্ষিত মুসলিম নিযুক্ত ছিলেন। অন্য প্রমাণ নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮—৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮) এবং ১৮৬৩ সন থেকে মুসলিম গ্র্যাজুয়েটদের আইন পড়ার প্রবণতা। অন্যদের ঐতিহ্য ছিল না। কোলকাতার চারপাশে মুসলিম বাসিন্দার স্বল্পতাও মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার রুদ্ধ থাকার অন্যতম কারণ। দেশী মুসলমানদের যদি শিক্ষার ঐতিহ্য থাকত তাহলে আমরা মুসলিম সমাজে সাক্ষর বা আরবী-ফারসী শিক্ষিত (তা যতই নিম্নমানের হোক) অনেক লোক পেতাম। উল্লেখ্য যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭—৯৮) প্রবর্তনায় ১৮৭০ সনের দিকে ভারতের মুসলিম মনে ব্রিটিশ প্রীতি জাগে, কিন্তু তখনো ঐতিহ্যের ও গাঁয়ে স্কুলের অভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রত্যাশিত আগ্রহ জাগেনি দেশজ মুসলিম মনে।

৯. যেসব অবাঙালী প্রশাসনে ও সৈন্যবাহিনীতে চাকরী করত তারা আভিজাত্যাভিমানবশে অন্য চাকরি গ্রহণ করেনি, এবং তাদের মধ্যেই হয়তো শ্রেণী হিসেবে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও তজ্জাত ইংরেজী শিক্ষায় অনীহা ছিল (অবশ্য তাদের অধিকাংশই উত্তরভারতের দিকে হিজরত করে)। এদের মধ্যে বাঙালী থাকলে তাকে ব্যতিক্রম বলতে হবে এবং সে-ব্যতিক্রম হিন্দুদের মধ্যেও দুর্লভ ছিল না। কিন্তু দেখা যায় শাসকগোষ্ঠীর মুসলিমদের মধ্যেও ইংরেজ-বিদ্বেষ দুর্লভ ছিল, প্রমাণ আজিমুদ্দিনের ও এহতেশামউদ্দিনের বিলেত যাত্রা।

১০. হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও শাস্ত্রিক যোগাযোগের প্রভাবে দেশের

গাঁ-গঞ্জের হিন্দুরাও কোলকাতার চাকরির লোভে ও ঐশ্বর্য-লিপ্সাবশে দ্রুত ইংরেজী শিখতে থাকে। কিন্তু মুসলিম-বিরল কোলকাতায় মুসলিম সমাজকে আকৃষ্ট করবার মতো পরিবেশ ছিল না। মুর্শিদাবাদ রাজধানীর মর্যাদা হারাবার ফলে মুর্শিদাবাদী বৃত্তিজীবীরা জীবিকার গরজে কোলকাতায় আসে। তারাই কোলকাতার উর্দুভাষী মুসলিম বাসিন্দা। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায় তাদের আগ্রহ ছিল না। আবদুল লতিফ ছিলেন কোলকাতার উর্দুভাষী উকিলের সন্তান এবং সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত হেকিমের সন্তান।

১১. রসুলের ইসলাম প্রচারকালেই একেশ্বরবাদ, সাম্য, যুদ্ধ, রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ওহী ও দীক্ষিত মুসলিমে সঞ্চারিত আল্লাহ্‌তে ও আত্মশক্তিতে অটল বিশ্বাস সাধারণ মুসলিম মনে ইমান, শাস্ত্রীয় আচরণ ও পার্থিব উন্নতি অভিন্ন করে তুলেছিল। এই বিভ্রান্তির জের থেকে সাধারণ মুসলিমরা আজো মুক্ত নয়। তাই দুর্দিনে এরা উন্মেষ-যুগের মুসলিম জীবন, বিশ্বাস ও আচারিক বিশুদ্ধতাই সব পার্থিব উন্নতির কারণ হিসেবে স্মরণ করে। মনে করে ইমানের জোরই এবং আচারিক বিশুদ্ধতাই সব পার্থিব দৈন্য ঘুচাতে পারে। কেননা মুমীন কখনো দুর্ভোগের-দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে না। আগের যুগের রেওয়াজ অনুসারে আঠারো শতকের ভারতীয় মুসলিমরা তাই তাদের রাজনীতিক ও আর্থিক দুর্ভাগ্যের জন্যে শাস্ত্রানুগত্যে শৈথিল্যকে ও আচার-বিকৃতিকেই দায়ী করে। ফলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০২—৬২) থেকে সৌভাগ্য ও শক্তি পুনঃপ্রাপ্তি লক্ষ্যে সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়, এ আন্দোলন প্রবল হয় আরবের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০২—৯১) প্রভাবিত হাজী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর (১৭৮৬—১৮৩১) নেতৃত্বে। এ সময়ে পাঞ্জাবের শিখ রাজার শাসনে মুসলমানরা 'আজান' দেওয়ার, গো-হত্যার ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় পার্বণিক অনুষ্ঠানের অধিকার হারায়। তাছাড়া, আর্থিক জীবনেও শিখ জমিদার-মহাজনের কাছে ঋণী মুসলমানকে ঋণের ও খাজনার দায়ে বউ-ঝিকে ও ছেলেকে দাসী-দাসরূপে ঋণ আদায় সাপেক্ষে বন্ধক রাখতে হত। সাতশ বছরের শাসক মুসলমান এতে অপমানিত বোধ করে। তাই মুসলিম রাজশক্তির পুনরুত্থান লক্ষ্যে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ শিখ রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ পরাজিত ও নিহত হন (১৮৩১ সনে)। সৈয়দ আহমদ শিখযুদ্ধে

কোলকাতার ব্রিটিশ শাসকদেরও নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন, কেননা শিখরা ছিল ব্রিটিশের ভাবী শত্রু। ওয়াহাবীদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ আগে আরো পরে। বাঙলাদেশের ওয়াহাবী তীতুমীরও (১৭৮২—১৮৩২) গোড়ায় ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন না, শিখদের মতো হিন্দু জমিদার-মহাজনদের মুসলিম শাস্ত্রাচারে বাধা-দান, দাড়ি কর প্রভৃতিই ছিল তীতুমীরের জমিদার বিদ্বেষের সচেতন ও প্রত্যক্ষ কারণ, যদিও মূলকারণ ছিল ওদের আর্থিক শোষণ ও পীড়ন। তীতুমীর ও ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ বিদ্বেষী হন সরকার জমিদার সমর্থক হল বলেই। শরীয়ত-উল্লাহ (১৭৬৪—১৮৪০) ও তাঁর পুত্র দুদুমিয়া (মহসীনউদ্দীন) (১৮১৯—৮২) ফরায়েজী আন্দোলনের আবরণে ঐ জমিদার-মহাজন-ও-ব্রিটিশ বিদ্বেষ কিছুকাল চালু রাখেন। বলা বাহুল্য, ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয়। এবং অশিক্ষিত মুসলমানরাই ছিল মুখ্যত এ চাষী উত্তেজনার শিকার ও আন্দোলনের মূল শক্তি। বাঙলাদেশের নিরক্ষর পরিবারের হাজার হাজার তরুণ স্বেচ্ছায় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর, তীতুমীরের ও দুদুমিয়ার আহ্বানে মুজাহিদের মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লঘুগুরুভাবে চলে এ-আন্দোলন, অবশেষে ১৮৬৪—১৮৬৮ সনের ওয়াহাবী বিচারে আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য অবসিত হয়, এবং তা রূপ নেয়।

কাজেই ওয়াহাবী আন্দোলন নিরক্ষর গ্রাম্য মুসলিম মনে ব্রিটিশ বিদ্বেষ জাগালেও, শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারে ইংরেজী শিক্ষায় তেমন অনীহা জাগাতে পারেনি, ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র বিহারে ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রসারই তার প্রমাণ এবং মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮—১৯৫২), আবদুল লতিফ (১৮২৮—৯৩), আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮) প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলিম বংশধর বলে পরিচিত পরিবারে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহই তার প্রমাণ। সে সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে হিন্দুর তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যাও (৩০%) কম ছিল, উনিশ শতকের শেষপাদে ও বিশ শতকের প্রথমপাদে পূর্ববঙ্গে সংখ্যায় বেড়ে মুসলিমরা গোটা বাঙলায় অধিজন হয়ে ওঠে। ১৮৬১ সন থেকেই মুসলমানও গ্র্যাজুয়েট হচ্ছিল, তবে পড়ুয়ার সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি হয়তো উপর্যুক্ত কারণেই।

১৮৬১—৭০ = ৯ জন

১৮৭১—৮০ = ১০ জন

১৮৮১—৯০ = ৬৩ জন

১৮৯১—১৯০০ = ১১৬ জন

মোট ১৯৮ জন মুসলিম উনিশ শতকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। এবং এদের অধিকাংশই উর্দুভাষী ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধিবাসী, কেবল বাঙলার নয়। কাজেই নীচের স্তরে কয়েক হাজার পাশ-ফেল ইংরেজী-জানা লোক সমাজে ছিল। এদের পারিবারিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি সন্ধান করলে জানা যাবে হিন্দুর তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তখনকার ভদ্র পরিবারের কোন বিরূপতা ছিল না। এ সময়ে হিন্দু সমাজের বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী মুসলমানদের চেয়েও পিছিয়ে ছিল। চিরকালের চাকুরে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঘোষ, বোস, গুহ, দত্ত, মিত্র এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়রা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা দ্রুত গ্রহণ করে। অতএব অ্যাডামের বা আজিজুর রহমান মল্লিকের সিদ্ধান্তে পুরো সত্য নিহিত নেই। সেকালের গ্রামীণ পরিবেশে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠালেই সন্তান শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হত না, শিক্ষকের রূঢ় নির্মম শাসন, কায়িক শাস্তি প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে পালানো ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। সাধারণ স্বল্প মেধার ছাত্রদের কাছে লেখাপড়া ছিল তিক্ত ওষুধের চেয়েও ভয়াবহ এবং পর্বতারোহণের মতো দুঃসাধ্য।

২

১. বলেছি, আঠারো শতক ভারতীয় মুসলমান রাজশক্তির পতনকাল। ওয়াহাবী আন্দোলন সে-পতনের জন্যে আত্ম-সমালোচনার, অনুশোচনার ও পতনবোধের প্রয়াস-প্রতীক। কিন্তু য়ুরোপীয়দের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প বিপ্লব, উন্নত কৃৎকৌশল, অস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ, প্রশাসনিক সৌকর্য প্রভৃতির মুখে তাদের তথা প্রাচ্যের সর্বত্র মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনাসঞ্জাত প্রয়াস ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের ওয়াহাবী প্রয়াস ছিল ধর্মীয় উত্তেজনা-নির্ভর। অবশ্য এর সকারণ কালিক প্রয়োজনও ছিল :

ক. 'Sikh nation has long held away in Lahore and other places. Their oppressions have exceeded all bounds. Thousands

of Muhommedans have they unjustly killed and on thousands they have heaped disgrace. No longer do they allow call for prayer from the Mosques and the killing of cows they have entirely prohibited.'—হান্টারের এ উক্তিতে কিছুমাত্র সত্য থাকলেও তা যুদ্ধ বাধার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮২৬ সনের একুশে ডিসেম্বরে জিহাদ করেন স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের নিয়ে।

খ. তীতুমীরের সংগ্রামের ও জীবনের অবসান ঘটে ১৮৩১ সনে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে। তীতুর সংগ্রামের কারণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'Tito belonged to the Wahhabi sect of the Muhammedan fanatics and was excited to rebellion in 1831 by a Beard Tax imposed by Hindu Landholders.'

গ. ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে দারুল হরব বলে ঘোষণা করে এবং হিযরত করে মুসলিম শাসিত আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্যে মুসলিমদের প্ররোচিত করে। পরাজয়ের গ্লানি ও ক্ষোভ ভুলবার এ ছিল এক অক্ষম আত্মবিনাশী মনোভাব ও কর্মপন্থা।

ঘ. ওয়াহাবী বিচারের (১৮৬৮ সন) পরে এবং ব্রিটিশপ্রেমী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ও প্রবর্তনায় উচ্চবিত্তের মুসলমানের মনে ব্রিটিশ-প্রীতি এবং আনুগত্য দ্রুত প্রসারলাভ করে। তখন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলিম মনে ব্রিটিশপ্রীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ সাধারণভাবে বাড়তে থাকে। ফলে ধর্ম আচরণে বাধা নেই—এ তথ্যের স্বীকৃতিতে ভারতকে 'দারুল হরব' বলা অযৌক্তিক বলে উপলব্ধ হয়।

ঙ. সিপাহী বিদ্রোহ দিল্লীর বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে হওয়ায় ওয়াহাবীরা সিপাহী বিদ্রোহে প্রধান বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করে। মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশ বিরূপতার এ সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের বাঙলা সুবাহ্‌র সরকারী চাকরি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় ব্রিটিশ ও হিন্দু চাকুরেরা। ১৮৬৯ সনে ফারসী সংবাদপত্র 'দূরবীন'-এ প্রকাশিত এক পত্রের সূত্রে (এ সম্বন্ধে কোন সরকারী প্রতিবাদ বা বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি) প্রকাশ পায় :

'All sorts of employments, great and small are being snatched away from the Muhammedans and bestowed on men

of other races, particularly the Hindus...it (Govt.) singles out the Muhammedans in its Gazette for exclusion from official posts. Recently when several vacancies occured in the office of the Sunderban's Commissioner, that official, in advertising them in Govt. Gazette stated that the appointments should be given to none but Hindus, etc.'

চ. ওয়াহাবী দমনের পরে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার রাজধানী কোলকাতায় নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও সৈয়দ আমীর আলী ব্রিটিশ আনুগত্যে মুসলিম-কল্যাণ কামনা করতে থাকেন—উত্তর ভারতে তখন একাজই করছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। এসময়ে বাঙলাদেশে মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৫৫ 'আঞ্জুমান' ও ১৮৬৩ সনে 'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি' প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

ছ. শোনা যায়, বারাণসীর হিন্দু পণ্ডিতেরা (১৮৬৭ সনে) উত্তর ভারতীয় ভাষাকে নাগরী হরফে ও হিন্দি নামে চালু করার আন্দোলন শুরু করলে ফারসী হরফে উর্দু নামের সমর্থক সৈয়দ আহমদ খান স্ব-সমাজের স্বার্থে হিন্দুকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে উর্দু ভাষায় ও রচনায় হিন্দুরা নিজেদের খুঁজে পায়নি বলেই উর্দু বর্জনে ও হিন্দি গ্রহণে উৎসুক হয়েছিল, বাঙালী মুসলমানরা যেমন উনিশ শতকে বাঙলা ভাষায় ও রচনায় নিজেদের কথা না দেখে 'হিন্দুর ভাষা' পরিহার করে নিজেদের জন্যে উর্দু-ফারসী ভাষা কামনা করেছিল স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজেই।

৩

১. ষোল শতক থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে য়ুরোপীয়রা বহির্বিশ্বে ভাগ্যান্বেষণে বের হতে বাধ্য হয়। বাঁচার গরজবোধই তাদের আবিষ্কারের ও সৃষ্টিশীলতার জনক। কাজেই চিন্তায়, চেতনায়, উদ্যোগে, আয়োজনে, হাতিয়ারে, সাহসে, বাণিজ্যে, অস্ত্রে, সমরবিদ্যায় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তারা এশিয়াবাসীদের ছাড়িয়ে গেল। কাজেই তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যে-কোন আফ্রো-এশীয় রাজশক্তির পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। অতএব পলাশীর যুদ্ধ তা এ

অঞ্চলে সূচনা করে মাত্র। একারণেই একশ বছর সময় পেয়েও ভারতীয় কোন রাজশক্তি ব্রিটিশকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

২. পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রাবল্য স্বীকৃতি পেল মাত্র। কিন্তু পলাশীযুদ্ধই ব্রিটিশ কোম্পানীকে সুবেহ-বাঙ্গালার কর্তৃত্ব দেয়নি। হয়তো মীর কাসিমের মতো পরে কেউ ব্রিটিশকে বাঙলা থেকে উৎখাত করতে পারত, কিন্তু দিল্লীর সম্রাট-নিযুক্ত দেওয়ানরূপেই বাঙলায় তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অপ্রতিহত ও রণজিৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেল। বস্তুত ১৮৫৭ সন অবধি কোম্পানী জনসাধারণের কাছে দিল্লী-সম্রাটের দেওয়ান-রূপেই ছিল পরিচিত, যদিও ১৭৬৫ সন থেকে কোম্পানীই স্বাধিকারে ছিল সার্বভৌম।

হাণ্টার বলেছেন, 'The English obtained Bengal simply as the Chief Revenue Officer of the Delhi emperor, instead of buying the appointment by a flat bribe, we won it by sword. But our legal title was simply that of the Dewan or Chief Revenue Officer. [See the 'Firman' of the 12th August in Mr. Aitchison's Treaties/or in the Quarto Collection put forth by the East India Company in 1812. XVI to XX]. As such the Muhammedans hold that we (the English) were bound to carry out the system which we then undertook to administer. There can be little doubt, I think, that both parties to the treaty at the time understood this. For some years the English maintained these Muhammedan Officers in their posts, and when they began to venture upon reform they did so with a caution bordering on timidity.'

৩. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিব্যবস্থা (১৭৯৩ সনে) সমাজে ভূকম্পনের মতো একটা ওলট-পালট অবস্থার সৃষ্টি করল। এতে পুরোনো ভূস্বামী ও ভূ-চাষী সবাই হল ক্ষতিগ্রস্ত—সনাতন জীবনযাত্রায় এল বিপর্যয়, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায়ও এল আমূল পরিবর্তন। James O. Kincaly বলেছেন, 'By it (permanent Settlement of 1793) we (the English) usurped the

functions of those higher Mussalman officers who had formerly subsisted between the actual Collector and the Govt...instead of Mussalman Revenue Farmers···we placed an English Collector in each District...it most seriously damaged the position of the Great Muhammedan houses···it elevated the Hindu Colle.tors who upto that time held but unimportant posts to the position of landholders.' [এদের মধ্যে বাঙালী মুসলিমও ছিল কিনা জানা নেই।]

৪. আরো পরে ১৮২৮ সনের আইনে দেবোত্তর ও আয়মা তথা লাখরাজ সম্পত্তিতে রাজস্ব তথা ভূমি-কর বসিয়ে মোল্লা, খোন্দকার, মুয়াজ্জিন, শিক্ষক, দরগাহর-মুতোয়াল্লীরূপে এবং পীরালী বা রাজানুগ্রহ সূত্রে পাওয়া লাখরাজ ভূ-সম্পদ কেড়ে নেওয়ায় বসে-খাওয়া উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বহু মুসলমান হল সর্বস্বান্ত (১৮২৮—৪৬ সনের মধ্যে)। হিন্দুর দেবোত্তরও গেল বটে, কিন্তু তারা সে-ক্ষতি পুষিয়ে নিল কোম্পানীর ব্যবসায় ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ পেয়ে, অসদুপায়ে সহজে লভ্য কাঁচা টাকা আয় করে। এতে পুরোনো শিক্ষালয় চালু রাখা এবং দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতির সংরক্ষণ অসম্ভব হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। অতএব ১৯২৮ সনের পূর্বে কোম্পানী আমলের প্রায় ষাট-আশি বছর অবধি মুসলিম পরিবারগুলো আয়মা সম্পত্তি ভোগ করেছে। কিন্তু এসব মুসলমানদের যারা সহি দলিল দেখাতে পেরেছে, তাদের ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগে বাধা হয়নি। তাছাড়া এঁদের মধ্যে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

৫. ইংরেজী শিক্ষাকে মিশনারীদের প্রচার-আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ-ভাবে দেশীয় লোকেরা ভয়ের ও সন্দেহের চক্ষে দেখেছে বটে, কিন্তু লাভের-লোভের ও প্রয়োজনের মুখে সে-ভয় বা বাধা টেকেনি হিন্দুর ক্ষেত্রে। মুসলমানের ক্ষেত্রেও আসলে টেকেনি। মুসলমান পিছিয়ে পড়ল অন্য কারণে। মুঘল আমলেও রাজস্ব অফিসে (তখনকার একমাত্র প্রধান কার্যালয়) বেশী সংখ্যায় কাজ করত হিন্দুরা। মুসলমান ছিল বিচারালয়ে কাজী ও উকিল হিসেবে, আর সৈন্য বিভাগে (সাধারণভাবে অবাঙালী)। তাই কোম্পানীর ব্যবসায়ে ও অফিসে অজস্র রোজগারের লোভে কোলকাতায় হিন্দুরা উনিশ শতকের (স্মর্তব্য যে সতেরো-আঠারো শতকেও হিন্দুরাই কোলকাতায় কোম্পানীর-

গোমস্তা, বানিয়া, মুন্সী, মুৎসুদ্দী, ও কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছে এবং সামান্য মৌখিক ও লিখিত ইংরেজী শিখেছে) গোড়া থেকেই মৌখিক ও লিখিত ইংরেজী শেখা শুরু করে পরম আগ্রহে—নতুন যুগে তারা দ্রুত ধনী হতে চেয়েছে ধর্মহানির ভয় উপেক্ষা করে। কোলকাতায় সে-শ্রেণীর দেশী মুসলমান উপস্থিত ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে শহরে বৃত্তিজীবীরাই কেবল নতুন শাসনকেন্দ্র বন্দর-শহর কোলকাতায় জীবিকা অর্জনের গরজে এসেছিল। তাই ইংরেজী শিক্ষায় এবং কোম্পানীর চাকরিক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ল মুসলমানরা। দেশজ আতরাফ-আজলাফ নিম্নবৃত্তিজীবী মুসলিমদের শিক্ষায় ঐতিহ্য ছিল না বলে, আর দেশজ অন্য মুসলিমরা কোলকাতা থেকে দূরে ছিল বলেই ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বঞ্চিত রইল—ইংরেজ ও ইংরেজী বিদ্বেষের ফলে নয়।

৬. অতএব হিন্দুরা যখন ব্যক্তিগত আগ্রহে ও সামষ্টিক প্রয়াসে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে (হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত ১৮১৭ সনে) ইংরেজী শিক্ষায় প্রায় পঞ্চাশ বছর অগ্রসর, তখনও মুসলমান কোলকাতায় গিয়ে স্থিতধী ও কর্তব্য-সচেতন হতে পারছিল না। যদিও ১৭৮০ সনেই কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, এই মাদ্রাসায় শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে অবাঙালী মুসলমানরাই। শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ বাঙালী ছিলেন না। দেশের অন্যান্য মাদ্রাসায়ও মুঘল আমল থেকে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি বাঙলা হরফও শেখান হত না। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্যেই চট্টগ্রামে আরবী হরফে বাঙলা বইয়ের প্রতিলিপি তৈরী করা হত, প্রমাণ সৈয়দ সুলতান রচিত 'জয়কুমরাজার লড়াই' পুঁথির লিপিকরের উক্তি :

> হীন আফতাবুদ্দিন কহে আল্লা নবী
> পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষর আমি করিলাম আরবী।

নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের 'শরীয়ত নামা'রও লিপিকর বলেন :

> কন্ হরফে কন্ লব্জ ন বুজিএ অর্থ
> বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত।

মাদ্রাসা শিক্ষিতরা ১৮৩২ সনের ডেপুটিগিরির সুযোগ পেলেও ১৮৩৮ সনের শিক্ষায় ও শাসনের ইংরেজী মাধ্যমের সুযোগ তারা পায়নি। বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন মুসলমানরা ধর্মহানির পরওয়া না করেও ইংরেজী শিখত, কিন্তু কোলকাতা-কেন্দ্রী বাস্তব পরিবেশ তাদের ছিল না। মুসলমানরা আদালতে

কাজীগিরি হারাল বটে, কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে তারা ইংরেজী শিক্ষিত উকিল সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সন অবধি সংখ্যাগুরুই ছিল। ঐটিই তখন তাদের শহরে রোজগারের একমাত্র উপায়। বাঙালী ফৌজদারদের বা অবাঙালী সেনাদের যারা দেশে রয়ে গেল, তারাও আত্ম-সম্মানের কারণে অফিসের চাকরি নিজেদের বা তাদের সন্তানদের জন্যে কামনা করেনি। সৈন্য বিভাগের চাকরির মর্যাদা তখন বেশী ছিল। অতএব ১৮৩২-৩৩ সনে ডেপুটি নিয়োগকালে ও কাজী কমিশনারের বদলে 'মুন্সেফ' পদ সৃষ্টি-কাল থেকে [১৮৩৮?] মুসলমানরা সরকারী কর্ম থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এবং মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সনের পরে সরকারী অফিস আদালত মুসলিম-শূন্য বা মুসলিম-বিরল হতে থাকে।

৭. অবশ্য ১৮৬০ সন থেকে বিশেষ করে ১৮৬৮ সনে ওয়াহাবী বিপ্লবের অবসানে ব্রিটিশ-প্রীতি নীতির প্রভাবে আর্থিকজীবন উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় মনোযোগী হয়। প্রথমত সেই শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা দেশে বেশী ছিল না, দ্বিতীয়ত স্কুলে পাঠালেও পরিবেশের, প্রেরণার ও আগ্রহের অভাবে অধিকাংশের শিক্ষা স্কুলের নিম্ন-শ্রেণীতেই হয়েছে অবসিত, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক কিংবা শেখ আবদুল রহিম প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন-চরিত এ সাক্ষ্যই যখন দান করে, তখন অজ্ঞাত অসংখ্য ভদ্রসন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত অনুমান করা চলে, তবু উনিশ শতকেই আমরা ১৯৮ জন গ্র্যাজুয়েট, কিছু উকিল, কিছু ডেপুটি, কিছু মুন্সেফ ও অন্যান্য চাকুরে এবং কয়েক হাজার স্কুলে-পড়া পাশ ও ফেল এনট্রান্স, এফ. এ. ও বি. এ. শিক্ষার্থী পেয়েছি। এরা সমাজে পতিত হয়নি, সগৌরবে প্রতিষ্ঠাই পেয়েছিল। কাজেই রাজ্যহারাদের [রাজ্য হারাল মুঘল সুবাদার, বাঙালী মুসলমান নয় এবং স্বধর্মীশাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শাসিত দেশজ মুসলিমের কোন আত্মিক বা আত্মীয়তার যোগ ছিল না।] ব্রিটিশ-দ্বেষণা বা ইংরেজী-বিদ্বেষ তত্ত্বে কোন সত্যই নেই। হিন্দু অধিকৃত অফিস-আদালতে সামাজিক কারণেই মুসলিমদের চাকরি পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। কাজেই মুসলমানরা সে-কারণেও উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষাদানে বিশেষ যত্নবান ছিল না। তাছাড়া মুঘল আমলে গাঁয়ের মুসলিম সমাজে (আতরাফদের মধ্যে তো

নয়ই) বাঙলা ও আরবী-ফারসীতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা উনিশ-বিশ শতকের চেয়ে বেশী ছিল বলে প্রমাণ নেই। উচ্চশিক্ষিত আলেম বা মুন্সী সব গাঁয়ে ছিল না। মোল্লা, খোন্দকার, ইমাম, মুয়াজ্জিন, পণ্ডিত, হেকিমও সব গাঁয়ে ছিল বলে ঐতিহ্যপরম্পরায় কিংবা শ্রুতিস্মৃতি সূত্রে জানা যায় না। তবে সাক্ষর লোক দু'চার জন ছিলই। এই সচ্ছল সাক্ষর পরিবারগুলোই গাঁয়ের খানদানী পরিবার। উল্লেখ্য যে দেশজ মুসলিম নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু থেকেই দীক্ষিত। কাজেই তাদের না ছিল সম্পদ, না ছিল সাক্ষরতা, মুসলমান হয়েই তারা সাক্ষরতার সুযোগ পায়, কিন্তু ঐশ্বর্যে অধিকার পাওয়ার কারণ ঘটেনি। তুর্কী-মুঘল আমলেও জমিজমা ও অর্থবিত্তের মালিক ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা। সুতরাং ধর্মান্তরের ফলে তাদের কচিৎ কারো পেশান্তর ঘটেছে এবং দারিদ্র্য ঘুচেছে।

৮. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও কোলকাতায় এরাই চাকুরে গোমস্তা, ফড়ে, বেনে হিসেবে কাঁচা টাকার মালিক হয়। আবার ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামের ভূমি বা রাজস্বব্যবস্থায় বর্ণহিন্দুরাই লাভ-ক্ষতি সমভাবে ভোগ করে, জমিদারী নিলাম হল হিন্দু জমিদারের, ক্রয়ও করল উঠতি গোমস্তা, বানিয়া, ফড়িয়ারা। তুর্কী-মুঘল আমলে অস্থায়ী মুসলিম চাকুরে জায়গীরদার থাকলেও স্থায়ী জমিদারও ছিল সাধারণভাবে হিন্দুরাই। স্মর্তব্য যে মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু ইজারাদার ও পদস্থ হিন্দু চাকুরে সৃষ্টি করে পরিণামে হিন্দু জমিদারের ও ধনীহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বাঙলার বড় পনেরোটি জমিদারীর মধ্যে দুটো এবং ছোট একুশটি জমিদারীর মধ্যে দুটো ছিল মাত্র উর্দু-ভাষী মুসলিমদের হাতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অন্য চাষীর সঙ্গে মুসলিম চাষীরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, আর উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আয়মা-লাখরাজ-ওয়াকফ সম্পত্তি হারিয়ে কিছু সংখ্যক মুসলিম ভদ্র পরিবার আকস্মিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রেও দেশের মুদ্রানির্ভর শিল্প-বাণিজ্য ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় দেশের মানুষের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই নতুন অর্থে, বিত্তে, বিদ্যায় ও চাকরিতে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে—যা বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূরণ করার জন্যে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে প্রয়াসী হয়।

৯. ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার ফলে ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণে

মহাজন ও দুর্ভিক্ষ-কবলিত চাষীরা বাঁচার তাগিদেই মরিয়া হয়েই স্থানিকভাবে তাৎক্ষণিক উত্তেজনাবশে কখনো কখনো বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এভাবে এবং কালান্তরে নানা কারণে যে-চেতনা সঞ্চারিত হয়, শোষণ ও স্বাধিকার সম্বন্ধে যে-অস্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে থাকে এবং পরে পরে শহরে লোকদের মধ্যে প্রতীচ্যশিক্ষা প্রভাবে যে স্ব-ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ জাগে, তাতেই জমিদার-মহাজনকে শোষকশ্রেণী রূপে চিহ্নিত না করে ব্রিটিশের পরোক্ষ প্ররোচনায় ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামকে লক্ষভ্রষ্ট করা হয়। ফলে হিন্দুরা শোষক জাতি ও মুসলিমরা বাঙালায় শোষিত জাতি হিসেবে পরস্পর সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষবাষ্পে আত্মহনন করছিল।

এবার সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই: কোম্পানী আমলের শেষাবধি সুবাহ-ই-বাঙ্গালার তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর গাঁয়ের-গঞ্জের মানুষের মানস-জীবনে কিংবা সামাজিক সংস্কারে ও রীতি-রেওয়াজে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কোম্পানীর নতুন ভূমিব্যবস্থার ও বাণিজ্যনীতির প্রভাবে তাদের আর্থিক জীবনে আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয় ঘটে। কেবল কোলকাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাই বানিয়া-ফড়িয়া-গোমস্তা-চাকুরেরূপে বিত্তে এবং পরে বিদ্যায় প্রবল হয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের সহযোগীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এ সময়কার কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা উৎকোচ-উপঢৌকন গ্রহণে ও অন্য অসদুপায়ে অর্থোপার্জনে ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সহযোগী—এ সুযোগ কোল-কাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও পেয়েছিল। কোম্পানীর শোষণের ও দেশী প্রশাসক-ভূস্বামীর পীড়ন-শোষণের ক্ষতি ও দুর্ভোগ বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই ভোগ করেছে। দেশজ মুসলমানরা সাধারণভাবে নিরক্ষর, দরিদ্র ও বৃত্তিজীবী এবং প্রান্তিক চাষী ছিল শূদ্র-সদ্‌গোপ হিন্দুদের মতোই। কোলকাতার কোম্পানীর সহযোগী ও চাকুরে স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ব্যতীত জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই জমিদার-মহাজনের শোষণে এবং কুটিরশিল্প-বিধ্বংসী কোম্পানীর আমদানীকৃত পণ্যের চাপে দারুণ জীবিকাসংকটে পড়ে।

কিন্তু ১৮১৮ সন অবধি কোলকাতার বিত্তবান লোকেরাও প্রতীচ্য মানসের অধিকারী হয়নি, তার প্রমাণ এর আগে অর্ধশতক ধরে কোম্পানীর রাজত্বে থেকেও তারা ইংরেজী শিক্ষার কিংবা সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। বিদ্যা ও বিত্ত একে অপরের পরিপূরক ও নামান্তর হল উনিশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তখন বিদ্বান হলেই প্রশাসক ও বিত্তবান হয়ে উচ্চ-বিত্তের সংস্কৃতিবান সমাজ-সদস্য হওয়া যেত। এ সময়েই বিদ্যায় ও বিত্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বিপুল-কলেবর হয়ে ওঠে।

আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে ১৮৭০ সন অবধি মুসলিম সমাজ কোলকাতায় কোম্পানী বিতরিত অর্থ-বিত্তরূপ কৃপা মোটেই পায়নি। কোম্পানীর বাণিজ্যগদীর কোন চাকুরেই—গোমস্তা-বানিয়া-ফড়িয়া-সেবন্দী—মুসলমান ছিল না (যদিও আটজন ইংরেজের ব্যক্তিগত আট জন মুসলিম মুনশীর বা গোমস্তার নাম পাওয়া যায়)। কোম্পানীর বাণিজ্য ও শাসনকেন্দ্র কোলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই ছিল শিক্ষিত মুসলিম অধ্যুষিত দিল্লী-আগ্রা-মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে। তাই বাঙালী-অবাঙালী কোন মুসলমানই হিন্দু-আকীর্ণ কোম্পানীর সদাগরী অফিসে পরেও ঠাঁই করে নিতে পারেনি। তাই বলতে গেলে আঠারো-উনিশ শতকের সুবাহ-ই-বাঙ্গালায় মুসলমানরা কোম্পানীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসম্ভূত কাঁচা পয়সার কপর্দকও পায়নি—পেয়েছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা চাকুরে ও ব্যবসায়ীরূপে। একে বিশ শতকের শিক্ষিত ক্ষুব্ধ মুসলমানরা ব্রিটিশ-হিন্দুর সুপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রজাত বঞ্চনা বলে জেনেছে—ভুল ধারণার ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের উৎস এ-ই।

আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে ১৮৭০ সন অবধি প্রশাসনিক, শৈক্ষিক প্রভৃতি নানা ব্যাপারে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ ও অভিমত গ্রহণ করত কোম্পানী সরকার। জমিদার-ব্যবসায়ীরাই দিত এ পরামর্শ ও অভিমত। এসময়ে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেছেন কোলকাতায়, তাঁরা কেউ বাঙালী ছিলেন না, তাঁদের সঙ্গে দেশজ ও গ্রামীণ বাঙালী মুসলমানের ভাষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি বৈষয়িক যোগও ছিল না, তাঁদের আত্মীয়রা আগেই উত্তর ভারতে স্থিরত করেছিল, নানা কারণে যাঁরা এখানে আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা তাই বাঙালী মুসলিমদের প্রয়োজনের কথা, দাবির কথা হিন্দুদের মতো বলতে পারেননি—জানতেন না বলেই এবং জানার গরজ-বোধও করেননি বলেই। ১৮৩০ সনের আগে ওয়াহাবীরাও ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল না। কাজেই গোটা কোম্পানী আমলের একশ' বছর ধরে মুসলমান মাত্রই ছিল প্রতীচ্য কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রভাবপ্রসূত দ্রুত পরিবর্তমান আর্থিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনভাবনার

ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ও বঞ্চিত।—এ ব্রিটিশ-হিন্দুর ষড়যন্ত্র সঞ্জাত নয়—ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক প্রতিকূলতাপ্রসূত।

গোড়া থেকেই প্রশাসনে ও পণ্যসংগ্রহে ব্রিটিশ কোম্পানীর সহযোগী ও ব্রিটিশ কৃপাপুষ্ট হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের দয়ায় দান বলে জানল ও মানল মোটামুটি হিন্দুমেলার (১৮৬৭) পূর্বাবধি। আর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ও কিছুটা ব্রিটিশ-প্ররোচনায় স্বকালের বাস্তব জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে অপস্রয়মাণ ও অপসৃত পূর্বশাসকগোষ্ঠী তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী নির্বিশেষ মুসলমানের প্রতি—বর্তমানে অমূলক অপ্রয়োজনীয় হলেও—বিদ্বেষচেতনা জিইয়ে রাখা শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে নীতি-নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসী জাতীয়তাবোধের উন্মেষ মুহূর্ত অবধি। আবার এ সময় থেকেই (১৮৭০—১৯১৮) অবাঙালী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬—১৮৩১), স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭—১৮৯৮) ও ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলিমরাও হিন্দুবিদ্বেষবশে ব্রিটিশ শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে ভাবতে থাকে। অতএব, প্রথম একশ' বছর (১৭৬৫—১৮৬৬) হিন্দুদের এবং শেষ আটচল্লিশ বছর (১৮৭০—১৯১৮) খেলাফৎ আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিংবা ১৯৪৭ সন অবধি মুসলিমদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য পেয়েছে ব্রিটিশ। এবং এ পুরো কালপরিসরে হিন্দু-মুসলিম পরস্পর ছিন্ন মানস এবং কথনো কখনো সক্রিয় দ্বেষ-দ্বন্দ্বের শিকার। উনিশ শতকে হিন্দুরা কেবল হিন্দু-ঐতিহ্যের স্মরণে ও অনুশীলনে আধুনিক হিন্দুজাতি গড়ে তোলার সাধনা করেছে, মুসলিমরাও জাতিসত্তার সংরক্ষণ লক্ষ্যে কেবল দেশ-কাল নিরপেক্ষ মুসলিম-ঐতিহ্য ও ইসলাম-চেতনা আশ্রয়ী থেকে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। হিন্দু-মুসলিমের সাহিত্যাদি রচনাই তার প্রমাণ।

বাঙালী হিন্দুর সুবিধা ও সমস্যা

বাঙলা-বিহার-ওড়িশা নিয়ে গঠিত সুবাহ-ই-বাঙ্গালা ব্রিটিশ আমলে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' নামে হল পরিচিত। এর মধ্যে বাঙালী মুসলিমরা উনিশ শতকে ধর্মীয় জাতিসত্তা সম্বন্ধে যতই চেতনা লাভ করতে থাকে, ততই তার স্বধর্মীর ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যগর্ব যেমন একদিকে বাড়তে থাকে, অপরদিকে শিক্ষা-সম্পদ-চাকরি ও আর্থিক ক্ষেত্রে নিজেদের হীনাবস্থার জন্যে ব্রিটিশের ও হিন্দুর দুশমনীকে দায়ী করে নিষ্ক্রিয় বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করতে থাকে।

✓ বাঙলার বর্ণহিন্দুরাই ঐতিহাসিক যুগে দেশের শিক্ষা-সম্পদের ও অর্থ বিত্তের মালিক। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের অনেকের মধ্যে জীবিকার প্রয়োজনেই সাক্ষরতা চালু ছিল বলে মনে করা হয়, যদিও কোন কোন বর্গের কিছু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে শাস্ত্রীয় উচ্চশিক্ষা চিরকালই ছিল দুর্লভ। সে-যুগের রাজকার্যে ও বৈষয়িক জীবনে কাঠাকালি-মণকিয়া-পণকিয়া অবধি জ্ঞান থাকলেই সাধারণের কাজ চলত। সংস্কৃত ও ফারসীশিক্ষিত লোকেরাই সমাজে প্রাধান্য পেত।

দেশের জমিজমা ধন-সম্পদ যেমন বর্ণহিন্দুদের অধিকারে ছিল, তেমনি রাজস্ব আদায় প্রভৃতি প্রশাসনিক কাজ গোড়া থেকে তাদেরই একচেটিয়া ছিল। অভ্যন্তরীণ খুচরো ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল তাদের হাতে। ইকতাদার-লস্কর উজির-ফৌজদার-কাজী-বক্সী প্রভৃতি মুসলিম প্রশাসকদের জায়গীর প্রভৃতি ছিল বটে, তবে তাঁরা বিদেশী ছিলেন বলে তাঁরা জমির সাময়িক মালিক ছিলেন মাত্র।

জমিদার-ইজারাদার-তালুকদার-তরফদার-হাওলাদার-দেওয়ান-মজুমদার-খাশু-শীর-দস্তিদার-ওহেদাদার-নায়েব-গোমস্তারা ছিল সাধারণভাবে হিন্দুই। কাজেই উজির-লস্কর-ফৌজদার-মনসবদার-আমীর প্রভৃতি পদ সাধারণভাবে বিদেশী মুসলমানরাই পেত বটে, আর দেশী মুসলিমরা সাধারণভাবে কাজী-উকিল-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার প্রভৃতি হত বটে, অন্য সব কাজ ও পেশা ছিল দেশী হিন্দুর অধিকারে।

এ কারণেই গোড়া থেকেই য়ুরোপীয় কোম্পানীর ব্যবসার সহায় ছিল দেশী হিন্দুরাই। গোটা সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তা-ফড়িয়া মাত্রেই ছিল হিন্দু। এমনকি সেবন্দীরাও ছিল প্রায় হিন্দু। কাজেই পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে মুসলিম সামরিক ও বিচারক কর্মচারীদেরই পদচ্যুতি ঘটে, এবং এদের অধিকাংশই অবাঙালী। এসব পদে বাঙালীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। অতএব পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে চাকরিক্ষেত্রে দেশী মুসলিমের সর্বনাশ হয়নি। আয়মা লাখরাজ ওয়াক্ফ-সম্পত্তি হারিয়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয় ১৮২৮ সনের পরে। এদেরও সবাই দেশজ মুসলমান ছিল না। রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩) রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭) প্রমুখ যখন প্রশাসনিক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে হিন্দুর পক্ষে কথা বলছেন, তখন মুসলমানের স্বার্থে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁদের একজনও

বাঙলাভাষী দেশজ বাঙালী ছিলেন না। বস্তুত বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি দেশজ বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিদেশাগতদের বংশধর উর্দু ভাষী সামন্ত ও চাকুরেরা—যাঁদের সঙ্গে দেশী মুসলমানের কোন সামাজিক সম্পর্কই ছিল না। এ কারণেই ১৭৬৫ থেকে ১৮৬০ সন অবধি সরকার ও মুসলিম সমস্যা সম্বন্ধে কোন তথ্য আমরা পাইনে, যেমন পাই সরকার ও হিন্দু প্রজা সম্পর্কিত নানা তথ্য। অথচ সেকালের বিচার, শাসন, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি সরকারী সব বিষয়েই প্রয়োজনবোধে সরকার হিন্দুর ও মুসলমানের মতামত ও পরামর্শ জানতে চেয়েছে। আজ আমরা সেইসব মুসলিম নেতার নাম ও কৃতির কিছুই জানি না। ফারসী দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে তাঁদের ভূমিকা নিশ্চয়ই জানা যাবে। সে কাজ আজ অবধি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে করেননি। তাই আমরা ১৭৬৫ থেকে ১৮৬০ সন অবধি সবক্ষেত্রে কেবল হিন্দু ও ইংরেজদের দেখি, মুসলিমদের খুঁজে পাইনে। ফলে মুসলমানরা কেবল বঞ্চনার জ্বালাবোধ করে, নিজের ঘরের খবর জানে না বলে অনেক কাল্পনিক সম্পদ, সুযোগ ও অধিকার হারানোর ক্ষোভ ও বেদনা বহন করে।

মুঘল আমলে মুসলিম জমিদার-তালুকদার ছিল নগণ্য সংখ্যক। বীরভূমের জমিদারই ছিল সবচেয়ে বড়ো মুসলিম জমিদার, অন্যরা—দিনাজপুরের, কৃষ্ণনগরের, নাটোরের, বর্ধমানের, বিষ্ণুপুরের সামন্ত জমিদাররাই ছিল বাঙলার অধিকাংশ ভূমির মালিক। ১৭৯৩ সনের ভূমি-ব্যবস্থায় বা তৎপূর্বে সূর্যাস্ত-আইনে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হল অধিক সংখ্যায় হিন্দু জমিদারই (বিশেষ করে, বর্ধমানের, দিনাজপুরের ও রাজশাহীর)। তবে তাদের সান্ত্বনা এই নিলামে বিক্রিত জমিদারী যারা ক্রয় করল তারাও ছিল হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা ও কোলকাতার কাঁচা পয়সাওয়ালা বানিয়া-কড়িয়ারাই। কেবল ছুটো বড়ো জমিদারী ক্রয় করল দুই বিদেশী—ইংরেজ ও মুসলমান। ফলে হাতবদল হল বটে, বর্ণহিন্দুর হাতেই রইল সম্পদ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুণ্ঠন-শোষণমূলক নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য নীতির ও ভূমি-ব্যবস্থার ফলে যারা নিঃস্ব, বেকার কিংবা দরিদ্র হল, তারা ছিল দেশের বৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষ—ভদ্র গৃহস্থ, কৃষক ও বৃত্তিজীবী কুটিরশিল্পী—বিশেষ করে তাঁতী—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। কেননা গুরুত্বে কৃষির পরেই ছিল তাঁতশিল্প। কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা কোম্পানীর ও সরকারের কাজে যোগ

দিয়ে ও খুচরো ব্যবসা করে অসদুপায়ে আশাতীত অপরিমেয় অর্থ সহজে অর্জন করছিল, এবং যেহেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যতীত আর কাউকেই তারা স্বজাতি বলে ভাবত না, সেহেতু দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুর ও মুসলিমদের দুর্দশায় তাদের কোন সহানুভূতি বা বিচলন ছিল না।

ফলে তারা তখন কামধেনুস্বরূপ কোম্পানী-প্রভুর জয়গানে মুখর, কৃপা-লোভে অনুগত, দয়ায় দানে ও প্রশ্রয়ে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সন অবধি কোলকাতার সচ্ছল বর্ণহিন্দুর সুখের-আনন্দের-আকাঙ্ক্ষার এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ও কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। অথচ এ সময়ে দেশের গণমানব খরা-বন্যা-ঝঞ্ঝা-মহামারীর শিকার হয়ে জানে-মানে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। পরিবার ও গ্রাম হচ্ছিল উজাড়। আর রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবং কুটির-শিল্পের বাজার মন্দা কিংবা বন্ধ হওয়াতে গণমানব দ্রুত দারিদ্র্যের, নিঃস্বতার, বেকারত্বের ও দুর্ভিক্ষের শিকার হচ্ছিল। ১৭৯৩ সনে সরকার ভূমি-রাজস্ব পেত তিন কোটি, ১৮৮৬ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় আঠারো কোটি টাকা। ভূমি-রাজস্ব কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ষাট ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাছাড়া তুলা, রেশম, লবণ এবং ১৮৩৪ সন থেকে চা, কফি, নীল প্রভৃতির বাজার কোম্পানীর ও সরকারের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হত। ১৮৩৫ সনে Transit করও তুলে দেয়ার ফলে বিলেতের কলে তৈরী পণ্য এখানকার বাজার ছেয়ে ফেলে। ১৮৪০ সনে মণ্টেগোমারী মার্টিন স্বীকার করেন যে 'We have during this period (upto 1840 A. D) compelled the Indian territories to receive our manufactures, our woolen duty free, our cottons at 2½ p.c. while we have continued during that period to levy prohibitory duties from 10 to 100 p.c. upon articles they produce from our territories...a free trade from this country not a free trade between India and this country' আবার যখন পার্সীরা উনিশ শতকের শেষ দশকে বোম্বেতে, আহমদাবাদে কাপড়ের কলাদি শিল্প কারখানা স্থাপন করে, তখন ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্য চালানোর জন্যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৪ ও ১৮৯৭ সনে কর বসিয়ে দেশী শিল্প প্রসারের পথ রোধ করে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে এবং পরেও বাঙলাদেশ প্রতি তিন-চার বছর অন্তর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে, লোক মরেছে লক্ষে লক্ষে। তাছাড়া

আঞ্চলিক মহামারী তো ছিলই। ১৭৬৯ সনের পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ ছাড়াও প্রতি ৩/৪/৫ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ হয়েছে আঠারো শতকেও। তাছাড়া দেশী মুদ্রা-বিনিময়-মানেও ঘটেছে ঘন ঘন পরিবর্তন, যার ফলে কৃষকরা, বৃত্তিজীবীরা ও ক্ষুদ্র বেনেরা হয়েছে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৮৩২ সনের কটকের বন্যা, ১৮৬১ সনের উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৬ সনের ওড়িশার দুর্ভিক্ষ, ১৮৮৫ সনের বীরভূম-নলহাটির দুর্ভিক্ষ, ১৮৮৭ সনের ত্রিপুরার এবং ১৮৮৮ সনের ঢাকার, ১৮৯২ সনের চব্বিশ পরগনার, ১৮৯৩ সনের বিক্রমপুরের, ১৮৯৪ সনের মাদারীপুরের এবং ১৮৯৭ সনের টাঙ্গাইলের দুর্ভিক্ষও নিতান্ত আঞ্চলিক ও সামান্য ছিল না।

যেহেতু সমাজে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক তথা জীবিকাগত ও মানসিক পরিবর্তন আসে উৎপাদনসম্পৃক্ত হাতিয়ারের উৎকর্ষে বা পরিবর্তনে এবং যেহেতু আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে হাতিয়ারের কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন আসেনি এবং যেহেতু বিদেশী শাসক তাদের হাতিয়ার ও কৃৎকৌশলজাত পণ্যের বাজার হিসেবে এখানে জবর-দখল চালায়, সেহেতু আমাদের দেশের গণমানবের জীবনে সমাজে ও আর্থিক ক্ষেত্রে কেবল অবক্ষয়ী বিপর্যয়ই ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে শাসক-সহযোগীর একটা লুটেরা শ্রেণী গড়ে উঠল, যারা প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি কৃত্রিমভাবে আয়ত্ত করে জাতিদ্রোহীর ও কৃপাজীবীর সুখী শহুরে সমাজ গড়ে তুলল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ সনের মধ্যে এদের অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতাপ নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন ছিল। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮২ সনের মধ্যেই সূর্যাস্ত-আইনের বদৌলত বাঙলার দুই-তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা কোম্পানীর বানিয়া-কড়িয়ার হাতে চলে যায়। ১৭৫৭ সন থেকে ১৭৮৬ সন অবধি কোলকাতায় (ইংরেজদের) ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুরাই—মুখার্জী-ব্যানার্জী-শর্মা-ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা এবং দত্ত-মিত্র-ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থরা ও সেন প্রভৃতি বৈদ্যরা। বেনিয়া বা বানিয়ারা ছিল কোম্পানীর দোভাষী, প্রধান হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারী, প্রধান দালাল, অর্থের যোগানদার ও খাজাঞ্চি। আঠারো শতকের শেষার্ধে যাঁরা কোম্পানীর বানিয়া হিসেবে অর্থ-বিত্ত ও মান-যশ অর্জন করে সমাজে প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার করেন তাঁরা হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ রায়, গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হিদারাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জী, রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তমুদী) প্রভৃতি। এ-সময়ে

বাণিজ্য জাহাজের মালিক হলেন পাচুদত্ত, রামগোপাল মল্লিক, মদন দত্ত ও রামদুলাল দে। বলতে গেলে উনিশ শতকের প্রথম পাদের দিকেই তারা ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে যায়। কারণ লর্ড কর্নওয়ালিস দেশী বানিয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশ বানিয়াদের agent নিযুক্ত করায় এবং ব্যাঙ্ক-ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করায় দেশী ব্যবসায়ীরা পুঁজি দিয়ে জমি কেনা শুরু করে। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সুযোগ দিয়ে ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে দেশী প্রতিদ্বন্দ্বী বিতাড়নও নতুন ভূমি-ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কর্নওয়ালিসের উক্তি থেকে তা জানা যায়—'ভূমি-ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের আশ্বাস পেলেই দেশী লোকেরা ভূ-সম্পত্তিতেই পুঁজি খাটাবে।' চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তে প্রজারা শুধু করভারে পীড়িত হল না—ভূমিদাসেই পরিণত হল। মুঘল আমলে কোন অবস্থাতেই জমির উপর প্রজা-স্বত্ব ক্ষুন্ন হত না। খাজনাও বৃদ্ধি করা যেত না। আবার ১৮৩৩ সন থেকে ডেপুটি কালেক্টর ও ১৮৪৩ সন থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করে বাবুদের কোম্পানী সরকার নতুন পথে কৃপা বিতরণ শুরু করে। উচ্চপদের দ্বার এভাবেই হল উন্মুক্ত। তবু আই-সি-এস পদে নিযুক্তির জন্যে ১৮৫৩ সনে আইন হলেও কার্যকর করতে ১৮৬১ সন এল। এতে বাবুদের মর্যাদা সামন্তদের প্রায় সমানই হয়ে গেল।

শিক্ষার প্রসারের ফলে হিন্দুসমাজে চাকরি ও অনুগ্রহপ্রার্থীর সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, সরকারের পক্ষেও তখন যথেচ্ছ প্রসাদ বিতরণ অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন থেকে—মোটামুটি ১৮৬৫ সনের পর থেকে, হিন্দুসমাজে ব্রিটিশ-বিরূপতা লঘু ও মন্থরভাবে দানা বাঁধতে থাকে। সে বিষয় পরে আলোচ্য। আলোচ্য সময়ে দেশের কৃষক ও বৃত্তিজীবী গণমানবের অবস্থার সহ্যাতীত-ভাবে অবনতি ঘটেছিল। নতুন জমিদারেরা ও তাদের গোমস্তারা কেবল খাজনা বাড়িয়ে সন্তুষ্ট থাকত না, আবওয়াব, সালামী, বাট্টা, খিয়াদার, মান-শুণ, বেগার, ফরমাস, পার্বণি, ভিক্ষা, বিয়ের কর (জুড়ি কর), অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বিয়ে প্রভৃতি উপলক্ষে নজর চাঁদা এমনকি দাড়ি-কর অবধি নানা অজুহাতে-অছিলায় প্রজাকে শোষণ করত—সবটারই অনুষঙ্গ ছিল হুকুম, হুমকি ও পীড়ন। অসহ্য হলে দেয়ালে পিঠ করে দুঃস্থ মানবতা বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত আর পরিণামে জানে-মালে হত সর্বস্বান্ত।

উত্তর ভারতীয় সৈনিক দিয়ে গঠিত 'বাঙালী পল্টন' যখন ভেঙে দেওয়া

হল তখন মিথিলা-বেনারসের বিক্ষুব্ধ বেকার সৈনিক মজনু শাহর (মৃঃ ১৭৮৭) ও ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে প্রাক্তন ও বেকার সৈনিকরা (স্ব-ভূমি বিহার-ওড়িশা বাদ দিয়ে) বছরে একবার বাঙলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুট করতে আসত। এরাই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহী নামে পরিচিত। লুটের সময়ে স্থানীয় লোকও তাদের সঙ্গে জুটে যেত। ১৭৭০ (১৭৬০ ?) থেকে ১৭৯০ (৯৭ ?) সন অবধি এরা কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে দস্যু-বৃত্তি চালিয়েছে।

এ সময়ে প্রধান কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ১৭৮৩ সনে রঙপুরে, ১৭৮৯ সনে বিষ্ণুপুরে, মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, বারাসতে, ফরিদপুরে, ঢাকায়, সাঁওতাল পরগনায় এবং ১৭৯৫—৯৯ সনে ঘটে চোয়াড় বিদ্রোহ। আবার ১৮৩১ সনে তীতুমীর, ১৮৩৮—৪৭ সনে দুদুমিয়া, ১৮৫৫ সনে সাঁওতালরা, ১৮৫৮/৬০/৬২ সনে নীল চাষীরা বিদ্রোহ করে। পাবনা-বগুড়ায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটে ১৮৭২/৭৩ সনে। এগুলো ছিল কখনো স্বতস্ফূর্ত, কখনো বা কারো নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত। কিন্তু সবগুলোই ছিল স্থানিক ও তাৎক্ষণিক। ১৭৭২—৮০ সনের মধ্যেও জমিদারবিদ্রোহ ঘটেছিল কয়েকটি। কাজেই ব্যর্থ হলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ ও বিদ্রোহ গাঁয়ে-গঞ্জে ছিলই সব সময়।

এবার ভদ্রলোকদের কথা বলি। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা নিজেরাই একটা জাতি। শূদ্র-সদ্গোপদের তারা নিজেদের সমাজভুক্ত বলে কখনো মনে করেনি। এই বর্ণহিন্দুরা চিরকালই শাসকদের সহযোগী-সহকারী হিসেবে, সচ্ছল গৃহস্থ কিংবা সামন্ত হিসেবে অথবা সাক্ষর কর্মচারী হিসেবে ছিল সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত ও সমাজ নিয়ন্ত্রক। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে যেমন, ইংরেজ আমলেও তেমনি তারাই ছিল সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা-ভোগী। হাঁটা পথে যারা কোলকাতায় আসতে পারত, তারাই অর্থাৎ হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, বধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকই পলাশী যুদ্ধের আগে ও পরে কোলকাতায় কোম্পানীর কাজে যোগ দেয়। সাধারণ মুসলিমদের দুর্ভাগ্য এসব অঞ্চলে তাদের সংখ্যা ছিল কম। তা ছাড়া কোম্পানী-সৃষ্ট কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ শহর ছিল মুঘল-সৃষ্ট শহরগুলো থেকে দূরে। মুসলমানরা পরে এসে দেখে ঠাঁই নেই তাদের, হিন্দুরা সব দখল করে নিয়েছে আগেই। শিক্ষিতলোকের অর্থ-সম্পদ অর্জনের পন্থা

চাকরি নিয়েই তাই সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শুরু উনিশ শতকে।

স্মরণ্য যে, কোম্পানী-আমলের প্রথম পঞ্চাশ বছরে (১৭৬৫—১৮১৫ খ্রীঃ) য়ুরোপীয়দের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রসারে কাঁচা টাকার স্ফীতি ঘটে আর ভূমি-রাজস্ব নীতির ফলে সুবাহ-ই-বাঙ্গালার সর্বত্র গাঁয়ে গঞ্জে গার্হস্থ্য জীবনে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু প্রতীচ্য প্রভাব তখনো কোলকাতার বাইরে তো নয়ই—কোলকাতায়ও ছিল দুর্লক্ষ্য, রামমোহনের কোলকাতা বাসের (১৮১৫) পূর্বে। মানুষের মনোলোকে তখনো নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগ চলছিল। এসময়-কার কোলকাতা ছিল কেবল অর্থ-বিত্তবানদের দর্প-দাপটের ও বিলাসলীলার স্বর্গলোক। আঠারো শতকের অরুণোদয়কালে কোলকাতায় ইংরেজীভাষা শিক্ষার শুরু এবং হিন্দু কলেজে তার পূর্ণতা—ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রই কোলকাতাবাসীকে প্রতীচ্য জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় দীক্ষা দেয়। ১৮৪৩ সনে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে কিংবা ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) শিষ্যদের বয়স্থ হবার আগে প্রতীচ্যরুচি আয়ত্ত হয়নি কারো। তাই অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবেই কেবল প্রতীচ্য মানসের সংস্কৃতিবান মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে কোলকাতায়। ১৮৬০ সনের পূর্বেকার ভুঁইফোড়দের জীবনের ও আচরণের অসঙ্গতির চিত্র মেলে নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, কলিকাতা কমলালয়, আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়, হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রভৃতি পুস্তকে।

অতএব, কোলকাতায় বিত্তের সঙ্গে প্রতীচ্য বিদ্যার ও রুচির সংযোগ ঘটতে থাকে ১৮২০ সনের পরে এবং প্রতীচ্য আদলে শিক্ষিতের ও সংস্কৃতিবানের সমাজ স্থিতি পায় ১৮৫৭ সনের পরে। এসময় থেকে কোলকাতার বাইরে ও শহরে শহরে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। কাজেই এই অর্থে য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি মন-মনন এদেশে আসে কোম্পানী আমলের অবসান মুহূর্তে। রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩) অবশ্যই ব্যতিক্রম। ত্রিশের ও চল্লিশের দশক ছিল এর বীজ উপ্ত হওয়ার কাল।

মনিবের মন যোগানোর জন্যে হিন্দুরা ইংরেজী ভাষাও আয়ত্ত করার চেষ্টা করে গোড়া থেকেই। দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী যখন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন কোলকাতায় শাব্দিক ইংরেজী শেখা-শেখানোর ধুম পড়ে

গেল। ইংরেজী ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে ও দর্শনে কোম্পানী আমলের প্রথম অর্ধ শতাব্দীতে প্রথম ও প্রধান শিক্ষিত ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কোম্পানীশাসন কালে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মন-মননের ও সমাজ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক পরিচয় ও তজ্জাত সমস্যা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। যেহেতু প্রতীচ্য-প্রভাবিত তাঁর নতুন চিন্তা-চেতনা ছিল পড়ে-পাওয়া,—দৈশিক প্রয়োজনে আত্মোত্থিত নয়, সেহেতু তাঁর সমাধান ছিল কিছুটা কৃত্রিম ও অসমঞ্জস। খ্রীস্টান ধর্মের ও সমাজের মোকাবেলায় তাই তিনি মেরামতের মাধ্যমেই তাঁর বিত্তবান শিক্ষিত-শহুরে স্বধর্মীকে য়ুরোপীয় আদলে আধুনিক করবার পথ খুঁজে নিলেন। খ্রীস্টান হওয়ার পথ রোধ করলেন বটে, কিন্তু বেদ-উপনিষদ-বাইবেল-কোরআনের কোনটাই তাঁর নবমতের ভিত্তি দৃঢ় করল না। কারণ তিনি দ্রোহী নন—ভাঙার জন্যে নয়, রাখার জন্যেই করলেন আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য চেতনার সংযোগ। সংস্কারকমাত্রেই মূলত রক্ষণশীল, পুরাতনকে ভালোবাসেন বলেই তাকে মেরামত করে নতুন বাহ্যাকার দিয়ে রঙের ও রূপের জৌলুস সৃষ্টি করে কেজো ও সচল করাই সংস্কারের লক্ষ্য,—তাই পুরোনো পরিহারে তাঁর অনীহা এবং নতুনকে পুরোপুরি গ্রহণে সংকোচ। দেবেন ঠাকুর-কেশব সেন-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তাই ব্রাহ্মমত শাস্ত্রীয় কিংবা জনপ্রিয় করতে পারলেন না। কাজেই ব্রাহ্মমত রেনেসাঁস প্রসূত নয়—শঙ্কাসঞ্জাত বিচলনজাত।

রামমোহনের রক্ষণশীলতার প্রমাণ—তিনি নৈতিক আবেদনে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন—আইনবলে নয়। তাই আইন হওয়ার পর তিনিই লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে পত্রযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া রামমোহন তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ছিলেন স্বশ্রেণীরই হিতকামী চিন্তানায়ক, ভিন্ন-শ্রেণীর মানুষের সমস্যামনস্ক বা সচেতন ছিলেন না তিনি।

বিলেত যাবার সময় গরু, রসুই বামুন ও পৈতে নেয়া তাঁর গোঁড়ামি প্রদর্শন-প্রীতির আর এক নিদর্শন। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে অসদুপায়ে অর্থার্জন থেকে মদে মেয়েমানুষে আসক্তি প্রভৃতি সমকালীন ধনীলোকের সব দোষই তাঁকে স্পর্শ করেছিল, তবু রামমোহন ছিলেন সেকালের বাঙলায় অনন্য অসামান্য পুরুষ। তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালী যিনি সমকালীন য়ুরোপীয় রাজনীতিক ও মানবিক চিন্তা-চেতনায় একজন য়ুরোপীয় শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বুর্জোয়া নাগরিকের মতোই ছিলেন স্বচ্ছ। ১৮৬০ সন অবধি আমরা বাঙলায় তেমন বিশ্ব-

পথিক আর কাউকে পাইনে। দুনিয়ার ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল সমকালীন বাঙলায় অতুল্য। তিনি তাঁর সমকালীন য়ুরোপীয় সমাজের ও রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি বুঝতেন, সমকালীন মানবকাম্য সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাও তাঁর ছিল। রামমোহন আইনের শাসনে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ও নাগরিকের স্বাধীনতায় আস্থাবান ছিলেন। দেশীলোকের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না আশঙ্কায় তিনি আইন পরিষদ গঠনেরও বিরোধিতা করেন। শাসন ব্যাপারে দেশীলোকের মত প্রকাশের অধিকার লাভ লক্ষ্যে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও গুরুত্ব আরোপ করতেন। প্রশাসনে ত্রুটি-দুর্নীতি যাচাই করবার জন্যে তিনি গুণী-মানী ব্যক্তি নিয়ে কমিশন গঠনের প্রস্তাবও দান করেন। তাই রামমোহন স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উৎসব করেন, ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিপ্লবে আনন্দিত হন, এমনকি আজকের জাতিসঙ্ঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও স্বপ্ন দেখেন। স্বাধীনতা বিরোধী ও স্বৈরাচারী শাসকেও তাঁর ছিল ঘৃণা, স্বদেশে কিন্তু তিনি সবটাই স্বধর্মীর জন্যেও নয়, স্বকালের স্বশ্রেণীর (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের) বিত্তবান শিক্ষিত শহুরে লোকের জন্যেই ভাবতে ও করতে চেয়েছেন। তাই হিন্দুর ব্যাপারে আইন করবার আগে বর্ধমান, বিহার ও বারাণসীর রাজাদের এবং মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের, পাটনার বৈজুনাথের, বারাণসীর মোহনদাস প্রভৃতি প্রভাবশালী বণিকদের মত জানার জন্যে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। সামন্ত ও পুঁজিপতিরাই তাঁর মতে সমাজপতি। তাই যদিও তিনি ১৭৯৩ সনের ভূমিব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন আর চাষীর ও খেতমজুরের দুর্দশাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি এবং ১৮৩২ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি সব কথা বলেওছেন, তবু এক্ষেত্রে ঐকান্তিক চেষ্টা তিনি করেননি। চিন্তাবিদ মন্টেস্কু, ব্ল্যাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাব ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনায়—পড়ে-পাওয়া প্রভাব তাঁর বাকে-ব্যক্ত হলেও কাজে প্রকাশ পায়নি। আবার পরাধীনতা মন্দ জেনেও তিনি পরোক্ষে দেশে শাসকরূপে ব্রিটিশস্থিতি ও বসবাস কামনা করেছেন—'The greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs'. —যদিও এ ধারণা অবশ্যই যথার্থ। রামমোহনের কয়েকখানা পত্রেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষকালে অবশ্য এমনি দ্বিধা-

দ্বন্দ্ব ও চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতি থাকেই। লক্ষণীয় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৮১৭ সন অবধি কোলকাতার ভদ্রলোকেরা প্রতীচ্য-বিদ্যার বা মানসের প্রসাদ তেমন পায়নি, সংবাদপত্রের প্রয়োজনও তাই বোধ করেনি। রামমোহনই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

a. Ram Mohun says 'It is necessary that some change should take place in their (Hindu's) religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort'—letter written to James Silk Buckingham, Jan. 18. 1818.

b. Letter written to Minister of Foreign Affairs of France —'All mankiud are one great family. Hence enlightened men in all countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.'

c. Letter to Reformer (run by Prasanna Kr. Tagore) from London. '...Though it is impossible for a thinking man not to feel the evils of political subjugation and dependence on foreign people, yet when we reflect on the advantages which we have derived from our connection with Great Britain, we may be reconciled to the present state of things which promises permanent benefit to our posterity.' এইরূপ অভিমত অভিব্যক্ত হয়েছে Victor Jacquemont-কে লিখিত পত্রেও—'India requires many more years of English domination so that she might not have many things to lose' etc.

d. 'A class of society has sprang into existence, that were before unknown, these are placed between aristocracy and the poor and are daily forming a most influential class......it is a dawn of new Era—whenever such an order of men has been created......these middle class of inhabitants in Bengal, afford

the most cheering indication of any that exists at the present moment.' (Bengal Herald, June 13, 1829—Ram Mohun's article).

শাসিত হিসেবে বাঙালীর সঙ্গে শাসক ইংরেজের পরিচয় মুহূর্তে মিশনারীরা চেয়েছিল খ্রীস্টধর্মের মহিমায় বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়ে বশ করতে। কিন্তু কম বাঙালীই হল মুগ্ধ—শঙ্কিত হল অনেকেই। বহুদিন এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক চলেছে, তার প্রমাণ সেযুগে রামমোহনের, হিন্দু সনাতনীর, ইয়ং বেঙ্গলের ও মিশনারীর পত্র-পত্রিকায় রচনা ও গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার ডাফের স্বীকারোক্তি স্মর্তব্য : 'The prevalent idea seemed to be, that by fair means or foul—by bribery of magical influence—by denunciation or corporeal restraint—we were determined to force the young-man (Derozians) to become christians'. (Duff-Scottish Missionary and Educationist) 'Enquirer'-এ ডিরোজিয়োর বক্তব্যও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ইয়ং বেঙ্গলের সমর্থনে ও রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চারিত বাণী এই—'The bigots are in a rage, let them burst forth in a flame. Let the liberal voice be like that of the Romans. Roman knows not only to act but to suffer···If the opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom then desert a single inch of the ground we have possessed. A people can never be reformed without noise and confusion'.

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি এই বাদ-প্রতিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কোন্দল চলে বটে কোলকাতা শহরে, কিন্তু কোন পক্ষেরই কোন লাভ হয়নি। খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচার বন্ধ হয়েছিল সাম্রাজ্যিক স্বার্থে, ব্রাহ্মদেরও কথা শোনার লোক কম ছিল, ইয়ং বেঙ্গলও চল্লিশোত্তর জীবনে নিষ্ঠ ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান বা হিন্দু হয়ে গিয়েছিল, সনাতনীরাও হয়েছিল স্থির, কিছুটা সহনশীল ও গ্রহণমুখী। উনিশ শতকের শেষ পাদে কোঁৎ প্রভাবিত রামকৃষ্ণ পরমহংস কালীমাতায় ও সেবা-ধর্মে সমগুরুত্ব দিয়ে বরং ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায় হন। আর্য শাস্ত্র-সমাজ-সভ্যতাগর্বী বিবেকানন্দও (১৮৬২—১৯০২) ছিলেন নবব্যাখ্যা বিশোধিত, নব-

তাৎপর্য ও মহিমামণ্ডিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও আদর্শের উজ্জীবনকামী।

১৮৩৮ সনে ইংরেজী সরকারী ভাষারূপে চালু হলে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে অনেক স্থিতধী বাঙালী হিন্দুর আবির্ভাব ঘটে। তখন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্ত (১৮৪১)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয়কুমার দত্ত-বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনীতে যুক্তিযোগে নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। উচ্ছৃঙ্খল বলে নিন্দিত ইয়ংবেঙ্গলরা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও শ্রেয়স্কর চিন্তা-চেতনায় শ্রদ্ধেয়—এখন যিশুর বাণী বাদ দিয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্পৃক্ত অংশ ব্যতীত য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাই শিক্ষিত বাঙালীর মন হরণ করেছে। পড়ে-পাওয়া প্রতীচ্য চিন্তা-চেতনার অধিকারী এখন অনেকেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১ সন) ছিলেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী, জেদী, কর্মনিষ্ঠ এবং সংকল্পে ও সিদ্ধান্তে স্থির এবং সর্বোপরি নিঃসঙ্গ ও নির্দল। বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা ছিল ব্রাহ্মদের ও ইয়ংবেঙ্গলের প্রতি। কিন্তু সংকল্প ও আদর্শচ্যুতির ভয়ে নাস্তিক ও জেদী বিদ্যাসাগর তাদের সাহায্য-সহায়তা কামনা করেননি কখনো। শিক্ষাবিস্তারে, বহুবিবাহের ও বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ নারীর দুঃখমোচনে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিস্রুত রুচিশৈলীর ভিত্তি স্থাপনে ও নির্মাণে ছিলেন তিনি সদা নিরত। তিনি ছিলেন অবয়বে-পরিচ্ছদে বাঙালী, চিন্তা-চেতনায় শ্রেয়োবাদী ও মানববাদী নাস্তিক।

ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪ সন) ছিলেন মধ্যপন্থী। যদিও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, বর্ণসাম্যে, শিক্ষার মূল্যে, যুক্তিবাদে আস্থাবান, তবু আবেগ ও আগ্রহই তাঁর চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করত। তা ছাড়া তাঁর কথায় ও কাজে, যুক্তিতে ও বিশ্বাসে সঙ্গতি ছিল কম। যদিও তাঁর সদিচ্ছা ছিল সন্দেহাতীত।

প্রতীচ্যের বুর্জোয়ার উদার মানবতা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন স্বাধীনতাপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদ ও স্বাধিকার-চেতনা শিক্ষিত বাঙালীকে স্বাপ্নিক ও বাক্‌পটু করে তোলে। কিন্তু পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য ছিল তাদের অনায়ত্ত। তাই ফরাসী বিপ্লবের মর্মকথা তারা মুখে ব্যাখ্যা করত, কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত না, য়ুরোপের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তাদেরকে বিকৃতভাবে স্বধর্মীর

জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদের শাস্ত্রে ও আচারে বিজ্ঞান ও যুক্তিসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। অসামান্য মনীষাধর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং হলেন এ বিভ্রান্তি ও বিকৃতির শিকার। হিন্দু জাতিসত্তা নির্মাণে ও হিন্দুত্বের আদর্শ নিরূপণে বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেন, তাই বারোশ' থেকে উনিশশ' অবধি গোটা মধ্যযুগ হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অথচ ইয়ংবেঙ্গলদের জ্যোতিষ্ক রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫—১৮৬৮) বলতেন : 'He who will not reason is a bigot, he who cannot, is a fool, he who does not, is a slave.' তবু এ সমাজেই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৯৩২) প্রভৃতি নাস্তিক এবং অনেকেই প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) হয়েছিলেন। আসলে কোলকাতায় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির উদ্গাতা, যুগ প্রবর্তক ডিরোজিয়োর (১৮০৯—১৮৩১) প্রতীচ্য বিদ্যার প্রবর্তন মুহূর্তে শিক্ষকতাই ছিল অলক্ষ্যে সব কিছুর উৎস। তাঁর উচ্চারিত বাণীর অভিঘাতে ভক্ত ও বিরোধী উভয় পক্ষই জাগল, ভাবল এবং মননের ও কর্তব্যের ক্ষেত্র বেছে নিল। মাধবকৃষ্ণ মল্লিক [If there is anything that we hate from the bottom of our heart it is Hinduism], রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—১৮৫৮) [I do not believe in the sacredness of the Ganges] প্রভৃতি রুষ্ট, ক্ষুব্ধ বা আনন্দিত বাঙালীকে যুগান্তর সংবাদে আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। আবার বলি এটি রেনেসাঁস নয়—য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হল মাত্র। অনুকৃত সূর্যের আলোয় কিছুটা দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে ও অস্পষ্টতায় আত্মদর্শনের ও আত্মগড়নের আগ্রহ জাগল মাত্র। ইয়ংবেঙ্গলরা ছিল কোঁৎ, বেন্থাম, মিল ও অ্যাডাম স্মিথের ভক্ত। রামকৃষ্ণ (১৮৩৬—১৮৮৬) কোঁতের সেবাধর্ম প্রভাবিত আস্তিক ও তাঁর অধ্যাত্মবাদী শিষ্য বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু আর্য-হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকামী।

১৮৩১ সনে রামমোহন বিলেত গেলেন, তাঁর মৃত্যু হল ১৮৩৩ সনে। ডিরোজিয়ো পদচ্যুত হয়ে বেশীদিন বাঁচেননি, ১৮৩১ সনে হল তাঁর জীবনাবসান। কাজেই চতুর্থ দশকে দ্রোহী ও সংস্কারক ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মরা হল নিরবলম্ব। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে তবু স্থিতধী কিছু লোক পাওয়া গেল যাঁরা লঘু-গুরুভাবে সংস্কার আন্দোলন ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখলেন।

পার্থিনান (১৮৩০), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), হিন্দু পাইওনীয়ার (১৮৪২), বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪২), ইনকোয়ারার, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি যেমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেতুর কাজ করেছিল তেমনি অ্যাকাডেমি, এসোসিয়েশন (১৮২৮), জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রভৃতিও তারুণ্য ও তত্ত্বচিন্তা সচল রেখেছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬—১৮৫৭), দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী (১৮১৪—১৮৭৪), রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ (১৮২৫—১৮৯৪), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩) প্রভৃতি যেমন, তেমনি রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখার্জী, অক্ষয় দত্ত, দেবেন ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), রামনারায়ণ (১৮২২—১৮৮৬) বিদ্যাসাগর প্রমুখ এক মতের ও এক পথের না হলেও চিন্তা-জগতে তাঁরাই দিচ্ছিলেন নেতৃত্ব।

এদিকে সরকারের কাছে জমিদারদের আবেদন-নিবেদন জানাবার জন্যে কোলকাতায় গঠিত হল জমিদার সভা (১৮৩৭), ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি।

য়ুরোপীয় ইতিহাস-দর্শন পাঠের ফলে এবং ফরাসী বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কোলকাতার শিক্ষিত লোকেরা মাঝে-মধ্যে দু'-চারটা সরকারী অন্যায়ের কথা, শাসিতজনের দাবির কথা অনির্দেশ্যভাবে উচ্চারণ করতেন। রামমোহন থেকে তারও শুরু, জমিদার-রায়তদের কথা, শিক্ষার কথা, আইন-কানুনের ত্রুটির কথা, উচ্চতর পদে দেশীলোক নিয়োগের দাবি প্রভৃতি। কিন্তু সবকিছু ছিল প্রায় ব্যক্তিগত, সামষ্টিক দাবি বা আন্দোলনের পর্যায়ে যায়নি কোনটাই ১৮৬৫ সনের পূর্বে।

যেমন রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে 'Utter neglect of the rights of the humbler classes'. 'India under Foreigners' নামে দ্রোহের সুরে একদিন Hindu Pioneer পত্রিকা লিখল—'The people have no voice in the council of legislative, heavy taxation, monopoly of state services by the British deprivation of natives from share and service of the Govt.' transfer of wealth to England by service holders no commercial, no political benefits can authorise or justify.'

হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী (১৮২৪—১৮৬১) লিখেছিলেন ১৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে 'The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians'—এগুলো হচ্ছে নির্লক্ষ্য আদর্শিক উচ্চারণ। তার প্রমাণ, কেশবচন্দ্র সেন বলেন—'Let us all unite for the glory of India and England'. Sir Charles Trevelyan (1835—1840) বলেছেন—যেখানে দিল্লীবাসীরা ব্রিটিশ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখে, সেখানে বাঙালীরা সরকারী কাজে অংশীদার হয়ে তুষ্ট। নবগোপাল মিত্র (১৮৪০—১৮৯৪) সব সময় national চেতনার ও দাবির কথা বলতেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল'।

১৮৫৭ সনের ২৪শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর সেদিনই উত্তর ভারতীয় সৈনিকেরা ব্যারাকপুরে করল বিদ্রোহ। এতে কোন বাঙালী হিন্দুর সমর্থন ছিল না, বরং ব্রিটিশ উচ্ছেদের শঙ্কাবশে নিন্দা করেছেন ঈশ্বরগুপ্ত থেকে হরিশ মুখার্জী অবধি সবাই। তাই এ সময়কার উচ্চারিত সব বাঞ্ছা, দাবি ও আস্ফালন ছিল কোলকাতার শিক্ষিত বিত্তবান লোকের শখের ও শৌখিন রাজনীতির এবং সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল বলে পরিচিত হওয়ার পন্থা। কোনটাই ছিল না প্রয়োজন-বুদ্ধিপ্রসূত।

বলেছি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত কৃপাই পেয়েছিল 'বাবু' নামের ভদ্রলোক বাঙালী হিন্দুরা। তাই সিপাহী বিপ্লবে তারা ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বকামী। একশ বছরে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে-হারে কৃপা-কামীর সংখ্যাও বেড়েছে। কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না সবাইকে চাকরি দেয়া। কিন্তু কৃপা-প্রার্থীরা তা বুঝল না, তারা মনে করল সরকার কৃপার প্রবাহ অন্য খাতে চালিত করবার মানসেই তাদের বঞ্চিত করছে। এরূপ মনে করবার সামান্য কারণও ছিল।

সিপাহী বিপ্লবের অবসানে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাহায্যের ও প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতিস্বরূপ এবং হৃতবল ওয়াহাবী বিরূপতার অবসানকল্পে ভিক্টোরিয়া সরকার মুসলিমদের কৃপা বিতরণের নীতি গ্রহণ করল। সিবিলিয়ান W. W. Hunterকে দিয়ে প্রচারমূলক গ্রন্থও রচনা করাল, সে গ্রন্থের নামও ছিল আকর্ষণীয়—'The Indian Mussalmans—Are they bound in conscience to rebel against the Queen?' ১৮৬৯ সন থেকে বাঙলার মুসল-

মানরাও মন্থরগতিতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। অতএব ১৮৬০ সনের পর থেকে এবং ১৮৬৮ সনে ওয়াহাবী বিচারের অবসানে সৈয়দ আহমদ খানের প্রবর্তনায় শিক্ষিত মুসলিম মাত্রেই ব্রিটিশ আনুকূল্য লোভে ব্রিটিশানুগত্য কর্মে ও আচরণে প্রকাশ করতে থাকে। হিন্দুরাও অফিস-আদালতে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপ্রবেশের সুনিশ্চিত আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হল প্রায় অবচেতনভাবেই, বলা চলে সহজাত বৃত্তির প্ররোচনাতেই। তবু তা যতটা চিন্তা ও আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল, ততটা সক্রিয় ছিল না, কারণ তখনো তাদের একচেটিয়া অধিকারে হামলা আসন্ন ছিল না—তার জন্যে এক প্রজন্মকাল সময় প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত তখনো জমি-জমা, অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা ও ব্যবসায় তাদের হাতেই। কাজেই আশঙ্কা যতটা মানসিক, তার পয়সা-পরিমাণও বাস্তবে আপাতত ছিল না। তাই এবারও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ মূলক বাণী উচ্চারিত হলেও কণ্ঠে জোর ছিল না,—অভিযোগের, অনুযোগের ও আবদারের আকারেই করেছিল আত্মপ্রকাশ।

জাতীয়তার বা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ও মর্যাদার কথা গা পা বাঁচিয়ে বলার চেষ্টা হচ্ছিল। কারণ যারা কোলকাতায় এসব স্বদেশী-উত্তেজনা বোধ করত, তারা ছিল জমিদার বিত্তবান ব্যবসায়ী উচ্চবিত্তের ও মধ্যবিত্তের সচ্ছল-সুখী পরিবারের সন্তান ও স্বাধীন পেশার বা অবসরভোগী মানুষ। ভেতরে তাগিদ ছিল না, কারণ প্রয়োজন ছিল না, তাই জ্বালাও ছিল না, ফলে সাহসের দরকার হয়নি। ১৮৬৭ সনের 'হিন্দু মেলা' দিয়ে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুর 'হিন্দু জাতীয়তা' ও হিন্দু-স্বদেশিকতাবোধের প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

ইতোপূর্বে শাস্ত্রিক তথা প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ওয়াহাবীরা চেয়েছিল ভারতে মুসলিম শাসনের ও সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর্যসমাজীরা যেমন চেয়েছিল স্বধর্মীর সংহতি ও জাতীয় সত্তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।—জাতীয়তাবোধটা য়ুরোপীয়, স্বাধর্ম্যটা সনাতন-চেতনা,—বিকৃত তাৎপর্যে দুটোই অভিন্ন অভিধা লাভ করেছিল ওয়াহাবী-আর্যসমাজীর মানসে ও আন্দোলনে।

ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দুরাও কিন্তু য়ুরোপের গোত্রীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাকে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনার নামান্তর বলেই গ্রহণ করল। ফলে রাম-মোহন থেকে যে হিন্দু চেতনার শুরু, তা-ই কালে পূর্ণতা পেল। কংগ্রেসের সভায় ধর্মীয় জাতীয়তা অস্বীকারের চেষ্টা থাকলেও ভারতের হিন্দু-মুসলমান কারো মনে-মননে কখনো দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ঠাঁই পায়নি। অথচ

আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র তাঁদের সমকালে দৈশিক বাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল ও দৃঢ়মূল হয়েছিল।

আট দশকে ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দু-বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তাছাড়া এখন আর কেবল ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা নয়, জার-বিরোধী গুপ্ত সমিতি, আমেরিকার স্বাধীনতা, ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডী-কোঁতে-বেন্থামের বাণীই তাঁদের প্রেরণার উৎস। হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনীসভা, পাবনার কৃষক সমিতি (১৮৭৩), মনোমোহন ঘোষের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়সগতবাধা, সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি, ১৮৭৪ সনে ভোলানাথ চন্দ্রের ব্রিটিশ পণ্য বর্জন প্রস্তাব, অবমাননাকর ইলবার্ট বিল (১৮৮২), ভার্নাক্যুলার প্রেস আইন (১৮৭৮), আর্মস্‌ আইন (১৮৭৮), ইণ্ডিয়া লীগ ও ন্যাশন্যাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা, ম্যাজিনি-ভক্ত আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভা (১৮৭৫), বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২), আরো পরে বিবেকানন্দের রচনা, 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ ঘোষের জ্বালাকর ও বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধাবলী, মারাঠা বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কের দ্বীপান্তর (১৮৮০), দামোদর চোপেকারের ও বালকৃষ্ণ চোপেকারের ফাঁসি (১৮৯৭) প্রভৃতি অনেক ঘটনা শিক্ষিত হিন্দুদের লঘুগুরুভাবে ব্রিটিশ বিরোধী হতে বাধ্য করেছিল। তবু কচিৎ কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের মনে যে জ্বালা বা ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ছিল না তার প্রমাণ ১৮৮৫ সনে Scotsman, Allan Octavian Hume-এর আহ্বানে শাসক-শাসিতের সমঝোতা ও সহযোগিতা লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসে হিন্দুদের সানন্দে যোগদান। আমাদের এ সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে বিপিন পালের (১৮৫৫—১৯৩২) মন্তব্যে : Calcutta students community was honeycamped with 'Secret organisation' তাদের মধ্যে সন্ত্রাসমূলক কাজের কোন পরিকল্পনা ছিল না, তাদের শৌখিন 'thought and imagination were of a revolutionary character.' গোপাল হালদারও বলেন, গুপ্তসভার 'Hindu-nationalism revivalism were the main trend, French revolution, Mazzini and young Italy, Garibaldi, Anti-Czarist secret societies, American war of Independence, Irish Revolutionary Movements and Comte, Bentham etc. were the sources of political inspiration which were mostly intellectual exercise of the Bhadraloks : (Bipin Pal

Commemoration Volume, pp 244-37)। এ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'। একালে সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন পাল (বিপিনচন্দ্র), বাল (গঙ্গাধর তিলক) ও লাল (লালা লাজপৎ) [১৮৫৬—১৯২৮]। তাঁরা ছিলেন মধ্যপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক। তিলকই গণপতিপূজা ও শিবাজী উৎসব (১৮৯৫) প্রবর্তন করেন।

গুপ্তসমিতির সদস্যরা দেশমাতৃকার প্রতীক কালীমাতার ও গীতার নামে শপথ ও সংকল্প গ্রহণ করতেন। হিন্দু নেতারা হিন্দু-রাজত্বের স্বপ্ন দেখতেন, কাজেই ভারতীয় তথা নির্বিশেষ বাঙালী জনগণের ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষ জাতীয়তা গঠনে কারো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশ আমলে উদ্ভূত উনিশ-বিশ শতকের সামন্ত জমিদার এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যায়, শিক্ষায়, সামর্থ্যে, অর্থে-বিত্তে, প্রভাবে-প্রতাপে, নেতৃত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কাজেই তারা মুসলমানকে বন্ধু ও বশ করবার গরজবোধ বা চেষ্টাও করেনি কখনো, কেবল কংগ্রেস মাধ্যমে রাজনীতিক 'বোলচাল' হিসেবেই 'মিলনবাঞ্ছা' প্রকাশ করেছে। আর বিক্ষুব্ধ ও সংখ্যালঘু দুর্বল মুসলমান ঠক্‌বার আশংকায় সব সময় সভয়ে লক্ষ্য করেছে হিন্দু-রাজনীতি, চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। এটি ছিল বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও স্বার্থসিদ্ধির যুগ, প্রতীচ্য শিক্ষা তাদের আধুনিক বুলি ও পন্থা বাতলে দিয়েছিল মাত্র। একে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। কেননা এ সময়ে মানুষের প্রতীচ্য জীবনধারার প্রভাবে কৃত্রিম উপায়ে চোখ খুলেছে মাত্র। মন-মানসের মুক্তি ঘটেনি, সম্ভাবনার দিগন্তও হয়নি উন্মোচিত আবিষ্কারে উদ্ভাবনে কিংবা নতুনতর জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায়। ব্রাহ্ম-ওয়াহাবী-আর্যসমাজী মানসের ও আন্দোলনের সঙ্গে রেনেসাঁসের পার্থক্য মর্মগত ও গুণগত—সংখ্যাগত নয়।

এভাবেই ভদ্রলোকদের রাজনীতির মানসিক ব্যায়াম হয়তো চলত। কিন্তু লর্ড কার্জন 'বঙ্গবিভাগ' করে হিন্দু-মানসে চরম আঘাত হানলেন, সে অভিঘাতের আন্দোলন চলল ১৯১১ অবধি। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' নামের দল দুটোরই সন্ত্রাসবাদীরা এবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নামলেন সংগ্রামে। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেন। তাতেও হয়তো গণসমর্থনের অভাবে গুরুতর কিছু হতে পারত না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িত ব্রিটিশ সরকারের

দুর্বলতার সুযোগে স্বাধিকার দাবির অভিলাষ আন্তরিক ও প্রবল হল বুর্জোয়া মনে। তবে ভীরুতাও ছিল, তাই অরবিন্দ ঘোষ অসহযোগ ও অহিংসনীতির কথা বললেন ১৯০৬ সনে, যা পরে গান্ধীও গ্রহণ করলেন। অরবিন্দ বললেন : 'Our methods are those of self help and passive resistance. The policy of passive resistance was evolved partly as the necessary complement of self help, partly as a means of putting pressure on govt. The essence of the policy is the refusal of co-operation etc.' উল্লেখ্য যে এ অহিংস নীতির উদ্ভাবক ও আদি প্রবক্তারা হচ্ছেন প্রতীচ্য মনীষীরা—থরো (১৮৯৭—১৯৬২), টলস্টয় (১৮২৮—১৯১০), ডিক (১৮০৫—১৮৬৭) ও পার্নেল (মৃঃ ১৮৯১) প্রমুখ।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিও হল প্রবল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন যুদ্ধ-পীড়িত সরকারের আর্থিক-মানসিক দুর্বলতার কারণে আশাতীত-ভাবে হল সফল আর সরকারী দুর্বলতার সুযোগে ত্রিশোত্তর রাজনীতি পূর্ণ-স্বাধীনতা লক্ষ্যে হল পরিচালিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সাফল্য করল ত্বরান্বিত—যদিও হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব তীব্রতর ও সংঘাতসঙ্কুল করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না সরকারপক্ষের।

যদিও বাঙলা, বিহার ও ওড়িশা নিয়েই ছিল ১৯০৫ সন অবধি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী, তবু বাঙলাভাষী অঞ্চলের সমস্যা ও সম্পদ নিয়েই আমরা আলোচনায় অভ্যস্ত। সব অঞ্চলের সমস্যা বা রূপ নিশ্চয়ই অভিন্ন ছিল না। বন্দর নগর কোলকাতাই কোম্পানীর রাজধানী হওয়ায় এবং বহির্জগৎ ও বহির্বাণিজ্য কোলকাতার মাধ্যমেই আমাদের কাছে পরিচিত হওয়ায় আর কোলকাতা হিন্দু-অধ্যুষিত হওয়ায়, প্রতীচ্য শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা বাঙালী হিন্দুদের মাধ্যমে আসায়, গোটা প্রেসিডেন্সীর অর্থ, সম্পদ, চাকরি ও শিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ তারাই পেয়েছে। বিহার ও ওড়িশা এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ থেকে বহু সংখ্যায় কোলকাতা যাওয়া যানবাহনবিরল সে-যুগে সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কোলকাতার চারপাশের হিন্দুরাই সবটা দখল করে বসেছিল। সেখানে বিহারী, ওড়িয়া কিংবা মুসলিমরা পরে ঠাঁই পায়নি। পাটনায়-কটকে অবস্থা এরূপ ছিল না, সেজন্য সেখানে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বও সেভাবে প্রকট হয়নি, অর্থাৎ জমিদার-মহাজন-চাকুরে সব এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল না। বস্তুত

বিহারে সংখ্যালঘু মুসলিমরা শিক্ষায় ও সম্পদে হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বিহারে-ওড়িশায় তাই কোম্পানী আমলে বা ভিক্টোরিয়া শাসনে রাজনীতিক সমস্যা দ্বন্দ্ব-কোন্দলসঙ্কুল ছিল না।

দিল্লী-আগ্রা-লাহোর প্রভৃতি পুরোনো শাসনকেন্দ্র ছিল কোলকাতা থেকে দূরে, মুর্শিদাবাদের পতনের পরে সেখানকার শিক্ষিত বিত্তবান অবাঙালী মুসলিমরা উত্তর ভারতে চলে যায়, তারা কোলকাতায় বেশী সংখ্যায় এলে কোম্পানী-কৃপায় ভাগ বসাতে পারত, যেমন ভারতের অন্যত্র কোম্পানী-কৃপা মুসলমানরা কোথাও অস্বীকার করেছে বলে প্রমাণ নেই। বস্তুত ওড়িশায়, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, বেরারে, উত্তরপ্রদেশে, কিংবা দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজে সংখ্যানুপাতে চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমান বেশী অংশ পেয়েছে।

অতএব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিসেব করলে কোম্পানী আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে সংখ্যালঘু মুসলিমরা চাকরি ক্ষেত্রে সামান্যই বঞ্চিত হয়েছে। ১৮৭১ বা ১৮৮৬ সনে জনসংখ্যার (শতকরা ২৩ ভাগ) তুলনায় মুসলিমরা সরকারী চাকরি বেশী পেয়েছিল (৩১.৩ ভাগ)। ১৯১১ সনে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৩.৫ ভাগ, চাকরি করত ১৯.৪ ভাগ। ১৯১৩ সনেও জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম চাকুরের সংখ্যা বেশী থাকত, উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের আইনশাস্ত্রে অনীহাজাত বিচার-বিভাগে অনুপস্থিতির দরুন আনুপাতিক হারে মুসলিমদের প্রাপ্য চাকরির সামান্য ঘাটতি পড়েছিল। এ সময়ে তফসীলী হিন্দুরা বলতে গেলে মোটেই কোন চাকরি পায়নি। ঐতিহাসিক যুগে বর্ণহিন্দুরা সবকালেই এ সুযোগসুবিধা পেয়ে আসছিল। ব্রিটিশ আমলের প্রথম শতকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, এ-ই যা। কাজেই সর্বভারতীয় হিসেবে মুসলমানদের ক্ষোভ করবার কোন কারণ ছিল না। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে স্থানিকভাবে বাঙালী মুসলমানদের মনে ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বেদনা জাগল এবং বাড়ল ইতিহাসজ্ঞানের অভাবে ও আত্মোন্নয়ন-বাসনার প্রাবল্যে।

ভারতে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা যখন বেশী তখন বিত্তে, বৃত্তিতে, বেসাতে, বিদ্যায় ও চাকরিতে তারাই প্রবল ও সংখ্যাগুরু থাকবে এবং সামাজিক ও আর্থিক জীবনেও যে তারাই প্রতাপে-প্রভাবে, দর্পে-দাপটে প্রধান হবে—এতে অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছুই নেই।

উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙলায় যখন মুসলিমরা চাকরিক্ষেত্রে বঞ্চিত

হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে, তখন (১৮৭১ সনের আদমশুমারী অনুসারে) বাঙলায় তাদের জনসংখ্যা শতকরা ৩২ ভাগ মাত্র। এবং মাত্র ১৯১১ সনে তাদের জনসংখ্যা শতকরা ৫২·৭ ভাগে দাঁড়ায়। বাঙলায় মুসলিমদের চাকরিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ তাদের শিক্ষার ঐতিহ্যহীনতা ও কোলকাতা থেকে দূরে পূর্ববঙ্গে তাদের অধিকসংখ্যায় অবস্থিতি।

পূর্ববঙ্গে মুসলমান ছিল সংখ্যায় হিন্দুর চেয়ে সামান্য কিছু বেশী (শতকরা ২/৩ ভাগ)। কিন্তু তাদের অধিকাংশের শিক্ষার বা উচ্চবিত্তের ঐতিহ্য ছিল না, তাছাড়া কোলকাতা ছিল রেলওয়ে হওয়ার আগে দুরধিগম্য। ফলে বাঙলার মুসলিমরা মুঘল আমলের মতোই রইল নিরক্ষর ও দরিদ্র। কিন্তু পরে তাদের কারো কারো সন্তান যখন কেরানী হওয়ার মতো শিক্ষিত হল, তখন বড় বাবুরা জাতি-গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। কাজেই তাদের অসন্তোষ ক্ষোভের ও বিদ্বেষের রূপ নিল, তাছাড়া আবাল্য দেখা হিন্দু জমিদার-মহাজনের পীড়নও তাদের নতুন ক্ষোভে ও বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে বাঙলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করে,—মুসলিম লীগের বাঙলায় জনপ্রিয়তার বিশেষ কারণ এ-ই।

মুঘল আমল অবধি গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও লেন-দেন ছিল সরল ও সামান্য। পণ্য বিনিময়ে মুদ্রার প্রয়োজনও ছিল সামান্য ও নিম্নমানের। কড়ি হলেই চলত। কাজেই আর্থিক ক্ষেত্রে জীবন ছিল প্রায় অবিচল।

সবকাজই ছিল গতরখাটা-খাটানো সাপেক্ষ। কারণ কল ছিল না। এই মন্থর ও চিরন্তন জীবনে নাড়া দিল য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলোর আবির্ভাব। আকস্মিক বিপ্লব-বিপর্যয় ঘটাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। তারা আমাদের পণ্যের ওপর, কুটিরশিল্পের ওপর, জমির ফসলের ওপর, কাঁচা মালের ওপর, জমির স্বত্বের ওপর হামলা করল। আমাদের ছিল হস্তশিল্প, তাদের ছিল ক্রম-বর্ধমান কলজাত সামগ্রী, বাজার-বাণিজ্য গেল তাদের নিয়ন্ত্রণে, তারা তাদের প্রয়োজনে যা নিত জোর করেই নিত, যা আনত তার চাহিদাও জোর করেই সৃষ্টি করত—অপরিহার্য ও আবশ্যিক করে তুলত তাদের পণ্য, শোষণ লক্ষ্যে ছিল তাদের শাসন।

এই পরিবর্তন বা বিপর্যয়ের জন্যে প্রস্তুতি ছিল না আমাদের—পরিবেশও ছিল না। কারণ তা দৈশিক প্রয়োজনে ও দৈশিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবে

ঘটেনি—সবটাই আরোপিত বা চাপানো, এবং সবটাই ছিল জোর করে নির্মম-ভাবে দস্যুর মতো হরণমূলক। শুধু নেয়াই ছিল—কেবল কাড়াই ছিল, দায়িত্ব-বোধে কিংবা করুণাবশে কিছু দেয়ার কথা ভাবেনি তারা। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে, জীবিকায়, জীবনপদ্ধতিতে, অর্থে-সম্পদে, ঘরে, সমাজে সর্বত্র এল আকস্মিক ও কল্পনাতীত বিপর্যয়। আগে সীমিত ও ক্ষুদ্র আশা-প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচত গাঁয়ের মানুষ, সেখানে ছিল একটা সনাতন নিয়মপদ্ধতি। খরা-ঝড়-বন্যা-মহামারীকে আল্লাহর মার বলেই তারা জানত ও মানত। তাই নিরুপায়ের প্রবোধ ছিল এতে। কিন্তু প্রবল দুরাত্মা শাসক-শোষকের মারে প্রবোধ ছিল না। আবার নতুন জীবনপদ্ধতি হল শহর-বন্দর নির্ভর—তাও ছিল আন্তর্জাতিক শোষণের জটিল জালের ফাঁদ। এ ছিল মুদ্রা-নির্ভর জীবন। তাকে ঠেকানোর সাহস-শক্তিও ছিল না কারো। কাজেই যতই অভাব, দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা বাড়-ছিল, ততই কাঙাল ভিখারীদের মতো অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে গাঁয়ে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, অফিসে-আদালতে সর্বত্র মানুষ নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ বাড়িয়েছে। শোষকশ্রেণী চিহ্নিত করতে জানেনি, তাই জাতধর্মই হয়েছে শত্রু-মিত্র বিচারের মাপকাঠি। তাই শূদ্ররা স্বধর্মী বলেই কখনো জমিদার-মহাজন বিদ্বেষী হয়নি, অথচ চাষী ও বৃত্তিজীবী হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই হয়েছে শোষিত। হিন্দু বলেই জমিদার মহাজন-চাকুরে খাজনা-সুদ-ঘুষ থেকে হিন্দুকে রেহাই দেয়নি। ইংরেজী শিক্ষার, কোম্পানীর চাকরির কিংবা বানিয়া-ফড়িয়া-গোমস্তার চাকরির সুযোগ-সুবিধা বা প্রসাদ বাঙালীমুসলিমের মতো বিরাট শূদ্রসমাজও পায়নি ইংরেজ আমলে কখনো। মানুষ যতই কাঙাল হচ্ছিল প্রত্যাশা আর লিপ্সাও ততই বাড়ছিল, বাঁচার গরজেই প্রভুশক্তির তোয়াজ-প্রবণতা সে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে। তাই সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী যত ছিল, স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী ছিল না তার হাজার ভাগের এক ভাগও।

আর একটি কথা, মার্কসীয় তত্ত্ব অঙ্গীকার করার পূর্বে আস্তিক মানুষ কেবল স্বগোত্রের, স্বধর্মীর, স্বসমাজের ও স্বদেশের স্বার্থচিন্তা করেছে, হিতকামনা করেছে। নির্বিশেষ মানুষের কল্যাণকামনা করেছে ব্যক্তিগতভাবে কচিৎ কোন উদারপ্রাণ দুর্বল মানুষ। মার্কসীয়তত্ত্বে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরাই পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও প্রথম জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিশেষ মানুষের জন্যে মানবিক

ন্যায়, সাম্য ও স্বাধিকার দাবী করে। এই প্রথম সুস্পষ্টভাবে শোষক-শোষিত শ্রেণী-চেতনা জাগল। এর আগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি চিরকাল স্বগোত্রের স্বকৌমের, স্বধর্মীর, স্বজাতির, স্বসম্প্রদায়ের বা স্বদেশের স্বার্থে মানুষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে, সংঘর্ষে-সংগ্রামে মেতেছে। কাজেই মার্কস-পূর্ব পৃথিবীর সর্বত্র দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ইতিহাস অভিন্ন। এ-ও উল্লেখ্য যে বাঙলাদেশে মার্কসবাদীরাই প্রথম স্থানিক-কালিক অবস্থানের স্বীকৃতিতে গণমানুষের সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থবোধে একাত্মতা অনুভব করে। বাঙলাদেশে তারাই দ্বিধাহীন চিত্তে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে এ মুহূর্তে একজন জার্মানের, কোরীয়র কিংবা ইয়ামনীর যেমন দ্বৈত পরিচয়, তেমনি তারাও সত্তায় (entity-তে) বাঙালী, রাষ্ট্রিক পরিচয়ে (identity-তে) বাঙলাদেশী এবং চেতনায় আন্তর্জাতিক ও মানববাদী। অন্যরা আজো হিন্দু বাঙালী কিংবা মুসলিম বাঙালী, বড়জোর বাঙালী হিন্দু কিংবা বাঙালী মুসলিম,—পৃথিবীর অন্যান্য মানুষেও এমনি মনোভাব আজো প্রবল।

আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা

ভুল বা ত্রুটিজড়িত তথ্য-বা-তত্ত্ব-জাত ধারণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, কর্ম ও আচরণ পরিণামে ক্ষতির কারণ হয়। ভুল প্রত্যয় ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় এবং সে-সিদ্ধান্ত প্রণোদিত কর্ম ও আচরণ কাম্য ফল দিতেই পারে না। বিষয়, কাল ও ক্ষেত্রভেদে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে তা মারাত্মক ক্ষতিপ্রসূ হতে পারে। অভিসন্ধি কিংবা অজ্ঞতাবশে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লিখিত বাঙলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বিধৃত কোন কোন তথ্য, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত পড়ার, শোনার, জানার ও বিশ্বাস করার বিষক্রিয়া আজো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রিক জীবনে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ব্যক্তি-মানুষেরও জীবনে ভয়ের, ত্রাসের ও অনিরাপত্তার যন্ত্রণা হয়ে রয়েছে। ইতিহাসকার পরিবেশিত সব তথ্য ভুল, এমন কথা অবশ্যই বলা যাবে না, তবে স্থান-কাল প্রতিবেশ-প্রয়োজনের, শাসক শাসিতের সম্পর্কের, শাসক-প্রশাসকের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনার, রুচির ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ-কার্য বিশ্লেষিত হলে অনেক অপরাধ-অপকর্মের, কোন কোন শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকা-ভাষ্য সম্ভব হত। একালের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করা যায়, পাকিস্তানে অমুসলিম বিরল বলেই সেখানে দাঙ্গা বাধে আহমদিয়া, শিয়া কিংবা বিহারীদের সঙ্গে স্থানীয় অধিজনদের। ধনী মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর ভারতে ঘন ঘন মুসলিম নিধন চলে অথচ দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম বিদ্বেষ কখনো দাঙ্গার রূপ পায়নি, সেখানে পাকিস্তানী হিন্দু উদ্বাস্তু বিরল বলে। উৎকলে ও আহমদাবাদে মুসলিম হত্যার কারণও ছিল ভিন্ন ও সাময়িক। বাঙলাদেশে ১৯৬৫ সনের পর যে হিন্দু খেদানো দাঙ্গা বাধেনি তার প্রত্যক্ষ কারণ ধনী হিন্দুর বিরলতা এবং পরোক্ষ কারণ পাকিস্তানী-বিদ্বেষ ও ভারত-ভীতি। আসামে-ত্রিপুরায় বাঙালী বিতাড়ন লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড ভিন্নতর ব্যাখ্যার দাবিদার। এ-ও স্মর্তব্য যে দাঙ্গামাত্রেই শহরে শিক্ষিতের সৃষ্টি। অতএব স্থানিক, কালিক ও প্রাতিবেশিক প্রয়োজনের বাস্তব পরিস্থিতিই অর্থ-বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত এবং

প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী হননে-বিতাড়নে প্রবৃত্তিপরবশ মানুষকে প্ররোচিত করে। আমরা এ-ও জানি ব্যক্তিগতভাবে ক্বচিৎ কোন মানুষ বিদেশী বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী বিদ্বেষী। ব্যক্তিগতভাবে এদের মধ্যে প্রেমের, বিবাহের, প্রীতির, বন্ধুত্বের, ব্যবসার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের সম্পর্ক সহজেই গড়ে ওঠে, কেবল দলগত বা সমষ্টিগতভাবেই বিদেশীর, বিজাতির, বিভাষীর, বিধর্মীর প্রতি আশৈশবের সংস্কারজাত অবজ্ঞা, অনাত্মীয়তার ভাব সুপ্ত থাকে মনের গভীরে। এবং দলীয় স্বার্থে তা যথাপ্রয়োজন প্রকাশও পায় চিন্তায় কর্মে-আচরণে। কাজেই যে-কোন অপকর্মের কারণ হিসেবে বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী বিদ্বেষকেই দায়ী করলে বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞার অপচয় হয় মাত্র। বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে কোন একক ঋজু কারণে জগতে-জীবনে কোথাও কিছু ঘটে না।

মনু বলেছেন 'বিদ্যা [এবং শাস্ত্রও] ব্রাহ্মণ সেবধি' অর্থাৎ বিদ্যা ব্রাহ্মণের গচ্ছিত ধন। ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা জানি কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ চিরকালই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষৎ, ন্যায় ও ষড়দর্শন অধ্যয়ন করতেন। কেউ কেউ সর্বশাখায়, কেউ বা কোন বিশেষ শাখায় পারঙ্গম-পারদর্শী হতেন। সৎশূদ্র, কায়স্থরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে লেখকের-লিপিকারের পেশায় থাকতেন, কাজেই 'কায়স্থ' নামে পরিচিত বর্ণের কেউ কেউ চিরকাল লেখাপড়া জানত আর 'বৈদ্য' বর্ণের কেউ কেউ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসক বৃত্তি বরণ করত। অতএব বর্ণ হিন্দুদের কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে লেখাপড়া চিরকাল চালু ছিল। তেমনি চালু ছিল উচ্চ-বৃত্তির ও উচ্চবিত্তের বৌদ্ধদের মধ্যেও। অতএব, রাজ্যে, প্রশাসনে ও মানুষের সামাজিক-বৈষয়িক-শাস্ত্রিক জীবনে প্রয়োজনীয় লেখা-পড়ার কাজমাত্রেই ছিল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের অধিকারে। এগুলো ছিল তাদের কারো কারো প্রজন্ম-ক্রমিক বাঁধা বৃত্তি। হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে তারাই ছিল রাজ্যের শিক্ষা, শাস্ত্র, সংস্কৃতি প্রভৃতির ধারক-বাহক-রক্ষক এবং সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসন-প্রশাসনের কর্তা-কর্মী ও ধারক-চালক। এখনকার বিদ্বানদের মতে শাস্ত্র ও সমাজ নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর পুরোহিতের উদ্ভব ঘটে আর্যপূর্ব যুগেই, সম্ভবত মহেনজোদারো-হরপ্পা সভ্যতার আদিকালে।

তুর্কো-আফগানেরা যখন উত্তর ভারত দখল করে, কিংবা সিন্ধুতে ও দক্ষিণ-

ভারতে বিদেশীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে নিশ্চয়ই মুসলিম ছিল না। তখনও গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে রাজস্বাদি কর আদায়ের, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ও বিচারের দায়িত্বে ছিল নিশ্চয়ই ওই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থরাই। পনেরো-ষোল শতক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে স্বল্পসংখ্যায় দীক্ষিত তথা দেশজ মুসলিম সুলভ ছিল বটে, তবে তাদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণের, বৃত্তি ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ-গোষ্ঠীর এবং সামান্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধজাত বলে আজকাল নানা-সূত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলছে। তারাই ভারতের ও বাঙলায় সর্বত্র আজলাফ বা আতরাফ মুসলিম হিসেবে শাসকগোষ্ঠীভুক্ত কৃত্রিম-অকৃত্রিম অভিজাতদের চোখে আজো অবজ্ঞেয়। জুলহা, নিকেরি, কাহার, কৈবর্ত, মূলঙ্গী, তেলী, ধুনকর, শালকর, বারুই, মুজারী, শিকারী, বাউল, হাজাম প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্রপেশার মুসলিমদের প্রজন্মক্রমিক নিরক্ষরতা, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, ও ব্রাত্যাবস্থা স্মর্তব্য। কাজেই তুর্কো-আফগান-মুঘল আমলেও গাঁয়ে গঞ্জে ধনী-মানী, ভৌমিক, সচ্ছল-চাষী, শিক্ষক, চিকিৎসক, মহাজন, প্রশাসক, রাজকর আদায়কারী, দোকানদার, গোমস্তা, বেপারী, ব্যবসায়ী বৈষয়িক ক্ষেত্রে দলিল-দস্তাবেজ, পাট্টা-কবুলিয়ত লেখক প্রভৃতি ছিল গাঁয়ের সচ্ছল অধিজন-শিক্ষিত বর্ণহিন্দুই। জরিপ ও রাজস্ব-বিভাগের গাঁয়ে-শহরে-চৌকিতে প্রায় সব কর্মচারীই ছিল নওয়াব মীরজাফরের আমল অবধি হিন্দুই। শেষ দেওয়ান ছিলেন ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলে যেমন বড়ো কয়েকজন চাকুরে ব্যতীত অফিসে আদালতে আর সবাই ছিল স্থানীয় লোক, তেমনি অবস্থা ছিল তুর্কী-মুঘল যুগেও। কাজেই ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিম অধিকারের অবসানের সুযোগে হিন্দুরা সরকারী চাকরি নতুন করে ব্রিটিশ প্রশ্রয়ে জবরদখল করেনি। কাজীর, ফৌজদারের, সেনার, সেনানীর চাকরি ও জায়গীর হারাল বটে শাসকগোষ্ঠীভুক্ত উচ্চবিত্তের দেশী-বিদেশী মুসলমানরা, কিন্তু দেশজ মুসলিমরা সেখানে আগেও অনুপস্থিত ছিল বলে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি শাসকের জাত বদলের ফলে। উল্লেখ্য যে বাঙলাদেশে দেশজ মুসলিম সমাজে মুন্সী-মোল্লা-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-উকিল-কাজী এবং কচিৎ কেউ ফৌজদার-সেনা-সিপাহী থাকলেও বড়ো চাকুরে বা দরবারের আমীর-উজির-লস্কর-ছিলেন না কেউ। বড় পদে বহাল হত আরব-ইরান-মধ্যএশিয়া ও উত্তরভারত থেকে আগত মুসলিমরাই। তাই সিরাজুদ্দৌলা-মীরকাসিমের দরবারেও মেলে না দেশজ আমীর মুসলিম।

তুর্কী-মুঘল আমলে বিচার বিভাগে বেশী কাজী-সদর আমীন থাকলেও সামরিক ও উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মচারী ছিলেন শাসকগোষ্ঠীভুক্ত বিদেশী মুসলিমরা, আর রাজকোষের ও রাজস্বের সার্বিক দায়িত্ব বিদেশাগত মুসলিম চাকুরেদের ওপর অর্পিত থাকত বলে কিছু জায়গীরদার এখানে সেখানে মুসলিম থাকলেও সিকদার, জমিদার, তালুকদার, তরফদার, ইজারাদার, হাওলাদার ছিল সাধারণভাবে হিন্দুই। উল্লেখ্য যে মুরশিদকুলি খানের ইজারাদারেরা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু। এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পূর্ব বাঙলার ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর পাঁচটি ছিল হিন্দুর হাতে আর একটি ছিল মাত্র বিদেশাগত মুসলিমের। আরো আগের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে ১৫৭৫—১৬১৬ সাল অবধি কালের বাঙলার তথাকথিত বারভুঁইয়ার অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু অর্থাৎ সুলতানী আমলেও জমিজমা ছিল স্থানীয় বর্ণহিন্দুর অধিকারে। কাজেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দুর, বৌদ্ধের ও দেশজ মুসলিমদের আয়ত্তে ছিল না তুর্কী-মুঘল আমলেও ধন-মান-ক্ষমতা।

বলতে গেলে প্রাচীনকাল থেকেই অর্ধনগ্ন অজ্ঞ নিম্নবৃত্তিধারী মানুষেরা ছিল নিঃস্ব ও অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট। ভাতচুরি, উপবাস, ভিক্ষাবৃত্তি, ভাঙাঘর, ছেঁড়া-কাপড়, কানি-তেনা, দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির খবর দু'হাজার বছর আগে থেকেই মিলছে নানাসূত্রে। বাস্তবে রূপকথার গোয়ালভরা গরু, গোলা-ভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ কচিৎ কোথাও কারো ছিল বটে, কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে কমে যেত। তেমন বিত্তবান লোকও সংখ্যায় ছিল চিরকালই নগণ্য বা করগণ্য। শাস্ত্রে, সাহিত্যে বিদেশীর বর্ণিত বৃত্তান্তে ও রূপকথায় আমরা মানুষের দারিদ্র্যচিত্র পেয়েছি। তাই তো 'ওগ্‌গার ভত্তা ও নালিতাগচ্ছা' যোগাড়ের সঙ্গতিকেই সুখ-সৌভাগ্য-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বলে মানা হয়েছে সানন্দে 'দিজ্জই কণ্ঠা খাই পুণবন্তা' (কান্তা দিচ্ছে, খাচ্ছে পুণ্যবন্ত)।

গোড়ার দিকে হয়তো বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত উচ্চবর্ণের মানুষও প্রজন্মক্রমে একই পেশায় লেগে থাকত। এ স্থায়ী অথচ নিতান্ত স্বল্প আয়ের বৃত্তিতে বা শ্রমে নিঃস্বতা ঘোচাবার উপায় ছিল না। দেহে-মনে-বস্ত্রে-আবরণে দারিদ্র্যের তথা কাঙালপনার স্থায়ী ছাপযুক্ত মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা-অবজ্ঞা করতে থাকে উচ্চবৃত্তির, বিত্তের, গুণের ও জ্ঞানের মানুষেরা। সেই ঘৃণা-অবজ্ঞা

থেকেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব। এবং দীন-দুর্বল-অজ্ঞ মানুষকে প্রাজন্মিক পেশায় আবদ্ধ রেখে অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা চিরআয়ত্তে রাখার কুমতলবে শাস্ত্রের আসমানী দোহাই প্রয়োগে তাদেরকে চিরসেবক-দাস-ভূমিদাস এবং ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদাররূপে দেহ-মনে-বিশ্বাসে-আচরণে চিরঅনুগত করে নিরুপদ্রব দাসপ্রথা চালু রেখেছিল শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা। কাজেই আদিকাল থেকে ওরা দরিদ্র, অজ্ঞ ও কাঙ্ক্ষাহীন এবং প্রভুদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার পাত্র শোষিত-শাসিত মানুষ। এভাবে পেশায় ও শ্রমে বিভক্ত সমাজ ক্রমে বর্ণে বিন্যস্ত স্থায়ী সমাজে পরিণতি পায়। দেশজ মুসলিমরা মুখ্যত ওই গোষ্ঠীরই জাতি।

অতএব ব্রিটিশ আমলেই সুপ্তোত্থিত মুসলিম গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-উঠোনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে ধন-মান-শিক্ষা-ক্ষমতা এবং উচ্চতর বৃত্তি-বেসাত, জমিদারী, মহাজনী ও চাকরি প্রভৃতি আকস্মিকভাবে হিন্দু কবলিত দেখল, তা নয়। আগে সচেতন ছিল না বলে জ্বালা অনুভব করেনি। ইংরেজী শিক্ষার বদৌলত ব্রিটিশ শাসনে তারা তাদের দৈন্য সম্বন্ধে ভুল তথ্যের ও তত্ত্বের প্ররোচনায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হল মাত্র। এবং এতকালের প্রতিবেশী ব্রিটিশ-কৃপাপুষ্ট হিন্দুকেই তাদের দুঃখ-বঞ্চনা-শোষণ-নিঃস্বতার জন্যে দায়ী বলে জানল, বুঝল এবং মানল। সেদিন থেকেই হিন্দু হল কাঙ্ক্ষী মুসলিমদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, পয়লা নম্বরের শত্রু। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই মুসলিম সমাজে শোষক-শোষিত, বঞ্চক-বঞ্চিত চেতনার উন্মেষ ঘটে ইংরেজী শিক্ষার মন্থরভাবে প্রসারের ফলে। কাজেই সাম্প্রদায়িক চেতনারও ওই সময় থেকেই উন্মেষ এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমরা জানি কংগ্রেসের কৃত্রিম প্রচার সত্ত্বেও কম্যুনিস্টদের সংখ্যা-বৃদ্ধির পূর্বে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে অভিন্ন দৈশিক জাতীয়তাবোধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর নন, বরং বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলিমদেরও উন্নতি না হলে গোটা বাঙলার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হবে না।

কোলকাতা-মুর্শিদাবাদের বিদেশীর বংশধর উর্দুভাষী মুসলিমরাই ছিল নিরক্ষর নির্জিত গ্রামবাসী (শহরে অনুপস্থিত) অপরিচিত মুসলিমদের স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ নিয়োজিত নেতা। ওদের দেখেই হিন্দুরা মুসলিমদের তুর্কী-মুঘল শাসকদের জ্ঞাতি ভাবতে শেখে। দেশজ মুসলিমরাও এ গৌরবের

অংশভাক্ হতে চায় (যদিও দেশজ খ্রীস্টান যেমন ইংরেজ জাতি নয়, এরাও তেমনি তুর্কী-মুঘলের কেউ ছিল না)। ফলে বাঙলায় তথা ভারতে সবাই দেশজ ও শাসক গোষ্ঠী নির্বিশেষে মুসলিম আর তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী অভিন্নার্থক কিংবা সমার্থক বলে মানল। এভাবে মুসলিমমাত্রেই হল তুর্কী-মুঘলের জাতিত্বগর্বী আর হিন্দুমাত্রেই শাসিতের-দলিতের ক্ষোভ ও জ্বালা নিয়ে হল মুসলিম-বিদ্বেষী। দুটোই ছিল হাওয়াই অনুভবের বিড়ম্বনা। কিন্তু দেড়শ-দু'শ বছর ধরে এ মিথ্যে ধারণা দেশে-সমাজে-সরকারে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে।

একালে হিন্দুদেরও বোঝানো যায় না যে জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে মানুষ ভালো বা মন্দ হয় না। ব্যক্তিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস, মন-মত-স্বভাব-চরিত্রই সুকর্ম-অপকর্মের জন্যে দায়ী। পৃথিবীতে কোন কালেই নরদেবতার ও নর-দানবের অভাব ছিল না। তুর্কী-মুঘল শাসকমাত্রেই হিন্দুপ্রজা পীড়ন করে নি। তা ছাড়া শাসক-শাসিত চিরকালই দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে স্ব স্ব স্বার্থেই তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রকটিত হয়। পৃথিবীর সব জাতিরই, কিছু রাজারও প্রজাপীড়নের এবং বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী পীড়নের সাক্ষ্য-প্রমাণ-নজির রয়েছে। আজো এ গণতন্ত্রের যুগেই চোর-ডাকাত-খুনী-গুণ্ডার অধম অমানুষ রাজনীতিক নেতা-উপনেতা-কর্মী দেখা যায়। আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত রাষ্ট্রে আজো গণতন্ত্রের অপর নাম গুণ্ডাতন্ত্র-বা মস্তানতন্ত্র আর জঙ্গী তথা সামরিক শাসন মানে স্বৈর গুণ্ডাতন্ত্র।

যে-কারণেই বা যে প্রয়োজনেই হোক, যে জুলুম করে সে মনে রাখে না, কিন্তু যে মজলুম সে তা কখনো ভোলে না—ঐতিহ্যের মতো প্রজন্মক্রমে শ্রুতিস্মৃতিরূপে ক্ষোভ-রোষ জ্বালা তাজাই রাখে। তাই গোটা উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালী হিন্দুমাত্রেরই লেখায় মুসলিম প্রসঙ্গে ক্ষোভ-জ্বালা-ঘৃণা-অবজ্ঞা প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রকাশ পেয়েছে আর মুসলিম-মনে জমা হয়েছে হিন্দু-বিদ্বেষবিষ।

কিন্তু একালের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান, বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রসচেতন, যুক্তি-বুদ্ধিচালিত মানুষেরা অতীতের চশমা পরে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করলে, তার বোধশক্তিতে ও মানবিকতায় আস্থা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই জাতি-

বৈরে ও জাতিবৈষম্যে যে সমূহ ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ কিছুই নেই, তা বুঝিয়ে দেয়া আজকের ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী প্রভৃতির বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এখনকার দিনে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে সত্য ও তথ্যরূপে সর্বজন-স্বীকৃত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা হল—রাজ্যহারা মুসলিমরা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হল এবং তারা ইংরেজ ও ইংরেজী বর্জন করে চলল। অথচ রাজতন্ত্রের সেযুগে রাজ্য ও রাজত্ব হাতবদল হলে তা নিছক খবর হিসেবেই গ্রহণ করত। আনুগত্য ছাড়া দেশের ও রাজার সঙ্গে প্রজার আর কোন সম্পর্ক-চেতনার উন্মেষ ঘটেনি তখনো। প্রমাণ গোয়া-দমন-দিউ-পণ্ডিচেরী কিংবা বোম্বাই-মাদ্রাজ-কোলকাতা-চন্দননগর-চুঁচুড়া বিদেশী বেনে কবলিত হলেও ভারতের রাজন্যবর্গ তাতে বিচলিত হয়নি। দেশের প্রতি দায়িত্ব ও সরকারে অধিকার-চেতনা এবং স্বধর্মীর ও স্বাদেশিক জাতীয়তাবোধ উনিশ শতকে ইংরেজের ও ইংরেজীর অবদান।

কাজেই ইংরেজ কোম্পানী-অধিকারে মুসলিমরা স্বজাতির সদ্য রাজ্য-হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ অসহযোগ করবার মতো তেমন গভীরভাবে অনুভব করেনি। প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন দুই মুসলমানই—আজিমুল্লাহ ও শেখ ইহতেশামউদ্দীন। কোলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আবেদন করেছিল হেস্টিংসের কাছে মুসলিমরাই। ১৮২৪ সনে নওয়াব-ই মুর্শিদাবাদে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে। সরকার-গঠিত কমিটিতে কাজ করতে কোন মুসলিম কখনো অসম্মত হয়নি। সিপাহী বিপ্লবের আগে ও পরে মহারানী প্রদত্ত উপাধি গ্রহণে কোন মুসলিমের অনীহা দেখা যায়নি। ১৮৬০ সন থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মুসলিমরাও প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণ করতে থাকে। ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর ব্রিটিশ-প্রীতি ছিল। কাজেই ১৮২২ সনের পূর্বে ওয়াহাবীরাও ছিল না ব্রিটিশ-বিদ্বেষী, বাঙলায় তিতুমীরের বিদ্রোহ-কাল থেকেই ওয়াহাবীরা (তথা মুহম্মদীরা) হল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী, তারা ছিল মুখ্যত নিরক্ষর গ্রামবাসী মুসলিম।

বাঙলা-বিহার-ওড়িশা নিয়ে ছিল সুবেহ বাঙ্গালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। বাঙলার বিষয় আলোচনাকালে আমরা ওই দুটি অঞ্চলের কথা ভাবি না। ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল বিহারে, পাটনায়। নেতৃত্বও ছিল ইনায়েত-বিলায়েত-কেরামত আলীদের। সেখানে অভিজাত পরিবারের সংখ্যা বেশী ছিল

বঙ্গে বিহারে হিন্দুর চেয়ে নিতান্ত উনজন মুসলিমরা ধনে-মানে ও প্রতীচ্য শিক্ষায় এগিয়েছিল, যেমন ছিল উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে। ওইসব অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে সরকারী চাকরিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি।

অতএব, স্বজাতির রাজত্ব হারানোর ক্ষোভজাত কিংবা ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলন প্রসূত ইংরেজী বিদ্বেষ তেমন কেজো ছিল না প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব আলোচনাকালে আমরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অংশ বিহার-ওড়িশার মুসলিমের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করি না। আর এ-ও মনে রাখি না যে বাঙলাদেশে মুসলিমরা সামাজিক-আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারে দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বাস করত। একদল ছিল বিদেশী উর্দুভাষী ধনী-মানী ফারসী-আরবী শিক্ষিত অভিজাত মুসলিম, গাঁয়ে এসব পরিবার ছিল দুর্লভ, তুর্কী-মুঘল আমলের প্রশাসনকেন্দ্রে ও বন্দর এলাকায় ছিল (এবং এখনো আছে) এদের নিবাস। এরা সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ধন-মান-বিদ্যাবলে বাঙালীর স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত নেতারা ছিলেন এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত।

কৃত্রিম কাঞ্চন-কৌলীন্যে দেশজ কিছু মুন্সী-মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার-উকিল-হাকিম পরিবার অভিজাতরূপে স্বীকৃত ছিল, তবে উর্দুভাষীর কাছে হীনমন্যতায় ভুগত ও পাত্তা পেত না বলে এরা কখনো নেতৃত্ব দাবি করেনি। এ অভিজাতবর্গের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে এরাই গোড়া থেকে ইংরেজী পড়া শুরু করে। বন্দর-নগরী কোলকাতা ও তার চার পাশের জেলাগুলো ছিল বর্ণহিন্দু অধ্যুষিত। শহরে চাকরির, ব্যবসার ও শিক্ষার অবাধ সুযোগ পেয়েছিল তারাই। গোড়ায় দেশজ মুসলিমের অনুপস্থিতির দরুন গাঁয়ের মুসলিমরা কোলকাতা শহরে নিরাশ্রয় বোধ করেছে। কাজেই অভিজাত মুসলিম পরিবারে বিদ্যালয়ের দুর্লভতার দরুন ইংরেজী শিক্ষা প্রত্যাশিত সংখ্যায় মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে এসব ঘরের সন্তানরা প্রেরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২ ?), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী (১৮৪৫—১৯১০), মীর্জা মুহম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮—১৯২০), কায়কোবাদ (১৮৫৮—১৯৫২), রেয়াজউদ্দীন আহমদ আলআবাদী (১৮৫৯—১৯১৯), নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী (১৮৬৪—

১৯২৪), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯—১৯৩৩), মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩), শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০—১৯৩০), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১—১৯৫৩), মতিয়র রহমান খান (১৮৭২—১৯৩৭), শেখ উসমান আলী (১৮৭২—১৯৫২) প্রমুখ অনেকেই। আর কোলকাতার আবদুল লতিফ, আমীর আলী, আমীর হোসেন, বেলায়েত হোসেনদের কথা তো আমরা জানিই।

আর গোটা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে যে-সব আতরাফ-আজলাফ নামে অবজ্ঞাত নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের এবং নিঃস্ব মুসলিম ছিল, তারাই ছিল সমাজে শতকরা নব্বই জন। যদিও সব গাঁয়েই দু'একজন সাক্ষর লোক মিলত, তবু সাধারণভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোন ঐতিহ্য ছিল না, যেমন ছিল না তাদের জ্ঞাতি তাঁতী-হাড়ি-ডোম-বাগদি-কেওট-চাঁড়াল-কামার-কুমার-বারুই-তেলী প্রভৃতির মধ্যেও। শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে এরা ইংরেজ ও ইংরেজী-বিদ্বেষবশে ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ না করলেও বাঙলা, ফারসী বা আরবী তো শিখত। কিন্তু এদের মধ্যে—এদের জীবনে কোন প্রকার সাক্ষর শিক্ষার আভাসমাত্র মেলেনি। আজো যে পরিবার নিরক্ষর—তা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিরক্ষর। কাজেই ব্রিটিশ-বিদ্বেষবশে নয়, শিক্ষার ঐতিহ্য-হীন বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বে আতরাফ ও চাষী মুসলিমদের শিক্ষায় ছিল অনীহা-অবহেলা। আমাদের এ ধারণার সমর্থনে আরো একটি তথ্য উপস্থিত করা যায়। ইংরেজী প্রশাসনিক ভাষারূপে দেশের বিদ্যালয়ে চালু হয় ১৮৩৮ সনে। ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান ঘটে মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সনে, সম্ভবত রেশ থাকে ১৮৬৫ সন অবধি। ওয়াহাবী মামলাই শেষ হয় ১৮৭০ সনের দিকে। তবু উনিশ শতকের শেষপাদে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রত্যাশিত বিস্তার ঘটেনি পূর্বোক্ত কারণেই। প্রমাণ, হুগলী মোহসিন কলেজে বাঞ্ছিত সংখ্যায় মুসলিম ছাত্র মেলেনি অনেক অনেক কাল। ঢাকা চট্টগ্রাম-রাজশাহী কলেজেও মুসলিম ছাত্র ছিল দুর্লভ। বাঙলার বুকে কোলকাতায় সরকারী মাদ্রাসা স্থাপিত হল ১৭৮০ সনে অথচ মাদ্রাসায় পড়াল-পড়ল অবাঙালীরাই। তাই পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল উর্দু-ফারসী। পরবর্তীকালে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মাদ্রাসায়ও ওদের প্রভাবে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হল উর্দু-ফারসী-আরবী। ১৯৩০-৩৫ সন অবধি বাঙালী মৌলবীদের তথা মাদ্রাসার পড়ুয়াদের বাঙলা বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। শাস্ত্র শিক্ষার্থী বলেই মাদ্রাসার অবাঙালী

ছাত্ররাও ইংরেজী ভাষা শেখা অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে।

মুসলিম সমাজে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে আর একটি বাধার কথা বলা হয়। তা হচ্ছে, মুসলিমদের ওয়াকফ-আদি আয়মা-লাখরাজ সম্পত্তিচ্যুতি। আসলে ১৮২৮ সনে মাত্র আয়মা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন পাশ হলেও ১৮৪৬ সন অবধি সম্পত্তির দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আয়মাদারদের মামলা চলে। অতএব ১৮২৮ বা ৪৬ সন অবধি আয়মাদারেরা জমিচ্যুত হয়নি। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমপাদ বা প্রথমার্ধ অবধি অভিজাত সম্পদশালী পরিবারগুলো সম্পদরিক্ত হয়নি। যদিও ১৭৬৫ সন থেকেই এ শ্রেণীর লোকেরা সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগে কয়েক বছরের মধ্যেই পদচ্যুত হয়। কিন্তু বিচার বিভাগে ১৮৩৮ সন অবধি কাজী-কমিশনাররূপে এবং ১৮৬০ সন অবধি ফারসী জানা মুনশী-উকিল হিসেবে বহুসংখ্যক মুসলিম আদালতে সুলভ ছিলেন। সামরিক প্রশাসনিক রাজস্ব বিভাগের পদস্থ মুসলিমরা সাধারণভাবে অবাঙালীই ছিলেন। তাঁদের অনেকেই উত্তর ভারতের দিকে চলে যান।

কাজেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলিমদের আর্থিক দুর্ভাগ্য-দুর্যোগের এবং হতাশার-নৈরাশ্যের আঁধার যুগ হচ্ছে উনিশ শতকের শেষার্ধ। কারণ ইংরেজী মাধ্যমে রুজি-রোজগারের পথ-পদ্ধতি বদলে গেল। তার আগে-পরে তাদের জীবনে এমন দুঃসহ যন্ত্রণার কালরাত্রি কখনো দেখা দেয়নি। আর বাঙলার নিম্নবৃত্তিজীবী ও চাষীজীবন চিরনিঃস্বতার শিকার হয় লুণ্ঠন-প্রবণ কোম্পানী সরকারের স্বৈর বাণিজ্যনীতি এবং চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত নীতি গ্রহণের ও প্রবর্তনের ফলে। প্রথমটায় উৎপাদননির্ভর গ্রামীণ পণ্য-বিনিময় ভিত্তিক আর্থিক জীবনপদ্ধতি ভেঙে গেল আকস্মিকভাবে। বিমূঢ় গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যসূত্র গলগ্রহরূপে গাঁথা হয়ে গেল কোম্পানী মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে। এভাবে তাদের বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে ঘটল আর্থিক ও বৃত্তিক বিপর্যয়, উড়ে গেল বৃত্তি-বেসাত। বেকারত্ব, নিঃস্বতা ও অনাহার হল তাদের নিত্যসঙ্গী। আর চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তে চাষীরা হল করভার ও ঋণভারপীড়িত ভূমিদাস। জমিদারের হুকুম-হুমকি-হামলার নিত্য শিকার।

অতএব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষা দানে আগ্রহ জাগলেও দারিদ্র্যের দরুন, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের ও সন্নিকটে বিদ্যালয়ের অভাবে

নিম্ন মধ্যবিত্ত মুনশী-মোল্লা পরিবারে শিক্ষার প্রত্যাশিত প্রসার ঘটেনি এবং বৃত্তিজীবী ও চাষী-মজুর পরিবারে একালের শিক্ষার তথা প্রতীচ্যশিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগলেও দারিদ্র্যই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু একালে ও বিশ শতকের প্রথমপাদে অনেক পরিবারেই সাধ্যমতো অন্তত একটা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রেরণা অনুভব করেছে। লক্ষণীয় যে হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের কাছাকাছি এলাকার মুসলিমদের মধ্যেই ঘটেছে শিক্ষার প্রসার। অন্যত্র মুসলিম সমাজের অশিক্ষার অন্ধকার দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। আবার এ-ও সত্য যে প্রথমে কোলকাতায় পরে সারা বাঙলায় বর্ণহিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষা সীমিত থাকায় নতুন যুগের ঐশ্বর্য তাদের আয়ত্তে এল বটে, কিন্তু ইংরেজ আমলে শিল্প-বাণিজ্য বা চাকরি কমই ছিল। তাই দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের ও ধনীর সংখ্যাও ছিল কম।

তবু স্বধর্মীর রাজ্য হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ লঘু-গুরুভাবে মুসলিম মনে জেগেছিল। ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনে এবং সিপাহী বিদ্রোহে পূর্বাবস্থা ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়েছিল। সে বেদনা-ক্ষোভ-জ্বালার অভিব্যক্তি দেখি উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম-প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় ও পুঁথি-পুস্তকে। ইংরেজী শিক্ষিতরা বিশ্ব-মুসলিমের অতীত কৃতি-কীর্তি স্মরণ করে একাধারে আর্তনাদ ও আস্ফালন করে আত্মপ্রবোধ পেতে ও প্রবুদ্ধ হতে চেয়েছেন, আর স্বল্পশিক্ষিত দোভাষী পুঁথিকারেরা উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি শাস্ত্রানুশীলনের মাধ্যমে ধর্মনিষ্ঠ করে মুসলিমদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য দূর করার পন্থা বাত্‌লিয়েছেন। এসময় রাজ্য হারানোর ক্ষোভ থেকে জমিদার-মহাজন-চাকুরে হিন্দুর ধন-মান-প্রতিপত্তিই তাদের মনে পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর-প্রতিযোগীর ঈর্ষা ও ক্ষোভ জাগিয়েছে বেশী। ফলে বাঙালী মুসলিমরা ব্রিটিশ ভারতে অর্থ-বিত্ত-মননের কোন ক্ষেত্রেই স্বস্থ ও সুস্থ থাকতে পারেনি। অথচ বর্ণহিন্দুরা যে দেশজ মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুঠ করেনি, তারা যে বৃত্তিজীবী শ্রেণী হিসেবেই চিরকাল দরিদ্র ছিল এবং ব্রিটিশ শাসন-শোষণ-বাণিজ্যনীতিই যে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করেছিল, উকিল-ডাক্তার-জমিদার মহাজন-চাকুরে বর্ণহিন্দুরা কেবল নিমিত্তমাত্র, ওরা মুঘল আমলেও যে এমনি ধনী মানী ও প্রতিপত্তিশালী ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে, তা তাদের জানিয়ে দেয়ার লোক ছিল না দেশে, আর তাদের এ বিভ্রান্তিমুক্ত করা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী।

ভোটাধিকার পাওয়ার পরে রাজনীতিকরাই তাদের মনে বঞ্চনার ক্ষোভ বেশি করে জাগিয়ে দেয়। ফলে মুসলিমমনে সুযোগ পাওয়ার আশা এবং হিন্দুমনে লব্ধ সুযোগ হারানোর ভয় সাম্প্রদায়িক-চেতনা তীব্র করে তোলে।

কিন্তু এ যুগে আধুনিক রাষ্ট্রে বাস্তব জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই অতীত জীবনের পুঁজি-পাথের, স্মৃতি-শ্রেয়স বর্জন করে মনে-মননে নতুন ও সমকালীন হতে হবে। শাসক-শাসিতের মধ্যেকার সম্পর্ক চিরকালই প্রতিপক্ষের। আর ক্ষমতার প্রয়োগমাত্রেই কারো কারো প্রতি জুলুমরূপে প্রতিভাত হয়—অপব্যাখ্যাও পায়। তাছাড়া মধ্যযুগীয় সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে সাম্রাজ্যলোলুপ পররাক্রান্ত শাহ-সামন্ত শাসিত ও গোত্রচেতনাপুষ্ট অশিক্ষাদুষ্ট বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী বিদ্বেষী আস্তিক মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে গুরুত্ব দিয়ে, প্রজন্মক্রমে শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পীড়ন-দলন-বঞ্চনার ক্ষোভ-জ্বালা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধবাঞ্ছা জিইয়ে রাখা এবং সুযোগমতো কর্মে-আচরণে তা প্রকাশ করা এ যুগের গণতন্ত্রমনস্ক সমনাগরিকত্বকামী মানুষের চোখে গর্হিত কর্মাচরণ। বাবুরী মসজিদ-মন্দির দ্বন্দ্ব-দাঙ্গা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও কোন আস্তিক মানুষের পক্ষেই চিত্তের গভীরে প্রোথিত স্বধর্মীপ্রীতি ও বিধর্মী-বিজাতি-দ্বেষণা অতিক্রম করে মানুষ নির্বিশেষকে সমচোখে দেখা কখনো পুরো সম্ভব হবে না। তবু এযুগে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আস্তিক ব্যক্তিকে সহিষ্ণুতার ও উদারতার অনুশীলন করতেই হবে। একালে যানবাহনবিরল প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো গোত্রীয়, ধর্মীয়, ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাস করা কিংবা রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয়। এমনকি ইসরাইল রাষ্ট্রও খ্রীস্টান-মুসলিমকে বাদ দিয়ে অবিমিশ্র ইহুদীরাষ্ট্র হতে পারল না। কাজেই এ যুগে রক্তের, গোত্রের, ধর্মের, ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে একক ধার্মিক-ভাষিক-জাতিক-গৌত্রিক রাষ্ট্র গড়া বা রাখা সম্ভব নয়। শ্রম-ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পর্যটন-দৌত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্মের, ভাষার ও বর্ণের মানুষের যাতায়াত বসবাস ও মিশ্রণ অব্যাহত ও অপরিহার্য হয়ে থাকবে। পৃথিবীর আমেরিকা নামের গোলার্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের য়ুরোপীয় মানুষের মিশ্রণে ও সমন্বয়ে সর্বত্র রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠেছে—অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডে-দক্ষিণ আফ্রিকায়ও শ্বেতকায় মানুষের তেমনি রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধেছে। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসী ও কৃষ্ণকায়দের সম-

নাগরিক অধিকার দেয়নি বলে সেসব রাষ্ট্র দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতবহুল হয়েই রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই উপজন সম্প্রদায় বাঞ্ছিত ন্যায্য নাগরিক অধিকার পায়নি বলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সংগ্রামরত।

তবু আমাদের স্বদেশেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণার দাবি উঠেছে, পাঁয়তারা চলছে। তাতে অমুসলিমরা নাগরিক অধিকার-বঞ্চিত জিম্মি হয়ে যাবে। ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, আহমদিয়া, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, ত্রিপুরা, মগ, মুরঙ, মার্মা, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি ধার্মিক ও ভাষিক সম্প্রদায় ও জাতিসত্তা স্ব স্ব স্বার্থের ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলবে, রাষ্ট্র দ্বেষ-দ্বন্দ্ববহুল ও সংঘাতসঙ্কুল হয়ে উঠবে। এতে দেশ হবে মারাত্মক ক্ষতির শিকার আর রাষ্ট্র পড়বে স্থায়ী সমস্যার কবলে।

যেহেতু সব মানুষ কখনো নাস্তিক বা নির্বিশেষে মানবপ্রেমী হবে না, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সরকারই কেবল এসব রাষ্ট্রিক-নাগরিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পুঁজিবাদী সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও স্ব স্ব স্বার্থে স্বাধিকারে, সহিষ্ণুতায়, সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ ও মেনে চলার অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষিক, ধার্মিক, গোত্রিক, বার্ণিক ও আবস্থানিক মানুষ শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারবে।

ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বগঠনের বা আত্মনির্মাণের কাল থাকে। তখন মানুষ আত্ম-অভাব পূরণের, আত্মস্বার্থ রক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে, চিন্তায় ও কর্মে নিয়োজিত থাকে প্রায় অনন্যচিত্ত হয়েই। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের সাক্ষ্যই এর প্রমাণ। যে দিন-মজুর, সে যেমন পরার্থে ভাববার করবার সময়-সুযোগ পায় না, তেমনি দুর্বল দরিদ্র নিঃস্ব জাতি বা সম্প্রদায়ও সর্বদা আত্মস্বার্থের চিন্তায় ও কর্মে নিরত থাকে। এজন্যেই নতুন দল যখন গড়ে ওঠে, তখন সদস্যদের দলনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল থাকে—সে-দল সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি বা জীবন-জীবিকার যে-কোন স্বার্থ বা চাহিদা সম্পৃক্ত হোক না কেন। পরে কাল-প্রভাবে উদ্যম, উদ্যোগ, নিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা হ্রাস পেতে থাকে এবং বিস্মৃতি, বিকৃতি ও নিষ্ক্রিয়তা আসেই। কারণ, কাল সবকিছু নষ্ট করে। এ কারণেই ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, কিংবা আর্থিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও উত্থান ও পতন থাকেই। এ প্রাকৃতিক নিয়ম।

কাল-প্রবাহের মতো প্রজন্ম-স্রোতও চলমান। গতিশীল সৃষ্টি ও ধ্বংস, জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন। এ সত্যই প্রমাণ করে যে মানুষকে স্বকালে স্বসমাজে স্বচিন্তায় স্বচেতনায় স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচতে হয়। সুখে হোক, সমস্যায় হোক, এমনি বাঁচাই হচ্ছে স্বাভাবিক বাঁচা, প্রাকৃতিক নিয়মানুগ বাঁচা। কেননা এ পুরোনো পৃথিবী, এ-প্রকৃতি, এ-সূর্য, এ-চন্দ্র প্রতিটি নতুন মানুষের কাছে নতুন। একে চিরন্তন বলে মনে হলেও আসলে গোটা দুনিয়াটাই ক্ষণে ক্ষণে, চোখে চোখে রঙ বদলায়, রূপ পাল্টায়। বলা যায় ‘এক অঙ্গে এতো রূপ নয়নে না হেরি’। এর কারণ ‘যত মন তত রূপ’। চন্দ্র বা সূর্য একটি বটে, কিন্তু কাড়াকাড়ি না করেই বিশ্বভুবনের যে কেউ একে অখণ্ডরূপে এককভাবে একান্ত করে পায়।

কাল বহমান বলেই জীবনও অস্থির। ‘অসচেতন মানুষের জীবন কালস্রোতে অস্থির ক্ষয়ের দিকে ভেসে চলে কচুরিপানার মতো। অন্ধ পথ চলে আনন্দ পায় না, কিন্তু চক্ষুষ্মান পায়। তেমনি সচেতন মানুষও কালস্রোতে তৃণখণ্ড

বটে, কিন্তু তার জীবনে ভোগ-উপভোগের আনন্দ ও যন্ত্রণা দুই-ই থাকে। নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন দিন হয় শুরু। সে-নতুন দিনে জীবনও অভূতপূর্ব, এবং তার চাহিদাও সাময়িক। তার চলার পথের বাঁকে বাঁকে পাওয়া সম্পদ আর সমস্যাও তাই নতুন। সেজন্যে কোন ঐতিহ্য, পুরোনো জ্ঞান, বা পুরোনো কলা-কৌশল স্বকালের সমস্যার কালোপযোগী সমাধান দিতে পারে না, যদিও স্থূলদৃষ্টির মানুষের কাছে অতীতের সবকিছু বর্তমান কালেও পাথেয় বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের ওই ধারণার ফলেই তাদের জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মনে-মেজাজে সমকালতা অবহেলিত ও অনুপস্থিত থাকে। তাদের পিছিয়ে পড়া'র কারণ এ-ই।

কোন ব্যক্তি, দেশ বা জাত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, যে বা যারা দেহে-মনে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, শক্তিতে-নৈপুণ্যে, সাহসে-প্রত্যয়ে যত অসম্পূর্ণ, সে বা তারা সেই পরিমাণেই অতীতমুখী, ঐতিহ্যগর্বী ও পিতৃসম্পদ-নির্ভর। অর্থাৎ অক্ষমের অতীতপ্রীতি, ঐতিহ্যগর্ব ও আর্তনাদ-লুকোনো আস্ফালন অধিক। তারাও জানে পিতৃধনে ক্ষয় আছে, ম্লানিমা আছে, বৃদ্ধি নেই, জৌলুস নেই। কাজেই এ নির্ভরতা ও আস্ফালনের মূলে রয়েছে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য। নির্জিত মানুষের বাঁচার এও এক অবলম্বন। কিন্তু আমরা জানি যে 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।' তার কারণ আত্মপ্রত্যয়ী উত্তম জানে তার হারাবার কিছু নেই আর অধম আকাঙ্ক্ষা-রহিত বা নিরীহ-নির্বোধ বলেই উত্তমের কাছে তার সম্মানবোধ থাকে না—থাকে বরং কৃপালোভ ও ভয়জাত সঙ্কোচ। যার নিচে পড়বার আশঙ্কা এবং ওপরে উঠবার প্রয়াস সার্বক্ষণিক, সে-ই হচ্ছে মধ্যম। কাজেই তাকে সাবধানে, সতর্ক দৃষ্টিতে, গা-পা বাঁচিয়ে চলতে হয় সর্বক্ষণ। কেননা একবার পা পিছলে পড়ে গেলে কিংবা সুযোগ হারালে এ জীবনে উঠবার আর উপায় থাকে না।

যে-দল ঐতিহ্যের গণ্ডী আগে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, সে-দল হল আকাঙ্ক্ষাবান ঈহাপূর্তিকামী মধ্যমের—অধমের নয়। আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারের জন্যে তাকে উত্তমের সান্নিধ্যজাত চাপ এড়িয়ে ও স্বাতন্ত্র্যসচেতন হয়ে চলতে হয় বটে, কিন্তু প্রণোদনা-প্রেরণা পায় উত্তম থেকেই, উত্তমই তার আদর্শ ও অনুকরণীয়।

হাজার বছর ধরে ভারতের ইতিহাসে আমরা এই অভিলাষী মধ্যমের লীলাই

প্রত্যক্ষ করি। কাসেমপুত্র মহম্মদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে কেরালায় শঙ্করাচার্যের মনে জাগে অদ্বৈতবাদী চিন্তা। বিজয়ীর আদলে আত্মোন্নয়নের স্পৃহাই এ চিন্তা-চেতনার উৎস। এ চেতনার ম্লান ও বিকৃত অনুসৃতি রয়েছে মাধব, নিম্বার্ক, রামানুজ, ভাস্কর ও বল্লভের মতবাদে।

উত্তর ভারতেও তুর্কী-প্রভাবে একইভাবে মুক্তিচেতনা ও আত্মজিজ্ঞাসা জাগে চিরবঞ্চিত প্রতারিত ও শোষিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষের মনে। দ্রোহী হয় তারা, হয়ে ওঠে অদ্বৈতবাদী। সন্তধর্মের উদ্ভব ও ভক্তিবাদের বিকাশ ঘটে এভাবেই। চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে এর উৎকৃষ্ট পরিণতি। একই স্পৃহাবলে রামমোহনও হয়েছিলেন স্বধর্মদ্রোহী, ইংরেজের আদলে মন-মনন গঠন ও ব্যক্তিক-সামাজিক জীবন রচনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

পৃথিবীব্যাপী সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিবর্তিত হয়েছে ও এগিয়েছে দীপ থেকে দীপ জ্বালানো পদ্ধতিতেই। মৌলিক চিন্তা-চেতনা চিরকালই বিরলতায় দুর্লভ।

আঠারো শতকের শেষ পাদে ইংরেজ কোম্পানি শাসক হয়ে বসল ; তাতে কোলকাতায় তাদের দেশী বানিয়া-ফাড়িয়া-গোমস্তা-মুৎসুদ্দিরা অর্থে বিত্তে স্ফীত হল, কিন্তু তাদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন হল না।

উনিশ শতকে ইংরেজী চিত্তলোকে প্রবেশ করল অনেকের, অমনি তারা অনুভব করল সম্ভাবনার বাসন্তী হাওয়া। নতুন মুক্তিচেতনা, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসম্মানবোধ যে নতুন স্পৃহা জাগাল, তাতে মনে-মেজাজে, রীতি-রেওয়াজে, নিয়ম-নীতিতে, আচার-আচরণে ইংরেজ হওয়ার এবং কলকাতাকে লণ্ডন বানাবার প্রয়াসে-প্রযত্নে ত্রুটি ছিল না কোলকাতার ইংরিজিশিক্ষিতদেরও। ইংরেজ-সান্নিধ্যে-আসা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ব্রিটিশ প্রদর্শিত পন্থায় বিদ্যা ও বিত্ত অর্জন করে গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে কৃতী ও কীর্তিমান হল, তাদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিহিন্দুকে আধুনিক য়ুরোপীয় মানুষরূপে গড়া এবং বাঙালী হিন্দুর তথা ভারতীয় হিন্দুর পরিবারকে ও সমাজকে য়ুরোপীয় আদলে নির্মাণ, আর হিন্দুদের একটা সংহত আত্মসচেতন আধুনিক য়ুরোপীয় জাতি-রূপে দাঁড় করানো। এ লক্ষ্যে সারা উনিশ শতক ধরে স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রেমিক হিন্দুরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এভাবে ১৮৬০ সনের পর থেকে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা তাদেরকে মৌলিক বা

স্বস্থ ও সুস্থ চিন্তা-চেতনার যোগ্য করে তোলে। এদিকে কোম্পানির প্রশাসনের, শোষণের ও ব্যবসার সহযোগী হিসেবে প্রায় একশ বছর ধরে বাঙালী হিন্দু চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কোম্পানির যে অবাধ ও উদার অনুগ্রহ পাচ্ছিল তা চালু রাখা—কোম্পানি সরকারের ব্রিটিশ চাকুরেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা চালানোর অধিকারচ্যুতি, সাম্রাজ্যের কলেবরবৃদ্ধি, কোম্পানির শাসনক্ষমতার অবসান, শিক্ষিত হিন্দুর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে—ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিদ্যায় স্বাধিকারসচেতন এবং বিত্তে মানলিপ্সু আর হৃত-অনুগ্রহ হিন্দুমনে নিষ্ক্রিয় ব্রিটিশ বিদ্বেষ উপ্ত হতে থাকে ১৮৬০ সনের পর থেকেই। এর প্রথম অভিব্যক্তি মেলে জাতীয় ঐতিহ্য, সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রসূত হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠায়। বিশ শতকের গোড়া থেকেই চাকরি ক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া হিন্দু অধিকারে যখন বাঙালী মুসলমানও ভাগ বসাতে শুরু করল, এবং অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও সংখ্যানুপাতিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি পেশ করল, তখন হিন্দুসমাজ সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী হয়।

ইতিমধ্যে শিক্ষার প্রসারে, বিদ্যার বিকাশ বিত্তের ও বেসাতের বিস্তারে এবং সম্পদের সঞ্চয়ে বাঙলার বর্ণহিন্দুরা হয়েছে আত্মপ্রত্যয়ঋদ্ধ, উচ্চাভিলাষী। উনিশ শতকী নিঃস্বতা, অজ্ঞতা, হীনমন্যতাবশে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণ, হিন্দুর কল্যাণসাধন, হিন্দু জাতি গঠন, হিন্দু ঐতিহ্য-গৌরব স্মরণে আত্মবোধন ও প্রণোদনাপ্রাপ্তি লক্ষ্যে শিক্ষার এবং সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে উঠতি হিন্দুর চিন্তা ও কর্মের একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতিবৈরই। তখন অধিকাংশ স্বল্পবুদ্ধি ও স্থূলরুচি লিখিয়ে ব্রিটিশভীতিবশে অতীতের বিদেশী শাসককে—বিলুপ্ত তুর্কী-মুঘলকেও—ব্রিটিশ লিখিয়েদের অনুসরণে মুসলিম অভিধায় চিহ্নিত করে হিন্দুমনে ক্ষোভ, হিংসা, জাতিবৈর ও মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় ও আত্মোন্নয়নে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করার নীতি গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে ব্রিটিশের বিভেদ সৃষ্টির নীতিও ছিল যুক্ত। কিন্তু বিশ শতকে স্বস্থ, সুস্থ ও আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালী হিন্দুর সে প্রয়োজন ফুরিয়েছিল, তখন তারা ব্রিটিশ বিতাড়ন লক্ষ্যে দৈশিক জাতীয়তার বুলি আওড়াচ্ছিল।

১৮৬০ সনের পর থেকে ঐতিহ্যবাহী দেশী মুসলমানেরাও শিক্ষাক্ষেত্রে এল নগণ্য সংখ্যায়। এশিক্ষা ইংরেজী শিক্ষাই। তারাও হিন্দুদের মতোই

কেবল মুসলমানের তরক্কির কথাই ভাবছিল। বিত্ত, বেসাত ও চাকরি তখন হিন্দুর কবলে, তাই তাদের আত্মরক্ষণ, স্বার্থ সংরক্ষণ, আত্মোন্নয়ন ও স্বাতন্ত্র্য সাধনা গোড়া থেকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নিল। উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ হিন্দুভীতিবশে মুসলিমসমাজে ব্রিটিশ-প্রীতি জাগান, এবং হিন্দু-বিদ্বেষের প্রসার ঘটান। এর আগে মৌলবিদের নেতৃত্বে নিরক্ষর চাষী মজুর মুসলমানেরা ওহাবি আন্দোলন করে এবং সিপাহী বিদ্রোহে সহযোগিতা করেও ব্রিটিশ বিতাড়নে ব্যর্থ হয়। বলেছি, উনিশ শতকের হিন্দুরা আত্মোন্নয়ন-লক্ষ্যে কেবল হিন্দুর ও হিন্দুয়ানির ধ্যান করত। কিন্তু ভারতের বাইরে হিন্দু নেই বলে তাদের স্বধর্মীর জাতীয়তা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেনি। ফলে তাদের ধর্মীয় ও দৈশিক জাতীয়তা পরিণামে প্রায়-অভিন্ন হতে পারল। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ হয়ে এক আদর্শিক বিশ্বমুসলিম জাতীয়তায় অবসিত হল। এজন্যে মীর মশাররফ হোসেনের কয়েকটি রচনা ব্যতীত উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পাদের মুসলিমদের, রচনার বিষয়বস্তু বঙ্গবহির্ভূত তো বটেই, এমনকি ভারত বহির্ভূতও। স্বধর্মীর সেসব বিষয় সংগৃহীত হয়েছে স্পেন থেকে মধ্য এশিয়ায় ও সাহারা থেকে গোবি মরুতে তাদের মানস পরিক্রমার ফলে। আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটিশ-অনুগৃহীত হিন্দুরা যেমন প্রাক্তন শাসক মুঘলের প্রতি বিদ্বেষবশে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে জেনেছিল, তেমনি ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানেরাও অর্থে-বিত্তে-সংখ্যায় প্রবল হিন্দুভীতিবশে ব্রিটিশ শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে মেনেছিল। উনিশ শতকের হিন্দুরা যেমন মুসলিমদের মনে ক্ষোভ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগিয়ে দ্রুত আত্মোন্নয়ন কামনা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়া মুসলমানেরাও তেমনি মুসলিম মনে ব্রিটিশ-প্রীতি আর হিন্দুভীতি ও বিদ্বেষ জাগিয়ে মুসলিমদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা লালনের ও বৃদ্ধির প্রয়াসী ছিল। হিন্দু লিখিয়েদের মুসলিম বিদ্বেষের ও মুসলিমচরিত্র অবমাননার শোধ নিলেন মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ডাক্তার আবুল হোসেন, শেখ ইদ্রিস আলী, মতিয়র রহমান খান প্রমুখ অনেকেই। এবং শেষবয়সে মীর মশাররফ হোসেন আর কায়কোবাদও। মোটামুটিভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে হিন্দু রচিত সাহিত্য জীবনের ও জগতের বৃহত্তর ও মহত্তর পট ও পরিসর খুঁজে পায়। প্রায় অর্ধশতাব্দী

পরে শুরু করে বলেই মুসলিমদের 'মুসলিম স্বার্থ ও মুসলমানী স্বাতন্ত্র্য' সংরক্ষণের চেতনা এ-শতকের গোটা প্রথমার্ধেই প্রখর ও প্রবল থাকে। হিন্দুদের মধ্যে গোড়া থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো বহু উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী মনীষীর আবির্ভাব ঘটে, বাঙলাভাষী মুসলিমদের মধ্যে ১৯২০ সনের আগে নিতান্ত কয়েকজন মাত্রই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, এবং তাঁদের মধ্যে আবার বাঙলায় লিখিয়ে তেমন কেউ ছিলেন না। বলতে গেলে ১৯২০ সনের আগে এফ. এ. পড়া দু-চারজন থাকলেও গ্রাজুয়েট লেখকের শুরু মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী ইমদাদুল হক, তরীকুল আলম, শেখ ওয়াজেদ আলী, শেখ ওসমান আলী, একরামউদ্দীন, হেদায়েতুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, ইব্রাহিম খান, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ প্রভৃতিকে দিয়েই। এবং মোটামুটি ১৯৫০ সন অবধি কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত সবাই ছিলেন স্বল্প প্রতিভার লেখক। এজন্যে এঁদের মনের বন্ধনমুক্তি ঘটেনি। বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি এসব স্বল্প প্রতিভার, স্থূল চিন্তার ও অস্বচ্ছ দৃষ্টির লোকেরা স্বধর্মীর হৃত অতীতের জন্যে কান্না, বর্তমান রিক্ততার জন্যে ক্ষোভ এবং হৃত অতীতকে পুনরায় ভবিষ্যৎ করে তোলার স্বপ্ন ও সংকল্পই অভিব্যক্ত করেছেন তাঁদের রচনায়।

ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় দেখা যাবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই কেবল গাঁ-গঞ্জের হিন্দু-মুসলিমের তথা শিক্ষিতের-অশিক্ষিতের বিত্ত-বৃত্তি-বেসাত ক্ষেত্রে ব্যবধান দুস্তর ও অসহ্যরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। এর আগে মুঘল আমলে বৃত্তি ও বর্ণে বিন্যস্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজে হিন্দু-মুসলমানের দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কারণ ছিল প্রায়-অনুপস্থিত। শাসন-শোষণ-বঞ্চনার পুরাতন ব্যবস্থাকে নিয়ম-রেওয়াজ হিসেবেই মেনে নিয়েছিল সবাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনে-রাজত্বে যদিও বৃত্তিজীবীরা দুর্দিনে দুর্দশায় পড়ে আর্থিক অনটনে দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার হল, তবু তখনও গাঁয়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক-শৈক্ষিক ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর-তোলা শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষেই ছিল ব্রিটিশ বেনে ও দেশী জমিদার-মহাজন দ্বারা শোষিত তথা দারিদ্র্যকাতর। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষা গাঁয়ে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা সাগ্রহে নিল সে-সুযোগ ধনী ও মানী হওয়ার সহজ পন্থা হিসেবে। নিম্নবর্ণের হিন্দুর মতোই অধিকাংশ দেশী মুসলমানের শিক্ষার ঐতিহ্য

ছিল না বলে, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আর দেশজ মুসলমানেরা ধনে মানে হল বঞ্চিত, বর্ণহিন্দুরা বিদ্যায় ও ব্যবসায়ে নির্বিঘ্নে অধিকার পেয়ে চাকুরে, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী হিসেবে যেমন ধন ও দর্প দাপট কবলিত করে, তেমনি আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির, চিন্তা-চেতনার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারাই প্রথম ও প্রধান হয়ে ওঠে।

শহরে বিদ্যা ও বিত্ত অর্জন করে ওরা অর্থ সম্পদ গাঁয়ে-গঞ্জে নিয়ে আসে। ফলে অর্জনে অক্ষম, নিরক্ষর, দরিদ্রতর চাষী, মজুর ও বৃত্তিজীবী শোষিত মানুষের এবং বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থসম্পদশালী শোষক মানুষের দুটো দ্বান্দ্বিক শ্রেণী দ্রুত ও আকস্মিকভাবে গড়ে উঠল গাঁয়ে গাঁয়ে। নিম্নবর্ণের নিরক্ষর, নিঃস্ব, শোষিত হিন্দুরা হীনমন্যতা ও স্বাজাত্যগৌরববশে ছিল সহনশীল, কিন্তু মুসলমানদের এরূপ কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল না; তাই চিরন্তন নিয়মে অজ্ঞ মুসলিমের শোষক-বিদ্বেষ হিন্দু-বিদ্বেষের নামান্তর হল মাত্র। পূর্ববঙ্গে মুসলিম চাষী-মজুর-তাঁতী বেশি হওয়ায়, মুসলিম রাজনীতিকেরা হিন্দু শোষকের কথা বলে চাষী-মজুর মুসলমানের ভোট সংগ্রহ করেছে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে।

কাজেই উনিশ শতকের শেষার্ধই হচ্ছে বাঙালী মুসলিমের চরম দুঃখ-দুর্দশার কাল, আঁধার যুগ। আর্থিক বিপর্যয়, মানসিক বিমূঢ়তা ও ওহাবি-ফরায়েজী-সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতাজাত হতাশা কাটিয়ে স্বস্থ হতে ও আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে ইংরেজীশিক্ষা-রূপ-পন্থা খুঁজে পেতে তাঁদের পুরো পঞ্চাশ বছর লেগেছে। বিশ শতকের গোড়া থেকে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙালী মুসলমানেরা শিক্ষাকে দারিদ্র্য ঘোচানোর উপায় বলে জেনেছে। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যজাত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা শিক্ষিত মুসলমানেরা যখনই এবং যতই ভেবেছে (এবং এখনো ভাবে) তখনই এবং ততই বর্ণহিন্দু শোষকের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত ইতিহাসের তথ্য তথ্যের অভাবে এবং মার্কসীয় তত্ত্বে অজ্ঞতাবশে বঞ্চিতের ক্ষোভতাড়িত মুসলিমেরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের যে কারণ নিরূপণ করেছিল— যেমন ঈমানের শৈথিল্য, মুঘল রাজত্বের অবসান, ইংরেজদের পক্ষপাতিত্বে বর্ণহিন্দুর অর্থে-বিত্তে-শিক্ষায় প্রাগ্রসরতা, পূর্ববৈরবশে হিন্দুর মুসলিমদলন ও মুসলিম ইতিহাসকে বিকৃতকরণ, মুসলমানদের সাতশ বছরের দান ও প্রভাব

অস্বীকার, প্রতিহিংসায় ও স্বার্থবশে শিক্ষা ও সম্পদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের দাবিয়ে রাখার হিন্দুপ্রয়াস—তার জন্যে তাদের দোষ দেয়া যায় না। হিন্দুরা তার আগেই মুসলিমদের এভাবেই দায়ী করেছিল হিন্দুর দুর্ভাগ্যের জন্যে। অতএব, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদের সমবয়সীরা বা কমরুথ আহমদের বয়সীরা ওই প্রতিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে তাঁদের চেতনায় দুর্বল সংখ্যালঘু-সুলভ মুসলিম স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি প্রবল থাকতে পারে, হিন্দুভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ সে-প্রতিবেশে স্বাভাবিক বলে মানব। তাই উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের লেখকের প্যান-ইসলামিজম, অতীতমুখিতা ও স্বধর্মীয় গৌরব-গর্বপ্রবণতাকে আপন নিঃস্বতা-হীনতার গ্লানি ভোলার ও আত্মবোধনের স্থূল প্রয়াস বলেই জানব।

কিন্তু বর্তমান শতকে ত্রিশোত্তরকালে যাঁদের জন্ম, তাঁদের কথায় কথায় বিপন্ন অস্তিত্ব ইসলামকে বাঁচানোর জিগির তোলা, ইসলামী মূল্যবোধের কাল্পনিক অবক্ষয়ে শঙ্কিত হওয়া, অনির্দেশ্য ইসলামী তমদ্দুন-তাহজিব বিলুপ্তির আশঙ্কায় সদাসতর্ক থাকা এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবন কামনা প্রভৃতি মানসিক রোগ বৃদ্ধির কারণ সহজে খুঁজে পাইনে। কেননা এযুগের আগে কখনও ইসলামী শাস্ত্র সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের জ্ঞান বেশি ছিল না। অজ্ঞ মানুষের আচার-আচরণে কুসংস্কার প্রকট ছিল বটে, কিন্তু যথার্থ ইসলামী জীবনবোধ সম্বন্ধে আগে কখনো কারো (ষোল শতকের পীর, মীর, সৈয়দ, শাহ প্রভৃতি অনেকের) ধারণাই স্পষ্ট ছিল না। ইসলামকে এমন করে এত বেশি মাত্রায় রাজনীতির ও বৈষয়িক উন্নতির উপায়রূপেও হয়তো ইতিপূর্বে কেউ ব্যবহার করেনি। যে-শ্রেণীর লোক এ-ইসলাম রক্ষায় ও ইসলামী তমদ্দুন-তাহজিব রক্ষায় ব্রতী, মুজাহিদ, তাদের চালবাজিটাই প্রকট, ধার্মিকতা দৃশ্য নয়। তারা দেশী মুসলমানের কি উপকার করছে জানিনে, তবে দেশকাল ও স্বজীবন-জীবিকা সচেতন হয়ে সুস্থ ও স্বস্থভাবে বাঁচার পথে যে বাধা সৃষ্টি করছে—তাতে সন্দেহ নেই। দেশ-কাল-নিরপেক্ষ আদর্শিক বিশ্বমুসলিম জাতীয়তা তার ঐহিক জীবনে যে কোন শ্রেয়সের দিশা পূর্বেও কোনদিন দিতে পারেনি, ভবিষ্যতেও যে কোনদিন দিতে পারবে না—তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কারণ ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য মেলে না, সম্ভব নয় বলেই। অনুন্নত দেশের মুসলিমদের এ অতি-ইসলামচেতনা যে পশ্চিমা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের দান ও চাল, তা

যে-কোন বুদ্ধিমানই বোঝে, এর বিরুদ্ধে বলে না তারা চরিত্রহীন, সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থবাজ বলেই।

শুদ্ধি, ঈমান, দলীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বচেতনা, সম্পদপ্রাপ্তি, রাজ্যজয়, ব্যক্তির বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতির যৌগপত্য বা আকস্মিকভাবে সমকালীনতা ও একাধারতা—মুসলিম মনে সবটার আপাতঅভিন্নতার ধারণা ও কারণ-করণ সম্বন্ধবোধ জন্মায়। এ বিভ্রান্তি থেকে আজ অবধি মুসলমান জননেতারা ও চিন্তাবিদেরা শ্রেণী-স্বার্থেই মুক্ত হতে চাননি; এবং তারা মুসলিম জনগণকেও এ ভুল ধারণায় অভিভূত রাখার লাভজনক কাজে আজো দৃঢ়সংকল্প। নইলে সাদা চোখেই তারা দেখতে পায়—ইসলাম বরণ করে ঐহিক জীবনে কেবল মক্কা-মদিনার মুসলমানেরাই—খ্রীষ্টীয় বারো শতক অবধি হাশেমী আব্বাসীয়রাই—কেবল লাভবান হয়েছে, অন্যরা দৈশিক জাতি হিসেবে বরং ঐহিক জীবনে পরাধীনতাই বরণ করেছে—ইসলাম বরণে ব্যক্তিজীবনে অন্যদের লাভ যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হচ্ছে মানসিক ও পারত্রিক—যা অন্যসব ধর্মেরও বারোআনা লক্ষ্য। ইহলৌকিক জীবনকে তুচ্ছ করে পারলৌকিক জীবনকে গুরুত্ব দিলে দেশ-কালের ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধীন ঐহিক জীবনে বাস্তব দুঃখ-যন্ত্রণা ও সমস্যা বাড়ে—ব্যক্তিক আর জাতীয় জীবনও থাকে বিপন্ন।

কোন দেশের সংখ্যা লঘু, বিত্তায় বিত্তে অনগ্রসর কিংবা পরাধীন সম্প্রদায় সাধারণ স্বসত্তার, স্বশাস্ত্রের ও স্বসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে এবং জাতিবৈরের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের জন্যে সর্বক্ষণ স্বাতন্ত্র্যের প্রধান ভিত্তি শাস্ত্র ও সংস্কৃতি-সচেতন থাকে। পাকিস্তানে ও বাঙলাদেশে বাঙালী মুসলিমের বিপন্ন সত্তা-সংস্কৃতিবোধ কিংবা সতর্ক শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি জাগ্রত রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না—এখনো নেই; কারণ এখন দেশে মুসলমান প্রতি শতে পঁচানব্বই জন। বিত্তায়, বিত্তে, বৃত্তিতে ও বাণিজ্যে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অধমের প্রভাবে পড়ার আশঙ্কা উত্তমের থাকে না। তাই এক্ষেত্রে তার লক্ষ্য, দৃষ্টি ও পথ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন। তবু কেন এক শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক এবং সরকার ইসলামী তমদ্দুন-তাহজিব বিলুপ্তির আশঙ্কায় ও বিপন্ন ইসলামের রক্ষায় বিচলিত হন ও প্রচারতৎপর হয়ে ওঠেন? গাঁ-গঞ্জের আট কোটি অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমান ইসলামকে কিংবা ইসলামী তাহজিবকে যে বিপন্ন কিংবা পরিহার করতে পারে না, তা সরকারও জানে। তাহলে ইসলামের শত্রু হিসেবে

শহরে মুমীনের ও সরকারের, আতঙ্কের কারণ কারা?—যারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, যারা শহরে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দল—তারাই। অতএব কমিউনিস্টভীরু মার্কিন ও সউদি আরব-স্বার্থেই এখানে মুমীনকে নতুন করে ইসলামনিষ্ঠ করার এ বিপুল আয়োজন, এ অশেষ অপচয়, এ বিচিত্র জিগির! এখনো কি অলীক যুক্তবঙ্গের হিন্দুভূতের ভয়ে তারা ত্রস্ত থাকবে! একদিকে রাষ্ট্রপতি দেশে সবাইকে বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী হতে আহ্বান জানান আর বাইরে আত্মপরিচয় দেন মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে; অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-মুদ্রিত বিকৃতবাঙলা কেতাবে বিশ্ব-মুসলিম জাতীয়তাই প্রকট। বাঙালী মুসলিম কি কখনো দৈশিক ও ঐহিক জীবনের চিন্তাচেতনা নিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে আত্মপ্রত্যয়ীরূপে আত্মোপলব্ধির ও আত্মবিকাশের পথে এগোবে না, কেবল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা স্বপ্নে এবং অতীতের ও বিদেশের মুসলিম কৃতিগর্বে বিভোর থাকবে? আমরা কি চিরকাল কেবল মুসলিমই থাকব, বৈষয়িক ঐহিক মানুষ হব না?

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ

১৫১৬ সন থেকেই পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আসা শুরু করেছে। একশ বছরের মধ্যে য়ুরোপীয় বেনে কোম্পানীরা—পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ এবং আর্মেনীয়রা—সমুদ্রপথে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তখন বিনিময় মাধ্যম পণ্য থেকে মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়েছে বহুল পরিমাণে। দেশী বেনে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-মহাজন-গোমস্তা-দেওয়ান-দালালের চেতনায় এ নতুন রীতি নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। সে-সঙ্গে দেশী রাজপুরুষ-পরিবারেও সহজে অর্থসম্পদ অর্জনের বাসনা হয়েছে প্রবল। তখন কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারী মাত্রেই ঈর্ষার ও আকর্ষণের পাত্র, কোম্পানীর লোক মাত্রেই দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তারা বিত্তায়, বুদ্ধিতে, বাণিজ্যনীতিতে, যুদ্ধাস্ত্রে, হিসেব রাখার পদ্ধতিতে, বাণিজ্যচুক্তির ধরনে-ধারণে, পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞানে আর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নতুন এবং অনন্য।

পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি গোটা য়ুরোপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, চিন্তায় ও চেতনায়, সম্পদে ও সমস্যায়, বিশ্বাসে ও সংস্কারে, নিয়মে ও নীতিতে, মতে ও পথে, বিত্তায় ও বোধে নানা ভাঙা-গড়ার, বিরোধ-বিবাদের, সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিজয়ে-উৎকর্ষে উন্নত ও উত্তীর্ণ। এরা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পাঁচ মহাদেশের সর্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করেছিল উন্নততর বিত্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও বাণিজ্যবুদ্ধি প্রয়োগে। উত্তর আফ্রিকার ও এশিয়ার সভ্য-ভব্য মানুষের রাজা-রাজ্য তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই শেষাবধি টিকতে পারেনি। ইংরেজের ভারত জয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাপ্ত হলেও, তুর্কীসাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অবশ্য য়ুরোপীয় শক্তির ১৯১৮ সন অবধি সময় লেগেছে। এতকাল পরেও আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-প্রকৌশলের ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসাদপুষ্ট য়ুরোপের কাছে আজো আফ্রো-এশিয়া সমকক্ষতা দাবি করতে পারছে না। জাপান অবশ্যই ব্যতিক্রম।

কাজেই মীরজাফর-জগৎশেঠ-রাজবল্লভ ষড়যন্ত্র না করলেও, পলাশীতে যুদ্ধ না হলেও, য়ুরোপীয় যে-কোন কোম্পানী ভারত দখল করতই। তার প্রমাণ, অনুরূপ ষড়যন্ত্রের সুযোগ না-পেয়েও একশ বছরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ এক

রকম বিনা যুদ্ধেই ইংরেজের পদানত হয়েছিল। এ সূত্রে গোয়া, দমন, দিউ, কারিকল, মাহে, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি এলাকায় পর্তুগীজ ও ফরাসী অধিকার স্মর্তব্য।

তখন ভারতব্যাপী চলছিল অবক্ষয় যুগ, অর্থাৎ তখন নীতিনিষ্ঠা, বিবেক, আদর্শানুগতা, দায়িত্বচেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি এদেশের মানুষে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। সিরাজুদ্দৌলা তাই পলাশীর পরাজয়েই নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ, মীরজাফর নবাব হয়েও অসহায়, মসনদলোভী বিশ্বাসঘাতক মীরকাসিম তাই অসমর্থিত ও পরাজিত।

তা ছাড়া, তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ছিল বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী। দেশের সত্তর ভাগেরও বেশী অধিবাসী ছিল অমুসলমান। স্বল্প সংখ্যার শাসক মুসলিম থাকত শহরে—শাসনকেন্দ্রে, দেশজ মুসলিমেরা ছিল নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের ও নির্বিত্তের নিরক্ষর বৃত্তিজীবী দরিদ্র মানুষ। দেশী খ্রীস্টান ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে যেমন কোনো আত্মিক-বৈবাহিক-সামাজিক-প্রশাসনিক সম্বন্ধ ছিল না, এদের মধ্যেও ছিল তেমনি অনাত্মীয়তার অপরিচয়ের আর অসম্পর্কের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া দেশজ মুসলিমদের মধ্যে কচিৎ কেউ সাক্ষর ও শিক্ষিত হিসেবে মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলবী-মুন্সী-উকিল-হাকিম-কাজী থাকলেও, অন্য সব ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী আর চাষী মুসলিমরা ছিল চিরকাল গাঁয়ে গাঁয়ে সংখ্যায় ও বিত্তে নগণ্য। হিন্দুর গাঁয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরাই ছিল জোত-জমির, অর্থ-সম্পদের, বিত্ত-বেসাতের ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী। পঞ্চায়েত-পাটওয়ারী-রাজস্ব-সংগ্রাহক গোমস্তা ছিল চিরকালই হিন্দু। অতএব সাধারণভাবে দেশী বৃত্তি-জীবী আতরাফেরা বা আজলাফেরা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা চিরকালই ছিল হিন্দু জমিদার-মহাজন-গ্রাম্যপ্রশাসক-চিকিৎসক-শিক্ষকের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের কালিক রেওয়াজ মতো দাসপ্রায় অস্পৃশ্য দীন-দুর্বল অজ্ঞ-অনক্ষর প্রজা। কাজেই স্বধর্মী তুর্কী-আফগান-মুঘল-ইরানী রাজা-রাজপুরুষের, শাহ-সামন্তের জাতিত্বের গৌরব-গর্ব অনুভব-করবার কিংবা জাতির শক্তি-সম্পদের ছিটেফোঁটা লাভের সুযোগ তারা পায়নি কখনো। আজো বাঙলায় বিহারে ওড়িশায় পুরোনো আশরাফ মুসলিমদের কচিৎ কেউ দেশজ মুমীনের বংশধর। অতএব পতনযুগে কোন্দলাসক্ত তুর্কী-মুঘল-ইরানী শাসক-সুবাদারেরা দেশজ মুসলিমের সাহায্য-সমর্থন পায়নি। আর বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী শাসকের

প্রতি হিন্দুদের প্রীতি প্রত্যাশিত ছিল না। বাস্তবেও তারা নাকি তখন মুসলিম বা মুঘল শাসনের অবসানকামী হয়ে উঠেছিল। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকেই ছিল হিন্দু। সুতরাং মীরকাসিমের পরাজয়ে (১৭৬৪ সনে) বা দিল্লীর বাদশাহ থেকে দেওয়ানী লাভে (১৭৬৫ সনে) ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারপ্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছিল মাত্র।

কোম্পানী কেবল শোষণ করবে, কি শাসন-শোষণ সমভাবে চালাবে—সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে কোম্পানীর প্রায় তিরিশ বছর লেগেছিল। অবশেষে ১৭৯৩ সনে ইংরেজরা শাসনের দায়িত্ব ও শোষণের শাসকসুলভ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এর আগের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ছিল বন্দরনগরী কোলকাতার ইংরেজ-বাঙালীর বেদেরেগ বেপরওয়া জনসম্পদ লুটপাটের কাল। তখন কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষায় অজ্ঞতা, এবং দেশী বেনে-ফড়ে-গোমস্তা-মুৎসুদ্দি-দেওয়ানের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব জনজীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে। কার দণ্ড কখন কার মুণ্ডে পড়ছে—দেখবার, জানবার ও বলবার লোক ছিল না তখনকার কোলকাতায়, তথা দেশে। দ্বৈত-শাসন নামের দুঃশাসনে ও নৈরাজ্যে ঘুষখোরের, জালিমের, মতলববাজ টাউটের, জমিদার-মহাজনের, লুঠেরার, মজুতদারের, প্রতারকের ও লম্পটের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল দেশ। এ সময়ের দুর্নীতি-দুষ্কর্মের জন্যেই হয়েছিলেন ক্লাইভ ও হেষ্টিংস অভিযুক্ত।

ইংরেজের হাতে শাসনক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনা বিভাগের তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ও উত্তরভারতীয় পদস্থ কর্মচারীরা উত্তরভারতের দিকেই পালাল। যে-নগণ্য সংখ্যক লোক রয়ে গেল, তারা মুর্শিদাবাদেই থাকল, কিছু বিদেশী বুদ্ধিমান উকিল মুর্শিদাবাদ ছেড়ে রোজগারের লোভে কোলকাতায় চলে এল। কোলকাতায় আরও এল উর্দু ভাষী বৃত্তিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিছু মুসলিম। ফলে কোলকাতায় কোম্পানীর প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তাদানের জন্যে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার ধনী-মানী-জ্ঞানী হিন্দু পুরুষ পাওয়া গেল অনেক, চাকরি করার জন্যে তো মিলল অসংখ্য। কিন্তু দেশজ মুসলিমদের প্রতিনিধিরূপে তাদের হয়ে, তাদের স্বার্থে তাদের জন্যে কোম্পানীকে পরামর্শ দেবার কোনো বাঙলাভাষী দেশজ মুসলমান মিলল না। আর দেশজ মুসলিমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক এবং বৃত্তি-পেশাগত জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই

ছিল না বিদেশাগত উর্দুভাষী ফারসীবিৎ কোলকাতা ও মুর্শিদাবাদ শহরবাসী কোম্পানীর উপদেষ্টাদের। আশ্চর্য তবু সে-ধারায় উর্দুভাষী জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রায় ১৯৪৭ সন অবধি বাঙালী মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান ছিল অধিকাঠামোয় নামত শাসক-শাসিত; কার্যত শহরে-বন্দরে-দপ্তরে, সেনাবিভাগে, দরবারে মুসলমান ছিল হিন্দুর ও শাসকগোষ্ঠীর সম বা ঈষৎ-অসম শরীক বিশেষ। গোটা ভারতে রাজস্ব-বিভাগে হিন্দুর চাকরি ছিল প্রায় একচেটিয়া। তেরো-চোদ্দ শতকে গাঁয়ে হয়তো মুসলিমই ছিল না, পনেরো শতক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতি শতকে বেড়ে বেড়ে শতকরা পাঁচ/দশ/পনেরো/বিশ/পঁচিশ হচ্ছিল হয়তো আঠারো শতক অবধি। আর যেহেতু গাঁয়ে-গঞ্জে জমাজমি, অর্থসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, জমিদারী, মহাজনী, চিকিৎসা, রাজস্বআদায় ও প্রশাসন প্রভৃতি ছিল সাতশ বছর ধরে বর্ণহিন্দুদের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের অধিকারে, সেহেতু গাঁয়ে-গঞ্জে দেশজ মুসলিমেরা ছিল নির্জিত আর বর্ণহিন্দুর শাসিত ও শোষিত, এবং তারা ছিল অস্পৃশ্য বৃত্তিজীবীদেরই সমশ্রেণীর। ব্যতিক্রম ছিল বিরল। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে তুর্কী-আফগান-মুঘল আমলে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম ছিল অসম, অপ্রতিযোগী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী।

কোম্পানী-আমলে আকস্মিকভাবে সে সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেল; যদিও বাহ্য বৈষয়িক সম্পর্ক রইল অটুট। এখন হিন্দু-মুসলিম পরস্পর প্রতিবেশী, শাসক-শাসিত নয়। আগেও কার্যত তা-ই ছিল, কারণ শাসক মুসলিমেরা ছিল ব্রিটিশের মতোই বিদেশাগত এবং প্রশাসনকেন্দ্রবাসী, তারা কখনো প্রতিবেশী ছিল না। এখন তারা মুর্শিদাবাদে নবাববাড়িতে ছাড়া আর কোথাও দৃশ্যমান নয়। হিন্দুর মনে বিদ্বেষ ছিল শাসক মুসলমানের প্রতি, তাদের অভাবে ব্রিটিশ বিরানরচিত ইতিহাস পড়ার ফলে (তুর্কী-আফগান-মুঘল নামের পরিবর্তে অভিসন্ধিমূলক মোহামেডান বা মুসলমান নাম প্রয়োগের প্রভাবে, অথচ ইংরেজ কথনো খ্রীস্টান হল না।) হিন্দুরা তাদেরই গাঁয়ের দাসপ্রায় অস্পৃশ্য নিঃস্ব প্রজাকে প্রাক্তন তুর্কী-মুঘল প্রভুর জ্ঞাতি কল্পনা করে তাদের প্রতি চিন্তায়, কথায়, কাজে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে ঘৃণার, অবজ্ঞার, উপহাসের, নিন্দার, ক্ষোভের ও বিদ্বেষের বিষ ছেটাতে লাগল ডনকুইকসোটি কায়দায় সারা উনিশ শতক ধরে।

নিরবলম্ব দেশজ নবশিক্ষিত মুসলিমেরাও হিন্দু-ব্রিটিশের বানানো এ তত্ত্ব লুফে নিল। কামার-কুমার-তাঁতী-তেলী-ডোম-শিকেরী-চাষী-মজুরের জাতি দেশজ অ'তরাফ মুসলিমরা এ ভাবে তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী ও জাতি হয়ে একাধারে খান্দান এবং স্বধর্মীর জাতিচেতনা লাভ করে হল ধন্য। এতকাল পরে তারা উপলব্ধি করল—দিল্লী-আগ্রার বেবাক কেল্লা-কুঠি, মঞ্জিল-মসজিদ, তাজমহল-শালিমারবাগ এক হিসেবে তাদেরই, নিজের না হলেও চাচার ধন-দৌলত আর খ্যাতির মতই, ভোগে না আসুক—পরিচয়-গৌরব থেকে বঞ্চিত করে কে! তখন থেকেই শুধু ভারতবর্ষ নয়, স্পেন-উত্তরআফ্রিকা-আরব-ইরান হয়ে মধ্য এশিয়া অবধি যেখানে যা কিছু মুসলিম নামসম্পৃক্ত সবটাই হল তাদের বলতে গেলে নিজেদেরই। কেননা ইসলামে দেশ-কালের গুরুত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান স্বীকৃত নয়, কেবল স্বধর্মীর অভিন্ন সত্তাই একমাত্র পরিচয়চিহ্ন। এ জন্যে উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম চা'র দশক অবধি নজরুল ইসলাম তক্ সব মুসলমানের অনুধ্যানের, রচনার, আলোচনার, গৌরবের, অনুভবের, চিন্তার ও ভাবনার বিষয় ছিল পনেরো শতক অবধি অতীতের মুসলিমজগৎ। স্বদেশের ও নিজেদের উদ্ভবের ইতিহাসে অজ্ঞতা'ই এর জন্যে দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পরে উর্দু'ভা'ষী দেলোয়ার হোসেন, এবং আবুল হো'সেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ কয়েকজন মাত্র। এভাবে তাদের কায়িক ও বৈষয়িক বাস ছিল বাঙলাদেশের কুটীরে ও প্রান্তরে, খেতে ও খামারে, হাটে ও বাজারে, কিন্তু মানস-বিচরণের ক্ষেত্র হল স্বপ্নে ও শুনে-পাওয়া অদেখা ভুবন। এ রোগ তাদের মো'টামুটি ১৯৬০ সন অবধি ছিল। রাজনৈতিক চাল হিসেবে বাঙলার একশ্রেণীর সুবিধেবাদীর প্রচারণার ফলে অজ্ঞ ও স্বল্প-বুদ্ধির মুসলিমেরা এখনো এ রোগের শিকার।

বস্তুত কোম্পানীআমলে এভাবেই বাঙলার হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশী বানানো তত্ত্ব অঙ্গীকার করেই জীবনের ও মননের সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্তায় ও পৃথক ধারায় পরস্পরের চিরশত্রু, চিরপ্রতিযোগী, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আধুনিক জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা নিয়ে আত্মরক্ষণে ও আত্মপ্রসারণে আত্মনিয়োগ করে। কোম্পানীশাসনের ও প্রতীচ্যবিদ্যার ফলে বাঙলায় এবং ভারতেরও সর্বত্র শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হিন্দুজাতীয়তায় এবং মুসলিম স্বধর্মীর অভিন্ন জাতিচেতনায় মুগ্ধ ও লুব্ধ হচ্ছিল। কেউ আর নিছক বাঙালী বা বিশুদ্ধ ভারতীয় রইল না। বিরোধের

ও বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়িয়েছিল উর্দু ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। হিন্দুরা দেখল উর্দু রচনায় হিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, তাই তারা নাগরী অক্ষরে হিন্দীর চর্চা শুরু করল। বাঙালী মুসলিমও দেখল হিন্দুর বাঙলা রচনায় মুসলিম অনুল্লেখিত কিংবা অবজ্ঞাত বা নিন্দিত, তারাও তাই বাঙলাকে জানল হিন্দুর ভাষা বলে, নিজেদের জন্যে তাই কামনা করল উর্দু বা ফারসী।

নিরক্ষরদের মধ্যে অবশ্য এ সচেতন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু বিশ শতকের ভোটাধিকার তাদেরও মনে ও আচরণে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনা এবং বিধর্মীদ্বেষণা জাগিয়ে দিয়েছে। এভাবেই বাঙলার তথা ভারতের হিন্দুর ও মুসলিমের স্বতন্ত্র ইতিহাসের শুরু, যদিও হাট-ঘাট, বাট-মাঠ আর খরা-ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা রইল অভিন্ন, যদিও ওলা-শীতলা-ম্যালেরিয়া দেবীর মতো জমিদার-মহাজনেরাও হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য কখনো স্বীকার করেনি।

২

এবার কোম্পানীআমল থেকে আধুনিক বাঙালীর ক্রমোন্নতির ধারা আমাদের আলোচ্য। হিন্দু ও মুসলিম নিজেরা জীবনবিরোধী স্বাতন্ত্র্য-চেতনা বয়ে চললেও প্রকৃতি তাদের সমর্থন করেনি। এর পরেও তারা স্ব-স্ব প্রয়োজনে দ্বন্দ্বে-মিলনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বাস করছে। একজনের গায়ের গন্ধ লাগছে অপরের নাকে, একের ঘরের আগুনে পুড়ছে অন্যের ঘর। যুক্তবঙ্গে যেমন ছিল, স্বাধীন বঙ্গে-বাঙলায়ও তেমনি রয়েছে। কাজেই কোন অবস্থাতেই কেউ কারো প্রতি উদাসীন থাকতে পারছে না, নিজের বাঁচার গরজে তাই ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, বিদ্বেষে, শত্রুতায়, সহিষ্ণুতায় কিংবা বিরোধে-বিবাদে স্মরণ ও সহাবস্থান করতেই হচ্ছে। অতএব, হিন্দুর ইতিহাস কিংবা মুসলিমের ইতিকথা এ-দুয়ের কোনটিকে বাদ দিয়ে বাঙলার ও বাঙালীর কোন বৃত্তান্তই কখনও পূর্ণাঙ্গ হবে না—হতে পারে না।

কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরেই ছিল ইংরেজ কোম্পানীর আদর ও আড্ডা। তিনটে বন্দরই ছিল মুঘল শাসনকেন্দ্র থেকে দূরে এবং একান্তভাবে হিন্দুঅধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। বন্দরে ইংরেজের বাণিজ্যসহযোগী, বেয়ারা, বরকন্দাজ, সেরেস্তা থেকে বেনে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-মহাজন-দেওয়ান-দালাল এবং ব্যবসায়ী অবধি সবাই ছিল হিন্দু। কাজেই দেশের মুঘল-উত্তর ইতিহাসের

শুরু থেকেই শাসক ইংরেজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগী শহুরে বর্ণহিন্দুর উত্থান ও আত্মবিস্তার সমান্তরাল।

বলেছি, ১৭৯৩ সনের পূর্বেকার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরব্যাপী নৈরাজ্যের ও অস্থিরতার সুযোগে কোম্পানীর বন্দরবাসী দেশী-বিদেশী কর্মচারীরা এবং প্রশাসনিক কাজের মফস্বলবাসী সহযোগীরা ঘুষে, লুটে ও তথাকথিত সওদা-গরীতে প্রাপ্ত অর্থে ধনী-মানী হয়ে উঠেছিল। তাদের কেউ কেউ সেই অর্থ পুঁজি করে হল ব্যবসায়ী, কেউ কেউ নিলামে জমিদারী কিনে হল জমিদার। নতুন ও পুরোনো জমিদারদের কেউ কেউ ছিল মুর্শিদকুলী খান নিয়োজিত ইজারাদার বংশীয়ও।

কিন্তু উনিশ শতকের আগে রামমোহন ব্যতীত কেউ তেমন ইংরেজী ভাষা জানত না। আভাসে ও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী শব্দ উচ্চারণে ইংরেজ মনিবের সান্নিধ্য ও সুনজর-লিপ্সুরাই তখন ছন্দোবদ্ধ ছড়া বা আর্যার মাধ্যমে (if যদি is হয় what অর্থ কি ? ইত্যাদি) ইংরেজী শেখার কসরত করছিল। আর উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই ইংরেজ কর্মচারীদের ঘরে ঘরে বেনে-ফড়ে-মুৎসুদ্দির সন্তানদের ইংরেজী শেখানোর স্কুল বসে গেল—এখনকার ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় গিন্নির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের মতোই। এ ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের নাম ও দান স্মরণীয়।

ইংরেজীকে প্রশাসনের মাধ্যম করার কথা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে তখনো না এলেও বিচক্ষণ লোকেরা বুঝল—আত্ম-উন্নয়নের তথা ধনী-মানী হবার যাদুমন্ত্র হচ্ছে ইংরেজীভাষা উচ্চারণ ; তাই কোলকাতায় গোঁড়া হিন্দু আর জাতিচ্যুত কালো খ্রীস্টান অথবা ফারসী-সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিত-মুন্সী সবাই সাগ্রহে সাড়ম্বরে ১৮১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত করল বর্ণহিন্দুর জন্যে হিন্দুকলেজ। এখন থেকে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী বিদ্বানেরা পরিচিত হচ্ছিলেন পণ্ডিত, মুন্সী ও মৌলবী নামে, আর ইংরেজীশিক্ষিত তরুণেরা অভিহিত হচ্ছিল 'এজু' (Educated) আখ্যায়—এবং ডিরোজিওপন্থী দ্রোহীরা নিন্দিত হল 'ইয়ং-বেঙ্গল' রূপে। সাধারণ এজুরা হল ডেপুটি, মুন্সেফ, দারোগা প্রভৃতি এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের চাকুরে, আর শিক্ষক উকিল ব্যবসায়ী প্রভৃতি। ইয়ংবেঙ্গলেরা সকালে ছিলেন নিন্দিত, পরবর্তীকালে হলেন বন্দিত। ইয়ংবেঙ্গল ও অন্যান্যদের অভিব্যক্ত মনীষাই একালে 'রেনেসাঁস' অভিধায় চিহ্নিত ও

প্রশংসিত হয়েছে ও হচ্ছে।

সম্প্রতি রেনেসাঁস বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। হালে প্রশ্ন উঠেছে উনিশ-শতকী কোলকাতার প্রতীচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের—ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের-মনীষার অভিব্যক্তিকে, কর্মের উদ্যোগকে 'রেনেস াঁস' বলা যায় কিনা, গেলেও তাকে বাঙলার ও বাঙালীর রেনেসাঁস আখ্যায় অভিহিত করা যাবে কিনা।

মানবীয় মনীষার, মননের, সংস্কৃতির ও সভ্যতার য়ুরোপীয় উৎকর্ষে ও বিকাশে আমরা মুগ্ধ। তাই আমাদেরও সর্বপ্রকার জীবনস্বপ্ন য়ুরোপীয় আদলে রচিত। কাজেই নামে-কামেও আমরা সব সময়ে য়ুরোপকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি। স-তাৎপর্য 'রেনেসাঁস' কথাটিও সেখান থেকেই নেয়া। রেনেসাঁস হচ্ছে জীবনের জাগরণ, পুরোনো ধারার বা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ নবজাগরণ বা নবজন্ম। ইতালীর জাগরণের ইতিকথা রচয়িতা 'জর্জো ভাসারি'-ই নবজাগরণ বা নবজন্ম ঘটানো সৃষ্টিসম্ভব মনস্বিতা অর্থে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আসলে ব্যক্তিজীবনেও ঘটে নবজন্ম—নবজাগরণ। যৌবনের দৈহিক-মানসিক পরিপূর্ণতার অবচেতন অনুভবে ব্যক্তিও আত্মপ্রকাশের আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিকাশের কাঙ্ক্ষাচালিত হয়, তখন সে কল্পনায়, কর্মে, উদ্যমে, উদ্যোগে এক অনির্বচনীয় আবেগ ও আগ্রহ অনুভব করে, প্রাণের এই আনন্দিত আবেগ, অস্পষ্ট অনুভবের এই পুলক তাকে করে কস্তুরী-মৃগের মতোই চঞ্চল। দিকে দিকে আত্মবিস্তারের এই সময়কার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে তার প্রবণতা, শক্তি ও মেধা অনুসারে বানায় কোনো কিছুর স্রষ্টা বা কোনো কিছুর উদ্গাতা, আবিষ্কর্তা কিংবা প্রতিষ্ঠাতা।

সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর ধারায় প্রবহমান জনস্রোত। কোনো দেশে কোনো বিশেষ কালে আকস্মিকভাবে একই সময়ে যদি তেমন একদল শক্তিমানের মনীষা জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায়, কর্মে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে, কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সেদেশের, সেকালের মানুষের জাতীয় জীবনে রেনেসাঁস ঘটেছে বলে মানতে হবে। কারণ এর ফলে অর্থাৎ ওই মনীষীদের অবদানে সেদেশে সেকালে জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায়

রূপান্তর ঘটে। তখন জীবনযাত্রায়, মতে-মেজাজে, মনে-মননে, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কে আর সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে উৎকর্ষ আর পরিবর্তন। জীবন-রুচির এ সামূহিক উদ্বর্তন বা উৎকর্ষই ঘটায় মানব সভ্যতায় যুগান্তর—সৃষ্টি হয় নবযুগ। এ হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানস-বসন্ত।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁস এক দিনেরও নয়, একস্থানেরও সৃষ্টি নয়। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকট হতে এবং অভিপ্রেত সামগ্রিক ফল পেতে সুদীর্ঘ চারশ বছরের নিরলস, বিরামহীন, আপোসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের, নিয়মনীতির ও রীতিরেওয়াজের বিরুদ্ধে। যে-সংগ্রামে জানেমালে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে অনেক। শুধু সুখ-স্বস্তি নয়,—ধনপ্রাণও দিতে হয়েছে অনেক মানবমুক্তিকামীকে—জ্ঞানসাধককে।

রেনেসাঁসের উন্মেষ ইতালীতে পনেরো শতকে। কিন্তু সেখানে তা নিবদ্ধ ছিল না—ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। এক হিসেবে সৃষ্টিশীল মনীষা বা মনস্বিতা ঠিক দেশ-কাল পরিবেশনির্ভর নয়—ব্যক্তিক মনস্বিতা, আগ্রহ, উত্তম ও উদ্যোগভিত্তিক। তাই রেনেসাঁস সম্ভব করার জন্যে দৈশিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিক জীবনের উন্নতমান, সর্বজনীন শিক্ষা, কুসংস্কার মুক্তি, জনগণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক সুরুচি, শ্রমজীবী বা বৃত্তিজীবী মানুষের সহযোগিতা, সমর্থন বা দাবির প্রয়োজন হয় না। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষকালের যাজকপীড়িত নিরক্ষর সমাজ ও কোন্দলপরায়ণ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত দেশ ও রাজ্য, নির্যাতিত দাস-ভূমিদাসের দারিদ্র্য প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু রেনেসাঁসকে সার্থক ও জনকল্যাণকর করতে হলে উক্ত সব কিছুর প্রয়োজন হয়। ইতালীর রেনেসাঁসে প্রেরণা যুগিয়েছে সমকালীন আরব মনীষা ও তাদের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কৃতির সঙ্গে পরিচয়। বাঙলাদেশের কোলকাতা শহরে উদ্ভূত রেনে-সাঁসের জন্যে এসব কোন কিছুই দরকার হয়নি। প্রতীচ্যবিদ্যা ও য়ুরোপীয় জীবনের উন্নত মানই তাদের সে-আদলে জীবন রচনায় প্রণোদিত করেছিল।

আগুন অবলম্বনযোগেই আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম ইন্ধন। কিন্তু আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন অনুভূত না হলে, জ্বালানোর অভিপ্রায় না জাগলে ইন্ধন উপযোগ হারায়। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, পেত্রার্কা প্রমুখ বহু বহু মনীষীর ক্রমে অভিব্যক্ত মনস্বিতার প্রসূন। এঁরা অনুপ্রাণিত

হয়েছিলেন স্পেনে আরব-বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য দেখে এবং আরবীর মাধ্যমে গ্রেকো-রোমক কৃতির আকর আবিষ্কারে। নতুন পরিচয়ে এমনি উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাবিলনীয়-আশ্‌শীরীয় বিদ্যায় ইরানী, ফিনিসীয়-মিশরীয় বিদ্যায় গ্রীক, গ্রীকবিদ্যায় রোমক, গ্রেকো-রোমক বিদ্যায় আব্বাসীয় আরব এবং আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্যায় একালের বিশ্বভুবন অনুপ্রাণিত। এ তাৎপর্যে রেনেসাঁস সভ্যজগতের স্থানে স্থানে কালে কালে ফিরে আসে। প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় এবং আধুনিক কালের বিদ্যাকেন্দ্রগুলো, মনস্বিতার আকস্মিক স্ফুরণকাল আর এককালের শহরগুলো এ সূত্রে স্মরেণ্য।—কিছু মনীষী-মনস্বীর মাধ্যমে কোনো দৈশিক, ভাষিক কিংবা জাতিক জীবনে প্রাত্যহিকতার গ্লানিমার, আট-পৌরে নীতি-নিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের, বৈচিত্র্যহীন চিন্তাচেতনার, ঝিমিয়ে-পড়া জীবনের, বিরক্তিধরা জীবিকার, নিগড়ভাঙা নতুন চেতনার, চিন্তার, উদ্যমের, উদ্যোগের উন্মেষই হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পুরোনো ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাববার, কল্পনা করবার, শিখবার, জানবার, আঁকবার, গড়বার, করবার এবং উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের আর স্বদেশকে, স্বভাষাকে ভালোবাসবার এবং নিজেকে শ্রদ্ধা করবার ও আত্ম-প্রত্যয়ী হবার প্রেরণা ও স্বাধীনতা দান করে।

রেনেসাঁসের প্রভাবে জনজীবনে তথা জাতীয় জীবনে শাস্ত্র, সমাজ, রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বিবর্তন ঘটে। অতএব, পরিণামে মানুষের মন-মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারে, বিজ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষে সংস্কারের ও সঙ্কীর্ণতার কবলমুক্তি ঘটে, বিবেকের প্রভাব হয় প্রবল, মানবিক বোধ পায় বিকাশ, এগিয়ে যায় সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবনকামী ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন অতীতা-শ্রয়ী ও অতীতমুখী বলেই রেনেসাঁস সম্পৃক্ত নয়। ওতে নতুন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, হৃতপুরাতনকে ফিরে পাবার সাধনা ছিল মাত্র।

উন্নততর চিন্তা-চেতনা-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে নতুন পরিচয়েই এই যন্ত্রযুগের আগে মানুষের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে কালান্তর ঘটত। শঙ্করাচার্য ইসলামের মোকাবেলায় বিপন্ন স্বধর্মীর স্বার্থেই নতুন মত-পথের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি একাধারে অদ্বৈতবাদ দিয়ে ঠেকালেন ইসলামের প্রসার, আর মায়াবাদ দিয়ে আকৃষ্ট করলেন জৈন-বৌদ্ধদের। দক্ষিণভারতের রামানুজ-

ভাস্কর-মাধব-নিম্বার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদ, উত্তরভারতের নানক-কবির-দাদু-রামানন্দ একলব্য-রামদাস প্রমুখের সন্তধর্ম, বাঙলার চৈতন্যদেবের প্রেমবাদ আর পনেরো-ষোল শতকের বাঙলার ন্যায়-স্মৃতিচর্চা ইসলামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পরিচয়েরই ফল। এরও আগের পাল-আমলের বিদ্যাচর্চা আর সেন-যুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতিও ছোটোখাটো রেনেসাঁসই। এমনি তাৎপর্যে এ-মুহূর্তের ঢাকায়ও রেনেসাঁস ঘটছে।

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মমতও খ্রীস্টধর্মের মোকাবেলায় সৃষ্ট। পৌত্তলিকতা ছেড়ে তিনি হলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মবাদী। আর মূলে ব্রাহ্মমত ছিল সনাতনীদের আক্রমণ এড়ানোর ফিকিরমাত্র। এর জন্ম আড্ডায়-ক্লাবে-আত্মীয়-সমাজে। উনিশশতকী কোলকাতায় উদ্ভূত রেনেসাঁস তো ইংরেজী শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফল। য়ুরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান আর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবই বাঙালীদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস—এর সঙ্গে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডীর ব্যক্তিত্বও তাদের প্রভাবিত করেছিল। বলেছি এরাই (ইংরেজীশিক্ষিতরাই) এই রেনেসাঁসের স্রষ্টা। এঁরা ছিলেন কোঁতে, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, রুশো, ভল্টেয়ার, হব্‌স্‌, লক, অ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি দার্শনিকের ভক্ত। 'এরা'দের মধ্যে সবাই একমতের ও একপথের লোক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়বাদী, কেউ কেউ নাস্তিক, কেউ কেউ অজ্ঞেয়বাদী, অধিকাংশ আস্তিক এবং সবাই কমবেশী য়ুরোপীয় উদার মানবিকতাবাদী। আবার হিতবাদী-প্রত্যক্ষতাবাদীরূপেও ছিল এঁদের প্রশাখা। উনিশ শতকের 'এরা'-রা কথায়, কাজে ও লেখায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মনীষা,—ছড়িয়েছিলেন তাঁদের চিন্তা-চেতনার বীজ। এসব কিছুতেই যে ঐক্য ছিল, তা নয়, বৈপরীত্যও ছিল স্পষ্ট। রেনেসাঁস বহুজনের নানা ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণের ফসল। তবু এঁদের মধ্যে দূর থেকে চেনা যায় তিন মিনারের মতো—তিন আলোক-স্তম্ভের মতো তিন ব্যক্তিত্বকে—প্রথমে রামমোহন, মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের সহচর-অনুচর, সঙ্গী-সহযোগী ছিলেন অনেকেই। রামমোহন ছিলেন সংশয়বাদী, বিদ্যাসাগর ছিলেন নাস্তিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নাস্তিক শেষে ভক্তিমার্গী হিন্দু। রামমোহনের ছিল সমকালীন প্রাগ্রসর বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনা, বিদ্যাসাগরের ছিল দেশ-দুর্লভ নির্দ্বৈধ নিঃসঙ্কোচ উদার মানবতায় ও মানববাদে আস্থা, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল সমকালীন

য়ুরোপীয় আদলে জ্ঞান-কর্ম-নীতিনিষ্ঠ সমাজ ও জাতিগঠনপ্রয়াস।

সচেতন বা অবচেতনভাবে সাময়িক উৎসাহে কিংবা ব্রত হিসেবে আরও যাঁরা স্ব-স্ব কথায়, কাজে ও লেখায় রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন খ্রীস্টান—লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত; অনেক ইয়ংবেঙ্গল—প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবকৃষ্ণ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ; তিন নাস্তিক—অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; বহু ব্রাহ্ম—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীননাথ সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর; এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশ মুখার্জি প্রমুখ উদার মতের হিন্দু, আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রতীচ্যবিদ্যা প্রভাবিত গোঁড়া হিন্দু; এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রতীচ্য দর্শন প্রভাবিত সংস্কারপন্থী হিন্দু, আর আঁকিয়ে-লিখিয়ে ছাড়াও শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীরা কোলকাতাকে অঙ্গে ও অন্তরে অনুকৃত বা কৃত্রিম লণ্ডন করে তোলায় ছিলেন প্রয়াসী। তবু এর মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলনে খ্রীস্টধর্মের প্রসার, রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের আন্দোলনে ব্রাহ্মমতের বিস্তার এবং স্বধর্মীর জাতীয়তাবাদের উন্মেষে প্রতীচ্যদর্শনের প্রভাব রুদ্ধ হয়ে যায়।

সপ্তম ও অষ্টম দশকে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণেরা—মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হিন্দুমেলার প্রতীকী আদর্শে নানা আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে এ-রেনেসাঁসকে পূর্ণতাদান করেন। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের, সাময়িক পত্রিকার এবং নাটকের সহায়তার পরিমাণ অশেষ।

রেনেসাঁসের আলোচনায় কেউ ঈশ্বরগুপ্তের নাম নেন না। অথচ সাহিত্য যে ব্যক্তিগত রসবিলাস নয়, এর যে দৈশিক, জাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, গুরুত্ব ও উপযোগ রয়েছে; জাতিগঠনে, সংস্কৃতি নির্মাণে, নতুন চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসারে এর দান যে অপরিমেয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে-

জাতীয় স্তরে বাঙলাভাষার মাধ্যমেই যে এর চর্চা আবশ্যিক, তা সচেতনভাবে প্রথম উপলব্ধি করেন ঈশ্বরগুপ্তই। এ চেতনা নিয়ে তিনিই প্রথম প্রাচীনসাহিত্য উদ্ধারের, ঐতিহ্য রক্ষণের এবং সাহিত্যিকের পরিচিতি সংকলনের, আর সাহিত্যসম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ ও আয়োজন করেন। তারই ফলে 'সংবাদ-প্রভাকরে' সাহিত্য প্রকাশন, কবি ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচন, কবিওয়ালাদের কৃতি ও পরিচিতি সঙ্কলন এবং সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। কাজেই স্বল্পশিক্ষিত হলেও য়ুরোপীয় চেতনা-সূর্যের বাঙলায় উদয়লগ্নে ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন তার রশ্মিস্নাত একজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কালিক নিয়মে এঁদের প্রায় সবাই বাল্যে ও কৈশোরে বিবাহিত ছিলেন এবং মনস্বীদের প্রায় সবাই প্রতীচ্য-বিদ্যার মতো বিলেতী মদ্যকেও সাদরে-সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজনারায়ণ বসু, হরিশ-মুখার্জি, রামতনু লাহিড়ী আর হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন কমবেশি এঁদের সবারই ছিল মদ্যানুরাগ। এটিকে তাঁরা সংস্কারমুক্তির প্রথমপাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তই নাকি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বিলেতী পোশাক-পরুয়া ব্যক্তি।

বহুকাল ধরে অবক্ষয়গ্রস্ত একটা দেশের, কালের ও সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ নতুন চিন্তায়-চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে এতকালের জাতীয় জড়তার ও জীর্ণতার মধ্যে জীবনের ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, লেখায়, নতুন কিছু বলে, করে, গড়ে, লিখে এবং এঁকে জনগণকে নতুন কিছু শিখিয়ে, জানিয়ে লোকমনে শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও আশা জাগিয়ে এবং মাটির ও মানুষের প্রতি, স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি, জগতের ও জীবনের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়িয়ে—এক কথায় যা কিছু শ্রেয় সেসবের প্রতি সাধারণকে আকৃষ্ট করে—জাতীয় জীবনে যে উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটান তারই নাম রেনেসাঁস। সংজ্ঞাবদ্ধ করলে রেনেসাঁস মানে—জীবন ও জগৎজিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, শিক্ষা, নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তি।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করলে উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার রেনেসাঁসের মূল্যায়ন সহজ হবে। এবার বাঙলার ও ইতালীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখা যাক :

১. ইতালীয় রেনেসাঁসের উন্মেষ সৃষ্টিশীলতায়, বাঙলায় রেনেসাঁসের প্রকাশ প্রতীচ্য শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহে ও ফলে।

২. কোলকাতা শহরের রেনেসাঁস মনীষীদের স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর স্বার্থ-চেতনায় ছিল সীমিত। তাঁরা যতটা হিন্দু হলেন ততটা বাঙালীও হলেন না, আর অস্পৃশ্যদের কিংবা দেশজ মুসলিমদের হিতচেতনা ছিলই না তাঁদের মনে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস উদারতায় ও মানবতায় দীক্ষা দিয়েছিল।

৩. 'এজু'দের মর্ত্যপ্রীতি, জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা ছিল বটে কিন্তু তা নির্বিশেষ মানবিকবোধের বা মানবতাবোধের বিকাশ ঘটায়নি। য়ুরোপীয় খ্রীস্টান সমাজে বর্ণভেদ ও বিধর্মীভেদ ছিল না, ছিল শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের ভেদ। 'এজু'দের অনুরাগ ও শ্রেয়োবোধ নিবদ্ধ ছিল স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর পরিসরে—মাটি ও মানুষ এঁদের চেতনায় ছিল অবহেলিত।

৪. য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃত ভূভাগে ও সুদীর্ঘ কালে, উৎস ছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি (গ্রীক, রোম), এতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল সমকালীন আরবসভ্যতার। বাঙলার রেনেসাঁসের তথাকথিত উন্মেষ ও বিকাশ-কাল পঞ্চাশ বছরের পরিসরে ছিল সীমিত। প্রেরণার উৎস ছিল সমকালীন লণ্ডন-প্যারিস।

৫. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার মোহ ঘুচিয়ে মানুষকে করেছিল মাতৃভাষামুখী, অন্ধ বিশ্বাস-সংস্কার কাটিয়ে মানুষ হয়েছিল যুক্তিবাদী ও মর্ত্যমুখী। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ, প্রোটেস্টান্ট মতের উদ্ভব, যাজকের দৌরাত্ম্যহ্রাস, কৃষকদের অধিকারচেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিকাশ, দিকে দিকে আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, শাস্ত্রীয় শিক্ষার চেয়ে মানববিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার, জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঐহিকতার প্রাধান্যদান, সর্বোপরি ব্যক্তি, সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং ন্যায় সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসাজাত তত্ত্বোপলব্ধির আলোকে জীবনযাত্রার নিয়ম-নীতির ও রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং বাস্তবের হিতকর চাহিদা পূরণও ছিল য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের লক্ষ্য ও ফল। বাঙলায় ব্রাহ্মমতে, রামকৃষ্ণের সেবাধর্মে আর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত গীতানুগ কর্ম ভক্তির তত্ত্বেই সংস্কারমুক্তির প্রয়াস অবসিত। এঁদের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের মধ্যে পরিহারের কথাই রয়েছে বেশী। এবং তা কেবল পুরোনোকে আস্থার ও আশ্বাসের অবলম্বনরূপে দৃঢ় করে আঁকড়ে থাকার প্রবর্তনা

দেবার জন্যেই। সমকালীন মানুষের মর্ত্যপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐহিক-মানবিক চেতনার পুষ্টিসাধন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাঙলার রেনেসাঁসে শিক্ষার চেয়ে সংস্কারস্পৃহাই (Reform-এর স্পৃহা) ছিল বেশি। এঁরা revivalist ও reformist-এর মতো adjustment ও accomodation-এর তথা মেরামতের প্রয়াসী ছিলেন, নতুন কিছু নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না।

৬. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল ভাবিক ও দৈশিক জাতিচেতনা, বাঙলার রেনেসাঁস জাগাল স্বধর্মীর স্বাজাত্যবোধ। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল গ্রহণশীলতা—আত্মপ্রসারের প্রেরণা, বাঙলার রেনেসাঁস মানুষকে করল আধুনিক য়ুরোপের অনুকারী আর প্রাচীন ভারতের অনুরাগী।

৭. সমাজবিপ্লব রেনেসাঁসের লক্ষণ না হলেও, চিন্তাবিপ্লব যেহেতু রেনেসাঁসের প্রাণস্বরূপ, সেহেতু রেনেসাঁস জীবনের ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রূপ বদলাতে, রঙ চড়াতে অবশ্যই সাহায্য করে। য়ুরোপে তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের রেনে-সাঁস কথায়, লেখায় ও রেখায় মাত্র অভিব্যক্তি পেয়েছে, কাজে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। তাই মনীষীরা ছিলেন সীমিত অর্থে ও ক্ষেত্রবিশেষে উদার, কচিৎ দ্রোহী এবং প্রায়ই সনাতন নিয়মনীতির অনুগত—জাতিভেদে, বর্ণভেদে ও অধিকারীভেদে আস্থাবান।

৮. নিঃস্ব নিরক্ষর মানুষ য়ুরোপেও রেনেসাঁসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়নি, তবে পরোক্ষে নানা আন্দোলনের ও ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছিল। আমাদের দেশে প্রজাপীড়নে কোন উপশম কিংবা কৃষকবিদ্রোহে কোন সহায়তা রেনেসাঁসের জনক-মনীষীরা বা তাঁদের চেলা ভদ্রলোকেরা দেননি। আর সিপাহী-বিপ্লবের সময়ে তাঁদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাই জাগেনি, বরং ব্রিটিশের পরাজয়ের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছিলেন তাঁরা।

আসলে আঠারো শতকের ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লুট করার মতোই অনায়াসে লব্ধ বিত্তের অধিকারী কোলকাতার ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট ধনী-মানী-বিষয়ীরা উনিশ শতকের ঊষাকাল থেকে সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। মুখ্যত তাদের থেকেই উনিশ শতকে একদল জ্ঞানী-কর্মী-মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক-সাংবাদিক-স্বাদেশিক-চিকিৎসক-শিক্ষক-প্রকৌশলী কোলকাতা শহর মাতিয়ে তুললেন। এই 'এজু'রা, ইয়ংবেঙ্গলরা—এককথায় মনীষাসম্পন্ন তরুণেরা প্রাচ্যান্বেষণা ও

প্রতীচ্যএষণা তথা প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই শুরু করেন তাঁদের জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ। এঁদের মনীষার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিরই সগর্বে নাম দেয়া হয়েছে রেনেসাঁস। দু'একজন ব্যতিক্রম ব্যতীত এঁদের কারো সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। তাই উনিশশতকী এইসব মনীষীর চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে স্ববিরোধ প্রচুর ও প্রকট। এঁদের জাগরণ স্বরূপে বই-পড়ে-পাওয়া য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল-জাত জ্ঞান এঁদের মনে য়ুরোপীয় আদলে জীবনরচনার আকাঙ্ক্ষা জাগাল। কোলকাতায় বসে লণ্ডন-প্যারিসের সূর্যের বিম্বিতআলোকে অলঙ্কৃত লণ্ডনে য়ুরোপীয় মন-মনন-সংস্কৃতির ধারক নকল নাগরিক হতে চাইলেন এঁরা। য়ুরোপীয়চিত্ত অধিগত ছিল না, কেবল বাইরের আভরণটাই এঁদের আকৃষ্ট করেছিল; তাই সব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল অসঙ্গতি।

বাঙলায় রেনেসাঁসকে অন্য নিরিখেও যাচাই করা যায়, সে নিরিখের ভিত্তি এই: পারিবারিক জীবনে যেমন আকস্মিকভাবে পরিবারের সব সন্তানই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পদে ও বিত্তে বড় হয়, জাতীয় বা দৈশিক জীবনেও তেমনি একদল জ্ঞানী-গুণী সৃষ্টিশীল মনীষীর একই সময়ে আবির্ভাব ঘটে, প্রাচীন গ্রীসে রোমে বাগদাদে যেমন দেখা গেছে। তেমনি একই সময়ে কয়েকটি গুণী জ্ঞানীর পরিবারও মেলে, যেমন, দুই ঠাকুর পরিবার, বসু পরিবার, সোহরাওয়ার্দী পরিবার, মুখার্জী পরিবার, নেহেরু পরিবার, হাম্বলী পরিবার, প্রাচীন বাগদাদের বখ্‌ত ঈসা পরিবার, প্রাচীন বাঙলার দণ্ডপাণি পরিবার ইত্যাদি। এ মাপে দেশের, কালের, ধর্ম-সম্প্রদায়ের, গোত্রের বা জাতির জীবনে ওই সর্বাত্মক উঠতিই রেনেসাঁস—অন্য সব লক্ষণ বা কারণ-কার্য গৌণ। রেনেসাঁস চিরকালই শিক্ষিত শহুরে মানুষের দান বটে, তবে শিক্ষিত মাত্রেই মনীষাধর নয় বলেই চিরকাল রেনেসাঁস বিরলদর্শন ঘটনা বা অভিব্যক্তি।

বছরে বারোমাসই কোনো-না-কোনো তরুতে-লতায় ফুল পাওয়া যায়, এবং একটা গাছ দিয়ে বাগান হয় না। সুবিন্যস্ত বহু তরু-লতার সমাবেশে তৈরী স্থানই বাগান। যে-কোনো কালে ও স্থানে সাধারণ মাপের দু'চারজন মনীষী থাকেনই—বুদ্ধিজীবী থাকে অসংখ্য। তাতে রেনেসাঁস হয় না; প্রথম শ্রেণীর বহু কৃতী ও কীর্তিমান মনীষীর অবদানই কেবল রেনেসাঁস। অতএব রেনেসাঁস

হচ্ছে উচ্চবিত্তের ও মধ্যবিত্তের ; বুর্জোয়ার মনীষার একই স্থানে, একই কালে, একই ভাবার আকস্মিক নির্লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট বিচিত্র বর্ণালি প্রকাশ ও বিকাশ। কাজেই একজন মানববাদী বামপন্থীর কাছে মানব-মনীষার এই উজ্জ্বল ও বহুমুখী প্রকাশ সুন্দর হলেও সার্থক নয়। এর রূপ আছে, রস আছে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিপ্রেত উপযোগ নেই।

বলেছি, ইংরেজীভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতীচ্যবিদ্যাই বাঙলার এ রেনেসাঁসের উৎস, এ শিক্ষা 'তাদের দেশে' ঘটাল ভাববিপ্লব, শিক্ষিতদের মনে জাগাল দিগন্তবিসারী আকাঙ্ক্ষা, জীবনে সম্ভাবনার দ্বার হল উন্মুক্ত, খুলে গেল সংস্কারের নিগড়—বিশ্বাসের বাঁধন। এরকম সুফল প্রত্যাশা করেই লর্ড ম্যাকলে (১৮০০—৫৯) এদেশে ইংরেজীর মাধ্যমে প্রতীচ্যবিদ্যা প্রচারের সুপারিশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, ইংরেজী পড়লে এদেশী মানুষের গায়ের রঙ অপরিবর্তিত থাকবে বটে, কিন্তু দেশী অঙ্গে নতুন অন্তর তৈরী হবে, চিন্তায় চেতনায়, মনে-মেজাজে, মতে-মননে, রুচিতে-সংস্কৃতিতে, দায়িত্ববোধে-কর্তব্যনিষ্ঠায় কালো অবয়বের এক এক জন মানুষ য়ুরোপের প্রাগ্রসর সুনাগরিকের সমকক্ষ হবে ; এবং ওই চরিত্র, ওই যোগ্যতা, ওই উদ্যম, ওই রুচি, ওই অতিক্রান্তকালে প্রাচীন আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত বিদ্যা দান করতেই পারে না। সমকালীন বিজ্ঞান দর্শন-সাহিত্য-প্রযুক্তিবিদ্যার এক তাক ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে গুণে, মানে, তথ্যে ও তত্ত্বে তুলিত হবার যোগ্যতা সত্যিই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জ্ঞানের আকর আরবী-ফারসী-সংস্কৃত বইয়ের ছিল না। কিন্তু এ যথার্থ মূল্যায়নে সেদিনকার বাঙালীর তথা ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তাই তারা একে উপনিবেশনীতি সম্পৃক্ত চাল বলে জানল। তারা বুঝল—কেরানী, খ্রীস্টান ও অনুগত প্রজা তৈরীর জন্যেই ইংরেজীভাষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা চালু করার সুপারিশ করেছেন লর্ড ম্যাকলে। ১৮৩৫ সনের দোসরা ফেব্রুয়ারি'র মিনিটে এ সুপারিশ করার আগে ১৮৩৩ সনের ১০ জুলাই ম্যাকলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে যে মহৎ আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজীশিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা হয় অজ্ঞতার দরুন, নয়তো অভিসন্ধিবশে উল্লেখ করেননি কেউ, ফলে লর্ড ম্যাকলে এখনো কেবল নিন্দার পাত্র। আমরা তাঁর সে-বক্তৃতার যে-অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'It may be that public of India may expand under our sys-

tem till it has outgrown that system ; that by good Government, we educate our subjects into a capacity for better Government, that having been instructed in European knowledge they may, in some future age, demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not, but never will I attempt to evert or retard it. Whenever it comes it will be the proudest day of English history. To have found a great people sunk in the lowest depth of slavery and superstition, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all the privileges of citizens, would indeed be a title to glory all our own. The sceptre may pass away from us, unforeseen recidents may derange our most profound schemes of policy. Victory may be in constant to our arms. But there are triumphs which are followed by no reverse. There is an empire exempt from all natural causes of decay. Those triumphs are the specific triumphs of reason over barbarism ; that empire is the unperishable empire of our arts and our morals, our literature and our laws.' [July 10, 1833]—ম্যাকলে-নিন্দুকদের এ ভাষণ স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ঐহিক জীবনের গুরুত্বচেতনা, মানববিদ্যার কদর, শাস্ত্রের ওপর মানবতার প্রাধান্য, ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের প্রয়োজনবুদ্ধি, নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার চেতনা প্রভৃতি একাধারে রেনেসাঁসের ও আধুনিকতার লক্ষণগুলো ইংরেজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশে মন্থর গতিতে প্রসারলাভ করতে থাকে।

বাঙলায় রেনেসাঁস যাঁরা ঘটালেন আর যাঁরা রেনেসাঁসের ফল ভোগ করলেন তাঁরা ছিলেন কোলকাতা শহরের ধনী-মানীরা ও জমিদারেরা এবং তাঁদের সন্তানেরা—তাঁদের জীবনে যুক্তি, বুদ্ধি, রুচি, আনন্দ, আরাম বাড়ল বটে, তাঁদের চিন্তা-চেতনার জগৎ বিশাল হল বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, চাকরির, উৎকোচের ও উপঢৌকনের, ব্রিটিশের

সহযোগীরূপে দেশী কুটিরশিল্পের বিলুপ্তিসাধনের, নীলকর সাহেবদের আমলে নীলচাষ করানোর, ব্যাঙ্কে মহাজনীতে আড়তদারীতে পুঁজি বিনিয়োগের রাজস্ব-বৃদ্ধির ও আবওয়াব-সেলামীর প্রসাদ পেলেন রেনেসাঁসওয়ালারা এবং তাঁদের স্বগোত্রের ও স্ব-শ্রেণীর লোকেরা। আর নিঃস্বতার, দারিদ্র্যের, অনাহারের, পীড়নের, শোষণের এবং দুঃশাসনের শিকার হল দেশের শতকরা নিরানব্বই জন চাষী-মজুর-তাঁতী-মলঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মানুষ। তা হলে রেনেসাঁসরূপ সামন্ত-বুর্জোয়ার চিৎপ্রকর্ষ গণমানবকে সমকালে কিছুই দেয়নি বরং পীড়ন ও বঞ্চনা বাড়িয়েছিল শত গুণ। তাঁদের বিদ্যা-বিত্ত-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা তাঁদের স্বশ্রেণীর জীবনে ও জগতে বাসন্তী পরিবেশ তৈরী করেছিল মাত্র।

কোলকাতা শহর ছিল জমিদারের, সওদাগরের, মহাজন আর শিক্ষিত চাকুরের, উকিলের, বেনে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-দেওয়ান-দালাল-দোকানদারের স্বর্গলোক। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকণ্ঠা ছিল স্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে, ভেবেছেনও তাদেরই সমস্যা [বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ, শিক্ষা] নিয়ে, চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশ পেয়েছে তাদেরই উপচিকীর্ষা। হিন্দুর অস্পৃশ্যতা দূর করার ইচ্ছা বা চেষ্টাও ছিল না তাঁদের। এমনকি রেনেসাঁসের ও মানব-মনীষার বহুমুখী ও মহত্তম বঙ্গীয় বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছে যে রবীন্দ্রনাথে, তাঁর মধ্যেও সামন্ত-বুর্জোয়ার চরমতম উদার মানবিকতাও অভিব্যক্তি পেয়েছে পঞ্চাশোত্তর বয়সে। সে-মানবিকতার নির্যাস হচ্ছে কৃপা, করুণা ও সৌজন্য; এবং বৃদ্ধবয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার উদারতম ও উদাত্ত বাণীতেও সমাজবাদ সমর্থিত হয়নি। আবার বাণীতে যা উচ্চারিত হয়েছে, তাতেও অন্তরের সায় ছিল সামান্য। তাই জমিদারী ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে প্রবলের জোর-জুলুম থেকে দুর্বলকে রক্ষার অজুহাতে, রাশিয়া ঘুরে এসেও মানব-সাম্যে ও সম্পদ-সমতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি তিনি। তিরিশের দশকে বয়সে সত্তর-আশির কোঠায় পা রেখেও তিনি উনিশশতকী মন-মনন পরিহারে অসমর্থ। তাই তখন তিনি কেবল তাত্ত্বিক—জগৎ-জীবনের স্বরূপসন্ধানী চিত্রে, কবিতায়, গীতিনাট্যে ও প্রবন্ধে। এমনকি বিদেশ উদ্ভূত ধর্মের ও সংস্কৃতির ধারক বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায়—স্বষ্টভুবনে সাতশ বছরের দেশজ মুসলিমের ঠাঁই হয়নি হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ-রাজপুত-মারাঠা-শিখের পাশে। অতএব রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আজকের সমাজবাদবিরোধী,

গণমানববাদবিরোধী যে-কোন মনস্বী-মনীষী বা সাধারণ বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক মাত্রেই পরোক্ষে গণশত্রু। সুতরাং মানবমনীষার—মানবপ্রতিভার সামন্তিক ও বুর্জোয়া বিকাশ ও প্রকাশ সাধারণ অর্থে মানবসংস্কৃতির ও সভ্যতার স্রষ্টা হলেও, তাঁদের আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতা, মননশক্তি, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার অবশ্যস্বীকার্য হলেও, তাঁদের দান-অবদানে গণমানব কচিৎ প্রত্যক্ষে ও সাধারণভাবে পরোক্ষে উপকৃত হলেও তা তাদেরকে শোষণ-পীড়নের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। আজো রোটারী ক্লাব ও লায়ন্স ক্লাব দানের ও জনসেবার ছলে দরিদ্রমানুষকে—মানবতাকে সগর্বকৃপায় ও প্রতিষ্ঠানিক করুণায় অবমানিত করে চলেছে।

অতএব রেনেসাঁসের জন্যে গৌরববোধ করা, সগর্বে রেনেসাঁসের মহিমা কীর্তন করা, রেনেসাঁসওয়ালাদের প্রশংসা করা প্রকারান্তরে গণ-মানবের দুর্ভোগ দুর্দশাকে অস্বীকার করার এবং মুৎসুদ্দি-কমপ্রেডরের তারিফ করার সামিল।

বাঙালী সত্তার বিলোপ প্রয়াসে

১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র

১৯১১ সনে বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ বাঙালী মুসলমানেরা যেন আজো ভুলতে পারেনি। তারা হৃত সুযোগের জন্যে আজো আফসোস করে। অথচ এতে মুসলমানদের জন্যে লাভের-লোভের কিছুই ছিল না। শোনা কথায় কান দিয়ে তারা অকারণে অনুতাপে ভোগে। কেউই আর খুঁটিয়ে খতিয়ে জানবার-বুঝবার চেষ্টা করে না। বঙ্গ-বিভাগে মুসলমানদের সমর্থন ছিল বলে যে একটা কথা চালু রয়েছে, তাতে তথ্যগত ভুল আছে। কেননা, সেদিন মুসলিম সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অশিক্ষিত জনদের কাছে এ খবরের কোন গুরুত্বই ছিল না। মুসলিম সমাজে সেদিন যাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ নেতা ছিলেন, তাঁদের গণসংযোগ ছিল না। আবার তাঁদের প্রধানরা ছিলেন উর্দু-ভাষী অবাঙালী সামন্তের বংশধর।

এমনকি তাঁরা যে বিদেশীর বংশধর এই বোধই ছিল তাঁদের আভিজাত্য-গৌরবের উৎস। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁদের না ছিল মমতা, না ছিল কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য-চেতনা। সম্পদসূত্রেই তাঁরা স্বজাতির নেতৃত্বগৌরবের দাবীদার। এসব অজাতমূল পরগাছারা সঙ্গত কারণেই ছিলেন সরকারের অনুগ্রহ-লোভী সুবিধাবাদী সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থবাজ দালাল। পাকিস্তান আমলেও বাঙলার উর্দুভাষী জমিদার ও বেনে পরিবারগুলোর ভূমিকায় এই ঐতিহ্য অনুসৃত। বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করেছিলেন ঐ সামন্ত নেতারাই। তখনো শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী মুসলিম সমাজে গড়ে উঠেনি, কাজেই গুটিকয় স্থিতধী মুসলিম ব্যতীত এ সমাজে আর কেউই প্রতিবাদী ছিল না। এতে ব্রিটিশ সরকার স্বস্বার্থে প্রচার করে যে, বঙ্গবিভাগে মুসলিম সমাজের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এবার বঙ্গ-বিভাগের গোড়ার কথায় আসা যাক। নতুন বন্দর কোলকাতায় একদিন ইংরেজ আশ্রয়ে বেনিয়া-ফড়িয়া ও ফেরারীর ভীড় জমেছিল। ওরা নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চাকুরে-মুৎসুদ্দী-ফড়িয়ারূপে কাঁচা টাকা সৎ ও অসদুপায়ে অর্জন করে সম্পদশালী হয়ে উঠে। কোম্পানী শাসনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বিত্তে এবং বিস্তারে, সংখ্যায় আর সহযোগিতায় বেড়ে ওঠে।

আঠারোশ' বাটের পরে সংখ্যায় ও সম্পদে বৃদ্ধ এই বিত্তবানেরা আত্মসম্মান বৃদ্ধির প্রেরণায় সরকারী রীতিনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে অবাধে অজস্র অর্জনের সুযোগ-মুগ্ধ এই ভুঁইফোঁড় বড় লোকেরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে, ওহাবী আন্দোলনে কিংবা সিপাহী বিপ্লবে কোন উৎসাহ-সহানুভূতি প্রদর্শন তো করেইনি, বরং সোনার সুযোগ হারানোর আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিল। এখন প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে উপার্জনের বাজার মন্দা হওয়ায় এবং প্রতুল ঐশ্বর্যে লোভের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় আর প্রতীচ্য বিদ্যার ছোঁয়া লাগায় ওরা মানের কাঙাল ও প্রতিষ্ঠার প্রার্থী হয়ে উঠল। বিশেষ করে ধনী বাপের তরুণ সন্তানেরা ফরাসী বিপ্লবের মনোমুগ্ধকর বাণী মুখস্থ করে স্বাধীনতা ও সম্মান-সম্ভ্রম বিলাসী হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ছিল প্রতীচ্য দর্শনের সংশয়বাদ ও নাস্তিকাবাদের ইন্ধন। পড়ে-পাওয়া বিদ্যার প্রভাব-প্রসূত এই চেতনা দেশের মাটিতে টবের তরুর মতোই ছিল বিলাস-বস্তু। এ সুরুচির প্রসূন বটে, কিন্তু সুচিন্তার ফল নয়। বৈঠকী আলাপের অবলম্বন হলেও তা তখনো জীবনের প্রয়োজন-প্রসূত সম্পদ হয়ে উঠেনি, তাই তা বুলির বলয় অতিক্রম করে প্রয়াসের প্রেরণায় পরিণত হয়নি। তবু ধনীর দুলালেরা স্বপ্নের রোমন্থনে সঙ্ঘ ও সংস্থা গড়ে নিকর্মার সময়ের সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হল। তুখোর বুলির তোড় এবং সংস্থা-সঙ্ঘের অনেকতা দেখে সরকার সতর্ক হয়ে উঠল। শত্রুকে ছোট ভাবতে নেই। বটের বীজ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু জন্ম দেয় মহীরুহের—সরকার তা জানে। কাজেই তাচ্ছিল্যে অবহেলা করতে নেই। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা ভাল। এ সূত্রে অমৃতবাজার সম্পর্কিত ১৮৭৩ সনের প্রেস আইন স্মর্তব্য এবং এ প্রসঙ্গে ১৮৭০ সনের পরবর্তী গুপ্ত সঙ্ঘগুলোও স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তখন আধুনিক জাতি গঠন উদ্দেশ্যে জাতিবৈর জাগিয়ে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস চলছে, ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালে তা শুরু এবং হেম-বঙ্কিম-নবীনে তার বিকাশ। সবটাই কিন্তু পড়ে-পাওয়া বিদ্যার প্রসূন। তাই ওটা ছিল কৃত্রিম অকাল বসন্তের স্বপ্নবিলাস—ঐসব উদ্যোক্তাদের ভাব-চিন্তার অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধী উক্তিই তার প্রমাণ। আরো কিছু পরবর্তীকালের দ্বিজেন্দ্রলাল, রমেশ দত্ত প্রমুখের রচনা এবং জীবনকথাও এই সাক্ষ্যই বহন করে। ঠাকুর পরিবারের বেকার সন্তানেরা স্বদেশী মেলা করেন বটে, কিন্তু বাড়ীর মেজো সন্তান যে আই. সি. এস. সে গর্বও সর্বক্ষণ মনে জিইয়ে রাখেন।

এসবকে পড়ে-পাওয়া স্বরুচিজাত স্বাপ্নিকতা বলছি এ কারণে যে, ওঁদের কেউই আন্তরিকভাবে জনকল্যাণ, শোষণ-মুক্তি বা স্বাধীনতা কামনা করেননি, কিংবা প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা ও ইংরেজ বিদ্বেষ অন্তরে ঠাঁই দেননি। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যগর্বী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ছিল, তাঁর সিভিলিয়ান সন্তান বিলেতেই পরিবার রাখতেন, ডি. এল. রায় দেশমাতার বন্দনা গানের সঙ্গে ইংরেজ সম্রাটের জয়গানেও মুখর ছিলেন। স্বদেশ-প্রেমের গানের রচক হলেও তিনি বিলেতী সভ্যতার স্তাবক ছিলেন। অবশ্য যুগসন্ধিক্ষণে—কালান্তরের জন্মমুহূর্তে এমনি অসঙ্গতির আলো-আঁধারই স্বাভাবিক। দেশের মাটি ও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে দেশের মানুষের মগজ-প্রসূত না হলে কোন ধার-করা ভাব-চিন্তা-কর্মই ফলপ্রসূ হয় না। চাহিদা যথার্থ হলেই সরবরাহের ব্যবস্থাও হয়। উনিশ শতক ছিল বাঙলার হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রতীচ্য আদলে আধুনিক জীবন রচনার যুগ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উদার ও সংকীর্ণচিত্ত এবং বর্ণভেদ সমন্বিত সমাজে ভাঙা-গড়ার মুহূর্তে নতুন-পুরোনোর, ভাল-মন্দের, ত্যাগ-লিপ্সার, সৎ-অসতের টানা-পোড়েনে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতা এড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই কারো মতে ও পথে, কথায় ও কাজে ঐক্য ছিল না, যাকে বলে Split Personality তা-ই ছিল প্রায় সবারই। বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ প্রমুখ দুর্লভ চরিত্রের লোকও ছিলেন অবশ্য। কিন্তু এসব ১৮৯০ সনের আগের অবস্থা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক হাজার ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী দেশের সর্বত্র এমনকি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। সে যুগের সরকারী সওদাগরী অফিসে বেশী চাকুরের ব্যবস্থা ছিল না। তাই ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পরও বেকার ও বেসরকারী পেশার শিক্ষিত লোক গ্রামে-গঞ্জে বিরল রইল না। তাছাড়া ইতোমধ্যে ইংরেজের মাহাত্ম্য-মুগ্ধতা এবং প্রতীচ্য-মহিমার প্রভাবও কিছু কমেছিল। তাই বোধ হয় স্বস্থ বাঙালীর আত্মসম্মানবোধ বাঙালীকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্পৃহা যুগিয়েছিল। মোটামুটি ১৮৯০ সনের পর থেকে শোষণমুক্তির, স্বাধিকারের, স্বাধীনতার স্বপ্ন সংকল্পরূপে প্রকট হতে থাকে। অনুশীলন যুগান্তর দল ও অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম, প্রমথ মিত্র, পুলিন দাশ, প্রফুল্ল চাকী, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীদের আবির্ভাব তখন থেকেই শুরু এবং ১৯৩৩ সন অবধি বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল ভারতব্যাপী

কর্মতৎপর থাকে। মোটামুটিভাবে ১৮৮০ সনের পর থেকেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিত্তশালী বাঙালীর বর্ধিষ্ণু আগ্রহ এবং তরুণ বাঙালীর সন্ত্রাসবাদে আস্থা দেখে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে উঠে। তখনো কিন্তু ভারতের অন্যত্র বেনে-সামন্ত-চাকুরেরা আঠারো শতকী বাঙালীর মতোই ব্রিটিশ মহিমার মুগ্ধ এবং তাদের অনুগ্রহপ্রত্যাশী। কাজেই সাম্রাজ্যিক বিপদের বীজ উপ্ত হচ্ছে এই পূর্বপ্রান্তে। পূর্ব দিগন্তে ঝড়ো মেঘের এই আভাসে বিব্রত ইংরেজ তা যাতে সর্বভারতে সংক্রমিত না হতে পারে তার জন্তে সচেষ্ট হয়ে উঠল। এ কারণেই হয়তো W. S. Blunt ১৮৮৩ সনেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দু'টো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।

সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই বাঙলা-বিহার-ওড়িশা নিয়েই বাঙলা গঠিত। এর আগেও স্থায়ী সুবাদারের অভাবে উক্ত দুটো বা তিনটে অঞ্চল সাময়িকভাবে এক সুবাদারের শাসনে থাকত। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে আওরঙ্গজীবের বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র মুর্শিদকুলি খাঁ মেয়াদী সুবাদারীতে তাঁর জীবনস্বত্বভোগ করেন, পরে তা কায়েমী স্বত্বে ও পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে তথা সামন্তস্বত্বে পরিণতি পায়।

মুঘলের প্রতাপের দিনে সুবাদারী ছিল চার-পাঁচ বছরের মেয়াদী চাকুরী। মুঘলের পতনকালে শাহজাদাদের গৃহবিবাদ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগে সাম্রাজ্যের সুযোগ-সন্ধানী সুবাদারদের কেউ হল স্বাধীন, কেউবা হল স্বেচ্ছাচারী ও আনুগত্যে শিথিল। শেষোক্ত দলের অপুত্রক মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকেই উত্তরাধিকারী স্থির করেছিলেন কিন্তু জামাতা সুজাউদ্দীন ষড়যন্ত্রে সফল হয়ে পুত্রের আগে নিজেই হলেন নওয়াব। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট কৃতঘ্ন আত্মীয় বিহারের নায়েব নাজিম আলিবর্দী তাঁর পুত্র সরফরাজকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিরিয়ার নামমাত্র যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার মসনদ দখল করেন। আবার তাঁরই ভগ্নিপতি ও অনুগ্রহজীবী মীরজাফর আলী খাঁ তাঁরি দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে বসলেন সুবাদারের আসনে। এবার জাফর আলীর জামাতাই ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শ্বশুরের কাছ থেকে কেড়ে নিলেন মসনদ। তারপর ইংরেজরা হল মসনদের মালিক। এই সূত্রে স্মর্তব্য যে, পলাশীর যুদ্ধ কিংবা মীরজাফরের ইংরেজ-নির্ভরতা অথবা মীরকাসিমের পরাজয় ইংরেজদের 'সুবে বাঙলার' মালিক

করেনি, দ্বিতীয় দুর্বল সম্রাট-প্রদত্ত দিওয়ানীই ইংরেজকে দেশের দখল দান করেছিল। নইলে নওয়াবরা হায়দরাবাদের নিজামের মতো কিছুকাল পুতুল হয়ে থাকত হয়তো, কিন্তু দেশপতি হওয়ার সাধ বা সুযোগ হত না ইংরেজের।

অতএব, ১৭১২ সনে মুর্শিদকুলির সুবাদারীর শুরু থেকে ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিভাগ অবধি একশ তিরানব্বই বছর ধরে বাঙলা-বিহার-ওড়িশা ছিল একটি প্রদেশ। শাসনকেন্দ্র ছিল আগে মুর্শিদাবাদ পরে কোলকাতা এবং ইংরেজী শিক্ষায় অনগ্রসর বিহার-ওড়িশাবাসীর ভূমিকা ছিল নগণ্য, সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল বাঙালীর।

প্রবুদ্ধ বাঙালী হিন্দুর সংহতি বিনষ্টির জন্যে এবং তাদের বিকাশমান আধুনিক জাতীয়তাবোধ বিনাশের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা বঙ্গ বিভাগে উদ্যোগী হয়। ১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন গবর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেই বঙ্গ-বিভাগে মন দেন। ১৯০৩ সনে তিনি বিভাগের পরিকল্পনা তৈরী করেন, এবং ১৯০৪ সনের ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর করেন। অবশ্য ১৮৫৩-৫৪ সনে স্যার গ্রান্ট ও লর্ড ডালহৌসী প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে একবার এই বিশাল প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বাঙলাভাষীকে ত্রিধাবিভক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না। এবারও মুখে বলেছে বটে, শাসন-সৌকর্যের জন্যে বিরাট অঞ্চলটাকে দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করা জরুরী হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভাগ যেভাবে করল তাতে তাদের মতলব গোপন রইল না। বাঙলাভাষী অঞ্চলকে তিন টুকরো করে কিছু বিহারের সঙ্গে, কিছু ওড়িশার সঙ্গে, এবং কিছু আসামের সঙ্গে জুড়ে দিল। এবং সর্বত্রই বাঙালী জনে ও জমিতে হল লঘু। এভাবে বাঙালীর জনবল, ধনবল ও ভাষার বল খর্ব করার ষড়যন্ত্র করেছিল ইংরেজ তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। এতে বাঙলা ও বাঙালী নামের অস্তিত্ব, ও জাতের নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে যেতো, তার ভাষা ও বুলি হিসাবেই টিকত কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। প্রশাসনিক সদুদ্দেশ্যে প্রদেশ বিভাগ জরুরী হলে তারা ১৯১১ সনে যেভাবে ভাগ করল, সেভাবেই ১৯০৫ সনে বিভক্ত করতে পারত অঞ্চলগুলো। এতো বড়ো জাত-বিনাশী ষড়যন্ত্রও কিন্তু উর্দুভাষী অজাত-মূল মুসলিম সামন্ত নেতাদের বিক্ষুব্ধ-বিচলিত করেনি। তাঁরা বরং এতে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকারে ইংরেজের এই অপকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। ১৯০৬ সনে স্যার সলিমুল্লাহর আগ্রহে ও নেতৃত্বে ঢাকায় সরকার

অনুগত মুসলিম সামন্ত-বুর্জোয়াদের নিয়ে সরকারী আশীর্বাদপুষ্ট মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সময় সলিমুল্লাহ জমিদারীর ঋণ শোধের জন্যে সরকার থেকে দশ লক্ষ টাকাও পেয়েছিলেন, বাহ্যত ঋণরূপেই। কিন্তু তা কখনো পরিশোধ করতে হয়নি।

এর একাধিক কারণ ছিল, একেতো তাঁরা কোনদিন দেশকে ধাত্রীরূপে বরণ করেননি, তাঁরা ছিলেন স্বদেশে প্রবাসী। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ছিলেন সরকারের অনুগ্রহজীবী কৃপালোলুপ সামন্ত। তৃতীয়ত, মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু হলেও তখনো এদেশে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া জীবন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামন্ত প্রতাপের আকর্ষণে তখনো আমাদের ভুঁইফোঁড় ধনী সমাজ মুগ্ধ। তাই দেখতে পাই আঠারো-উনিশ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেও ব্যবসা চালাবার, ব্যবসায়ী থাকবার আগ্রহ দেখায়নি কেউ। সবাই জমি কিনে 'জমিদার' হবার উৎসাহ বোধ করেছে। 'বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস'—প্রত্যক্ষ করেও সবাই বাণিজ্য ছেড়ে জমিদার হয়েছে। সামন্ত যুগের প্রভুত্ব মহিমার কাছে বেনে জীবন যেন ইতরতায় ম্লান। আভিজাত্যের আকর ছিল প্রভুত্ব। চট্টগ্রামে চালু ইংরেজ আমলের একটি ছড়ায় এই মনোভাব সুপরিব্যক্ত :

কেউ ভালো মানুষ 'পড়ি'
কেউ ভালো মানুষ 'কড়ি'
কেউ ভালো মানুষ 'মনে মনে'
কেউ ভালো মানুষ 'জগতে জানে'।

অর্থাৎ কেউ অভিজাত (ভালো মানুষ) হয় উচ্চশিক্ষিত হয়ে বড়ো চাকুরী করে, কেউ অভিজাত হয় অর্থশালী হয়ে, কেউ অন্যের স্বীকৃতি না পেলেও নিজেকে অভিজাত বলে মনে করে, আর কেউ সত্যি সত্যি—সর্বজনস্বীকৃত অভিজাত। এখানে প্রথম তিন শ্রেণীর আভিজাত্য অস্বীকৃত ও অবজ্ঞাত হয়েছে। মুসলিম সামন্ত নেতারা আসামের আরণ্য আদিবাসীদেরকে হিসেবেই ধরেননি, ওরাও যে একদিন শিক্ষিত সভ্য হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে তা তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। এই অনুন্নত এলাকায় তাঁরা হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাল্পতার সুযোগে প্রভুত্ব-গৌরবে ও সম্পদসামর্থ্যে অনন্য হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সিলেটি মুসলমানরা যেমন আসামে প্রভুত্ব করেছে, তেমনি একটা সুযোগ

হয়তো কয় বছরের জন্যেও মিলত না। হয়তো বলছি এ জন্যে যে, ১৯০৫ সনে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অফিস-আদালত তখনো কোলকাতার মতোই হিন্দুতে আকীর্ণ থাকত। পাকিস্তান পূর্বকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এই সাক্ষ্যই বহন করে। পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছয়বছর আয়ুকালে মুসলিমরা এমন কি সুবিধা পেয়েছিল, তাও এ সূত্রে বিবেচ্য। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিশেষ করে ঢাকা বিভাগের হিন্দুরা বিত্তে ও বিদ্যায় তখনো পূর্ববঙ্গে প্রধান ছিল। তাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার কারণ কিংবা হ্রাস করার উপায় তখনো মুসলমানের হাতে থাকত না। পূর্ববঙ্গ ও আসামে পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান জমিদার থাকলেও আর সব জমিদার ছিল হিন্দু। সেই ব্রিটিশ শাসনাধীন পূর্ববঙ্গের লোক উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালাত না। বরং মুসল-মানদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগে নানা বৃত্তি-বেসাতের হিন্দু পূর্ববাঙলায় আশ্রিত হত। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ ও আসামে সামগ্রিক হিসেবে অমুসলিমই হত সংখ্যাগুরু। সরকারী হিসেবেই ত্রিপুরা, মণিপুর ও গভীর পার্বত্যাঞ্চল বাদ দিয়েই নতুন প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ এবং মুসলমান ছিল মাত্র এক কোটি আশি লক্ষ। ত্রিপুরা ছাড়াও লুসাই পর্বতের নাগা-মিজো-মণিপুরীরা যেভাবে মাথা উঁচু করে আজ দাঁড়িয়েছে, তাতে বাঙলা ভাষাও এই নতুন প্রদেশে পাত্তা পেত না। স্মর্তব্য যে, কয়বছর আগে এবং ১৯৭২-৭৩ সনে বাঙলা চাপাতে গিয়ে ঐ আসামেই বাঙালী নিহত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তবু আসামের আদিবাসীদের অশিক্ষার ও আরণ্য জীবনের সুযোগে মুসলিম নেতারা মুসলিম ভোটের জোরে সরকারের প্রশাসন পরিষদে ও কাউন্সিলে সদস্য ও মন্ত্রী হবার সুযোগ পেতেন কয়েক বছর। বঙ্গ-বিভাগ রদ হবার পরেও যেমন তাঁরা কোল-কাতায় সে-সুযোগ পেয়েছেন, এবং ১৯৩৭-৪৭ অবধি পূর্ণ মাত্রায় সুবিধে ভোগও করেছেন।

মুসলিম নেতাদের কয়েক বছর ধরে এই সামান্য সুবিধাভোগের জন্যে বহু শতক ধরে গড়ে উঠা একটা জাতি-পরিচয়, একটা ভাষা ও সাহিত্য, একটা ঐতিহ্য, একটা সংস্কৃতি, একটা প্রবুদ্ধ সমাজ, একটা উন্মেষিত জাতি-চেতনা চিরকালের জন্যে বিনষ্ট করার ব্রিটিশ প্রয়াসে সমর্থন ও সহায়তা দান কি লর্ডকেজে সংকর্ম বলে আজো বিবেচিত হবে, কিংবা ইতিহাসে পরিকীর্তিত হবে! বঙ্গ-বিভাগে মুসলিম জনগণের লাভের-লোভের যে কিছুই ছিল না, তা

একালের শিক্ষিত মুসলমানের সহজে বোঝা উচিত, এবং বঙ্গ বিভাগ ব্যর্থ হল বলে আফসোসের বদলে বরং আনন্দ করাই বিজ্ঞতা। বঙ্গ বিভাগ বাতিল না হলে হয়তো বিখণ্ডিত বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারো চোখে পড়ত না আর এ অঞ্চলে পাকিস্তানও হতো না। বাঙালী হিন্দুর মরণপণ আন্দোলনে ব্রিটিশের এই জাতবিনাশী ষড়যন্ত্র ১৯১১ সনে ব্যর্থ হয়, এবং বিহার ও ওড়িশা আলাদা আলাদা প্রদেশরূপে স্থিতি পায়। আসামও পূর্বাবস্থায় থেকে যায়। বাঙলার বিপন্ন অস্তিত্ব ও বাঙালীর সত্তা এভাবে নিশ্চিত বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা পায়।

পাকিস্তানোত্তর যুগে পূর্ববাঙলা থেকে হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করে চলে যাওয়াতে এবং ভারত থেকে মুসলিম আগমনের ফলে মুসলিমরা এখানে যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, ব্রিটিশ শাসনকালে কয়েক লাখের সংখ্যাধিক্যে অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ তা পেত না। কেন না অভিন্ন প্রভুর শাসনে কারো তখন বাস্তুত্যাগের কারণও ঘটত না। ধনবলে ও বিদ্যাবলে তখনো হিন্দুরাই থাকতো প্রধান ও প্রবল। দাঙ্গা বাঁধিয়েও ব্রিটিশ শাসনকালে লোক তাড়ানো যেত না। বস্তুত ১৯০৫—১১ সনে পূর্ববঙ্গেও সরকারী চাকুরে ছিল হিন্দুই. মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যেমন মুসলিম স্বার্থে ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত এবং মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে নিন্দিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সব অধ্যাপকই ছিলেন হিন্দু, দু-চারজন ছিলেন মুসলিম। ১৯৪৭ সন অবধি অবস্থা এরূপই ছিল। বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়াতেও মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যে আশা নিয়ে মুসলিম সামন্ত নেতারা পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সমর্থন করেছিল সে-আশা ভঙ্গের কোন কারণও ঘটেনি। কেননা, বিহার-ওড়িশা-আসাম বিরহী বাঙলাপ্রদেশে মুসলমানই রইল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। তারা যা চেয়েছিল এমনি রদ-বদলের হেরফেরে তা-ই পেয়ে গেল। আর যদি কোলকাতার বিদ্বান ও বিত্তবান প্রতিদ্বন্দ্বীই তাদের ভীতির কারণ ছিল তা হলেও পূর্ববঙ্গ প্রদেশে সে ভীতি মুক্তির কোন উপায় হত না। কেননা এখানেও ছিল বড়ো বড়ো হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত হিন্দু। বস্তুত কোলকাতার ধনী মানী হিন্দুর অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব বাঙলার। তাই এখানেও মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিলাভ সম্ভব হত না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ঢাকায়-কোলকাতায় কলগত পার্থক্যের কোন কারণ ছিল না। অতএব বিভক্ত বঙ্গ কেবল নির্বোধ মুসলমানেরই স্বর্গ ছিল।

বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি

১. প্রাক্ কথন :

কিংবদন্তী দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে, কেননা আমাদের ইতিহাস নেই। আড়াই হাজার বছরের ধর্ম-সংস্কৃতির ও বিদেশীর রাজত্বের যেসব কথা শ্রুতি-স্মৃতিরূপে প্রচল রয়েছে, তাকে ইতিহাসের কায়া তো নয়ই, কঙ্কালও বলা চলে না। কেননা, তা বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, ক্ষুদ্র তথ্য মাত্র। ওতে ইতিহাসের ছায়া আছে, প্রাবাদিক তথ্য আছে, পল্লবিত কিংবদন্তী আছে, কিন্তু সঙ্গতি, সামঞ্জস্য কিংবা ধারাবাহিকতা নেই।

আমরা ঢালাওভাবে বলি বটে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় [ভেড্ডিড] আর্যভাষী আল-পাইনীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মঙ্গোলরাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশের অধিবাসী, কিন্তু এদের আবয়বিক ও গৌত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপক কিংবা বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ সম্পৃক্ত স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা নির্দেশক কোন তথ্য পাথুরে প্রমাণযোগে সুনিশ্চিত করা আজ আর সম্ভব নয়।

এদের বুনো-বর্বরসুলভ ধর্ম-সংস্কৃতি যে সর্বপ্রাণবাদ, যাদুতত্ত্ব, টোটেম-ট্যাবু তত্ত্ব ভিত্তিক ছিল, তার রেশ ও লেশ দেখে তা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু কোন্ অংশ কার, তা আজ আর নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তাদের জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার ওই নিম্নমান তাদের কাজ্ফার প্রসার ঘটায়নি।

তরঙ্গে তরঙ্গে দলে দলে আসা ও নিবসিত হওয়া এ গোত্রগুলোর রক্ত-সাংকর্য এত বেশি যে তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-অবয়ব-বর্ণ-রক্তের ভিন্নতা ও উৎস নিরূপণ যেমন অসম্ভব, তেমনি দৈহিক মানসিক শক্তির তারতম্য রক্তজ কিনা বলা বা বিশ্বাস করার কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই।

তবে যখন সভ্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির ও ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল, তখন থেকেই তাদের প্যাগান জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ক্রমে অপসৃত হতে থাকে। 'শূদ্র' নামে অভিহিত ও অবজ্ঞাত রাঢ়-পুণ্ড্রের বৃত্তিজীবী অনুন্নত অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষও শাসিত ও শোষিত হতে থাকে সভ্য মানুষের পাটলীপুত্রস্থ শাসকগোষ্ঠীর কবলিত

হয়ে। ক্রমে এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলের মানুষ বঙ্গবহির্ভূত শক্তির শিশু-নাগ-মৌর্য-শুঙ্গ-কাণ্ব-গুপ্ত-পাল-চন্দ্র-বর্মণ-খড়্গ-দেব-কোচ-সেন-তুর্কী-মুঘল-ইংরেজ প্রভৃতির আঞ্চলিক বা সামগ্রিক শাসনে-শোষণে-পীড়নে আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে দাসসত্তার নিরাকাঙ্ক্ষ নিরুত্তম গ্লানির মধ্যে প্রাজন্মিক আবর্তন পেয়েছে মাত্র প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে।

বাঙলার আদি বাসিন্দারা আজো নির্বিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী মুচি-মেথর-বাগদী-চাঁড়াল-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-কৈবর্ত-হাড়ি-ডোম-নিকারী-কোল-মুণ্ডা-সাঁওতালাদি অরণ্যবাসী প্রভৃতি বৃহদ্ধর্মপুরাণে ও মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র বর্ণিত ছত্রিশজাত। রাজশক্তি এদেশের মানুষের কখনো হাতে ছিল না বলে এদেশে ক্ষত্রিয় নেই। কিছু মানুষ সুযোগ-সুবিধে নেয়ার জন্যে রাজশক্তির বা শাসকগোষ্ঠীর অনুগত সহযোগী সেবাদাস হয়ে যায়। শাসকদেরও স্থানীয় সমর্থক সহযোগীর প্রয়োজন হয়। এমনি চাহিদা-সরবরাহের চিরন্তন নিয়মে চালাক-চতুর-ধূর্ত-বুদ্ধিমান অনুগৃহীত জনেরা সৎশূদ্র এমনকি ব্রাহ্মণ-বৈশ্য স্তরেও উন্নীত হয় বিশেষ করে গুপ্ত আমলে, বৌদ্ধ পাল আমলেও। বৌদ্ধ-বিলুপ্তির ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নববিন্যাসকালে আদিশূর-বল্লালী ঐতিহ্যে বিদ্যমান বুদ্ধিমানের এমনি বর্ণ উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির প্রাবাদিক প্রমাণ ও সাক্ষ্য রয়েছে কৌলীন্য প্রথায়, দেবকীঘটক, ফুলো পঞ্চানন, ধ্রুবানন্দ প্রমুখ রচিত কুলপঞ্জীতে, জাতিমালা কাছারীর মামলায় ঐতিহ্যে ও বল্লালচরিতে। আজ অবধি চোখ-চুল-চোয়াল-নাক-শিরের এবং রক্তের সাধারণ ও স্থূল পরীক্ষায় জানা বোঝা গেছে যে বাঙলাভাষী অঞ্চলে নিষাদ ও কিরাত রক্তের মিশ্রণই ঘটেছে বেশি। এখনকার পরিচিতিতে সমতল বাঙলায় কৈবর্ত-রক্তের মানুষের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। আর্যভাষী বেদবাদী সুন্দর মানুষের কিংবা নিগ্রোগোষ্ঠীর রক্ত-সাংকর্য বাঙালীর মধ্যে দুর্লক্ষ্য। আর শক-হুন-গ্রীক তুর্কী-মুঘল-ফরাসী-দিনেমার-ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ইংরেজ রক্তের মিশ্রণ 'সাথেও না মিলে এক'।

অতএব, প্রাচীনকালে—মধ্যযুগে বাঙলাদেশের রাজকীয় শিল্পে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-দর্শনে-শাস্ত্রে যা কৃতি ও কীর্তি তা বহিরাগত উচ্চবিত্তের, রুচির, সংস্কৃতির ও মানের মানুষের প্রয়োজনে, অভিপ্রায়ে ও প্রভাবে হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কেননা সেকালে জীবন ছিল শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ-

পালা-পার্বণ প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। এবং শাস্ত্রমাত্রই বহিরাগত, তাবাও উত্তর ভারতীয় আর্য মানের ভাষাজাত তথা সে-ভাষার বিবর্তিত রূপ। কালক্রমে আদিঅধিবাসী থেকে গড়ে ওঠা সৎশূদ্র কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরাই ছিল উত্তর ভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-আচার-সংস্কৃতির অনুগত অনুকারক ও অনুসারক। অজ্ঞ-অনক্ষর-অস্পৃশ্য নিম্নবৃত্তির নির্বিত্ত অবজ্ঞেয় মানুষেরা তাদের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ ধরে রেখেছিল। তাদেরই সংখ্যাধিক্যের ফলে তুর্কী-মুঘল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদী কায়স্থ-বৈদ্য-ব্রাহ্মণরা তাদের লৌকিক দেবতাদের-ষষ্ঠী-শীতলা-মনসা-যক্ষ প্রভৃতি বহু-দেবতা-উপদেবতার ও অপদেবতার শক্তি-গুণ-মান-মাহাত্ম্য স্বীকার করতে এবং পূজা অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়। বিশ্বাস করতে থাকে লৌকিক বাণ-উচ্চাটন-তুক-তাক, মন্ত্র মাদুলী-তাবিজ-কবচ প্রভৃতির শক্তিতে ও প্রভাবে। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম বহির্বঙ্গীয় ধর্ম ও শাস্ত্র। আমাদের ভাষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, শাস্ত্রসম্পৃক্ত আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি, মনন—চিন্তন সবটাই বহির্বঙ্গীয়। সেখানে আমরা নিজেদের খুঁজে পাব না। সেকারণেই দ্রোহাত্মক নব্যন্যায় স্মৃতি প্রতিষ্ঠায়, কিংবা ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলনে অথবা চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ মতবাদে আমরা বাঙালীর নিজেদের ভাব-চিন্তা তথা মৌলিক মনন-চিন্তন-দৃষ্টি-দর্শন সামান্যই পাই।

রাজনীতিক্ষেত্রে পাল আমলে পাই বগুড়া-বরেন্দ্রে বিদ্রোহী কৈবর্ত দিব্যক-রুদ্রক-ভীমকে বাহুবলে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শাসন করতে। প্রতাপাদিত্যই ছিলেন বারভূঁইয়ার মধ্যে একমাত্র বাঙালী। এ ছাড়া সম্পদরক্ষার ও ভাত-কাপড় যোগাড়ের গরজে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও নিষ্ঠুর শোষণ প্রতি-রোধে প্রাণপণ দ্রোহে সংগ্রামে কখনো না কখনো আঞ্চলিকভাবে যূথবদ্ধ মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালে। আর স্ব স্ব স্বার্থে কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানিতে কিংবা দাঙ্গায়-মামলায় নির্ভীক মানুষ সেকালে-একালে সর্বত্রই মেলে।

তবু যুগসময় নির্জিত বাঙালী কখনো বহির্বঙ্গীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতি-দর্শনের কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেনি, তার স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার, মনন-চিন্তনের সাক্ষ্য রয়েছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-তুক-তাক প্রভৃতিতে, বৌদ্ধমতের তান্ত্রিক, বজ্রযানিক, সহজযানিক, মন্ত্রযানিক ও কালচক্রযানিক বিকৃতি-বিস্তারে ও

দেহতত্ত্বে। ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত ও বিকৃত হয়েছে লৌকিক দেবতা-অপদেবতার স্বীকৃতিতে-পূজায়-পার্বণে। ইসলামও এখানে বিকৃতি পেয়েছে বৌদ্ধজ যোগের, দেহতত্ত্বের, সহজিয়া বাউলতত্ত্বের প্রভাবে। খানকাহ-দরগাহ-মাজার-পীর-ফকির পূজা এবং অদ্বৈততত্ত্ব ও নির্বাণবাদ প্রসূত ফানা, বাকা ও শূন্যতত্ত্বে বিশ্বাসীও গড়ে উঠেছে।

আড়াই হাজার বছর ধরে বিদেশী ও বিভাষী শাসিত-শোষিত বলেই বাঙালী স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও বিকাশসাধনের অবাধ সুযোগ পায়নি। দারিদ্র্য মানুষের মানবিক গুণ নষ্ট করে, তাকে কেবল প্রবৃত্তিচালিত প্রাণী করেই রাখে। আড়াই হাজার বছর ধরে পরশাসিত ও পরশোষিত মানুষ দাসসত্তায় বেঁচে ছিল। তাই ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আত্মরতি, হরণস্পৃহা, নিঃসঙ্গ-প্রয়াস, অসূয়া ও কলহ-প্রবণতা তার নিত্যসঙ্গী ছিল। অন্নের কাঙাল মানুষ ছলচাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। এমন মানুষ ধনী হয়েও মনে কাঙাল থেকে যায়। তাই দু'হাজার বছর ধরে বিদেশী বণিক-পর্যটক-প্রচারক-প্রশাসকের চোখে বাঙালী ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, ধূর্ত, কলহপ্রিয়, দরিদ্র, চোর ও ভিক্ষাজীবী, কর্মকুণ্ঠ, বৈরাগ্যবাদী কিন্তু ভোগলিপ্সু। আমাদের অতীত আস্ফালন করবার মতো তেমন উজ্জ্বল নয়, কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষ্য ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে।

আমরা বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু আর সব মানুষ অতীতে এবং ঐতিহ্যে গুরুত্ব দেন। অতীত ও ঐতিহ্য তাঁদের চোখে সম্মুখযাত্রার প্রেরণার উৎস। কিন্তু ইতিহাস বলে, পিতৃ-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রচল নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতিদ্রোহী তথা অতীত ও ঐতিহ্যবিরোধী নবী-অবতারেরাই মানবসমাজকে দেশ-কালের প্রয়োজনে নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সন্ধান দিয়েছেন, এগিয়ে দিয়েছেন মনন-চিন্তন-সংস্কৃতি-সভ্যতা। অতীত ও ঐতিহ্যচেতনা যদি জীবনে এগিয়ে চলার, সম্মুখগতির প্রণোদক হয়, তা হলে গ্রীস-রোম-মিশর-ব্যাবিলনের পতন হল কেন, চেঙ্গিস-হালাকু-কুবলাই-ই বা কোন্ ঐতিহ্যের ধারক ছিল? ঐতিহ্যহীন পরিবারের, আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার মানুষের কিংবা রাষ্ট্রের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই! পিতৃ-সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার এবং অতীত ও ঐতিহ্য পরিহারকারী ধর্মান্তরিত পৃথিবীর খ্রীস্টান ও মুসলিমদের উন্নতিরই বা কারণ কি! আবার দেশান্তরিত ও ধর্মান্তরিত হয়েও লোকে ঐতিহ্য বদল করছে। ছিন্নমূল পাচ্ছে নতুন কৃত্রিম শেকড়।

ঐতিহ্য (লজ্জাকর কুকৃতি নয়, গৌরবময় কৃতি-কীর্তিই ঐতিহ্য) প্রেরণার উৎস কথাটা বিশ্বাসরূপে সর্বত্র চালু থাকলেও আজ অবধি তা অযোগ্য অক্ষমের আস্ফালনের ও নিষ্ক্রিয় গর্বের বিষয় হলেও বাস্তবে সাহস-সঙ্কল্প-উদ্যম-উদ্যোগই অগ্রগতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আর অতীত ও ঐতিহ্যমাত্রেই প্রগতিবিরোধী। কেননা প্রগতি মানে অতীতের ঐতিহ্যের বন্ধন অস্বীকার করে মননে চিন্তনে, আচারে-আচরণে, সমাজে-সম্পদে নতুন কিছু করা। অতীত-ঐতিহ্যপ্রীতিমাত্রেই তাই রক্ষণশীলতা, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা মাত্র। মানুষসহ প্রাণীমাত্রেরই প্রত্যঙ্গ সংস্থান অর্থাৎ দেহই সাক্ষ্য দেয় যে তার আবয়বিক গঠন কেবল সম্মুখগতি নির্বিঘ্ন করার জন্যেই, পিছু হঠবার জন্যে নয়। যেমন মানুষের অঙ্গে হাত-পা-চোখের সংস্থান কেবল সম্মুখগতির নির্দেশক। তাৎপর্যচেতনাবিরহী অতীত ও ঐতিহ্যচেতনা ক্ষতিকর। আমাদের ধারণায় প্রত্যেক মানুষই স্বস্থ। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্বরচিত।

বাঙলার হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিম সমাজের কালিক বয়স হচ্ছে পাঁচ থেকে সাতশ বছর, হিন্দুজ খ্রীস্টানরা হচ্ছে এক থেকে চারশ বছরের পুরোনো। ইতোপূর্বে তারা ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ শাস্ত্রে-সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে লালিত। ধর্মান্তরিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই তারা ইসলামী আরবের ও যিশু-উত্তর পশ্চিম এশিয়ার অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরবগর্বী। ইসলাম বা জামাতপন্থী দেশজ মুসলিমরা বাঙলাদেশে যে অতীতের ও ঐতিহ্যের, যে জীবন-চেতনার ও জগৎভাবনার রূপায়ণ কামনা করছে, তা কি বাঙলার না বাঙালীর গোত্রীয় কৃতি বা মানসসম্পদ? অতএব ঐতিহ্যেরও গ্রহণ-বর্জন ঘটে। ঐতিহ্যচেতনাও স্থানে, কালে, মনে, মতে ও প্রয়োজনে কৃত্রিম অনুশীলনজাত। আসলে অতীতের অভিজ্ঞতা তথা ইতিহাসধৃত অভিজ্ঞতা জ্ঞানরূপে আমাদের শক্তি ও বুদ্ধি বাড়ায়, এবং এ অভিজ্ঞতা ঐতিহ্য নয়। তা ছাড়া একজন প্রগতিবাদীর পক্ষে ঐতিহ্যচেতনা তো পরিহার্য, বর্বর, অন্তব্য, সামন্ত-বুর্জোয়া ঐতিহ্যপ্রীতি মাত্র।

আমাদের বিশ্বাস না থাকলেও চালিকাশক্তি হিসেবে অতীতে, ঐতিহ্যে রক্তধারার প্রাজন্মিক বা বংশানুক্রমিক গুণ-মান-মাহাত্ম্যে বা বংশগতিতে, উত্তরাধিকারে ও প্রাতিবেশিক প্রভাবে আস্থাবানদের জন্যেই আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার আগে এ উপক্রম বা 'প্রাক্-কথন' আবশ্যিক হল।

ব্রিটিশ আমল

১৭৫৭ সনের পলাশীর প্রান্তরে আকস্মিক পরাজয়ের পরে মুর্শিদাবাদেও সিরাজুদ্দৌলাহর কোন সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল না বলে সিরাজ পালালেন, মীরজাফর কোম্পানীর পুতুল নওয়াব হলেন। জামাতা মীর কাসিম কোম্পানী কর্তাদের ঘুষ দিয়ে কৌশলে কেড়ে নিলেন শ্বশুরের নওয়াবী। অতএব কেন্দ্রীয় মুঘলশক্তির দুর্বলতার সুযোগে বাঙলার শাসনক্ষমতা গেল উচ্চাভিলাষী প্রভু-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী-মীরজাফর-মীরকাসিমের হাতে। কোম্পানীও বিশ্বাসঘাতক এবং প্রতারক। সে কাল সরকারে ও জনজীবনে সর্বপ্রকার অবক্ষয়ের কাল, সে-অবক্ষয় ছিল নৈতিক আর্থিক বাণিজ্যিক প্রশাসনিক ও সামাজিক।

খরার আভাস পেয়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ী লোকেরা ও দেশী ব্যবসায়ীরা ধান-চাল মৌজুত করতে থাকে। ধান-চাল দুষ্প্রাপ্য ছিল না। অর্থাভাবে ক্রয়মূল্য যোগাড় করা সম্ভব ছিল না বলে বাঙলার কোটি লোক মারা গেল (জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ)। ১৭৬৫ সনে দরিদ্র দুর্বল দিল্লী-সম্রাট সামান্য ছাব্বিশ লাখ টাকা প্রাপ্তির নিশ্চিত আশ্বাসে প্রায়-হস্তচ্যুত সুবেহ বাঙলার দিওয়ানী দিয়েছিলেন কোম্পানীকে। সে-সুযোগে মীরজাফর-পুত্র নাজিমুদ্দৌলাহকে ভাতা-নির্ভর নামসার নওয়াব রেখে নওয়াবের সৈন্য-বাহিনী ভেঙে দেয়া হল। সেদিনও বাঙালীর সিপাহী হবার আগ্রহ ছিল না। তাই মুর্শিদাবাদের বাহিনীর অধিকাংশই ছিল বিহার-অযোধ্যার হিন্দু-মুসলিম। চাকুরীচ্যুত এ-বেকার বিক্ষুব্ধ সৈন্যরাই হিন্দু নাগাসন্ন্যাসী ও মুসলিম বুরহান (নাগা) ফকিররূপে (তাদের স্বদেশে নয়) কোম্পানীর বাঙলাদেশে দিনাজপুর-রংপুর-জামালপুর-মধুপুর অবধি লুটতরাজ চালাত, লুটের সময়ে স্থানীয় লোকও তাদের সঙ্গে জুটে যেত।

এদের নেতা ছিল ভবানী পাঠক ও মজনুশাহ্। পরবর্তীকালে এসব সন্ন্যাসীফকিরকে যথাক্রমে হিন্দুরা ও মুসলিমরা সাহিত্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে চিত্রিত করে নন্দিত ও বন্দিত করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে নওয়াবী আমলে মুর্শিদকুলি খান নিযুক্ত রাজস্ব আদায়ের বড় ইজারাদার জমিদার ছিল হিন্দু। ১৫টি বড় জমিদারির মধ্যে দুটো ছিল মুসলিমদের এবং কর্মচারীও ছিল হিন্দু। ১৭৯৩ সনের জমিদার-সরকারের স্থায়ীচুক্তি তথা চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও বহু বই রয়েছে। আমাদের এখানে যা স্মরণীয় তা হচ্ছে এই, মুঘল আমলে নির্ধারিত চিরস্থির খাজনার বা ফসলের বিনিময়ে জমি ভোগদখল করতে পারত প্রজা। চাকুরের বেতন বাবদ জায়গীর-দারী ঘন ঘন হাতবদল হত, মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত ইজারাদারীতেও খাজনা বৃদ্ধি চলত না, তবে স্বৈরশাসনের পীড়ন লঘুগুরুভাবে কিছু কিছু ছিল। জমিদারেরা যে কেবল জমির মালিকানা, খাজনাবৃদ্ধির ও নানা পালা পার্বণে নজরানা ও আবওয়াব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল, তা নয়, রায়তের জান-মালের মালিকও হয়েছিল জমিদার, ইচ্ছেমতো হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর এবং তাদের দৈহিক-মানসিক জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকারও ছিল জমিদারের। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তকে দাসসত্তায় অবনমিত করেছিল, মানুষকে নামিয়ে দিয়েছিল ক্রীতদাসের স্তরে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাষী-মজুরের মন-মননের বিকাশ করেছিল রুদ্ধ। শিক্ষিত সচ্ছল মানুষেও সংক্রমিত হয়েছিল সত্তার গুরুত্ব অচেতনতা, আত্ম-মর্যাদাবোধশূন্যতা, হীনমন্যতা আর চাটুকারিতা। তাই জমিদারবিরোধী সত্যসন্ধ সাহসী অপ্রিয়ভাষী ও স্পষ্টভাষী শিক্ষিত শহুরে ব্যক্তি গোটা উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে ছিল দুর্লভ। উনিশ শতকের বাঙলা গল্প-উপন্যাসে নায়করা সাধারণভাবে জমিদার-ই। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার আর্থিক ক্ষতি যত তীব্র ও গভীরই হোক, তার কোন স্থায়ী প্রভাব ছিল না বৈষয়িক জীবনেও। মানসজীবনে ব্যক্তিসত্তা যেভাবে বিকৃত হয়েছে, তা নিরাময়ের জন্যে আরো কয়েক প্রজন্মের সচেতন সতর্ক প্রয়াস প্রয়োজন। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সনে আইন সামান্য সংশোধিত হলেও প্রজা শোষণে ইতর-বিশেষ ঘটেনি, তবে ১৯২৭ সনের আইনে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল বটে।

এরপর উনিশ শতক। ব্রিটিশ ও বাঙালী হিন্দুর সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে সোনার যুগ। কিন্তু তার আগে একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন দরকার। কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য (চিকিৎসক) এবং কিছুসংখ্যক সৎশূদ্র তথা কায়স্থ চিরকালই থাকত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত। এরাই যুগে যুগে দরবারে ও নগরে-বন্দরে-গাঁয়ে-গঞ্জে, প্রশাসনে, শিক্ষাদানে, জমা-জমার হিসাব রক্ষায়, রাজস্ব আদায়ে, গাঁয়ের মোড়লিতে, শাস্ত্র প্রচারে, সামাজিক নীতি-নিয়ম সংরক্ষণে, নালিশ-সালিশে, বিপদে-আপদে-সম্পদে, রোগে-শোকে, আনন্দ-উৎসবে সহ-

যোগিতা ও নেতৃত্ব দিত। কাজেই এরা প্রজন্মক্রমে গোটা দেশে একালের ভাষায় এলিটের ভূমিকাই পালন করেছে। পীড়িতের-দলিতের নালিশ শোনার এবং সালিশ করার জন্যে গ্রামপ্রধানের এবং স্থানবিশেষে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কালেও ছিল দেখতে পাই। কাজেই তুলনায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত যুগোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সংস্কৃতিবান গ্রামীণ ও নগুরে প্রভাবশালী শাস্ত্র, সমাজ ও আর্থিকজীবন নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক বর্ণহিন্দু ছিল অর্থে-বিত্তে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে, প্রভাবে-প্রতাপে ও খ্যাতি ক্ষমতায় অনন্য ও শ্রেষ্ঠ। সে-ধারা ব্রিটিশ ভারতেও চালু ছিল, আজো রয়েছে স্বাধীন ভারতে।

বাঙলায় তুর্কীবিজয় ঘটে ১২০৪ সনে। তখন থেকেই রাজনীতিতে সৈনিক ও প্রশাসক হিসেবে বিদেশী বিভাষী মুসলিম দেখা গেলেও গাঁয়ে-গঞ্জে তখন মুসলিম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়নি। তেরো-চৌদ্দ শতকেও গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিম ছিল নগণ্য সংখ্যক, পর্তুগীজ-য়ুরোপীয়দের হাতে দীক্ষিত বাঙালী খ্রীস্টানের মতোই ছিল বলে অনুমান করি। পনেরো শতকে প্রায় গাঁয়েই মুসলিমপাড়া ও দীক্ষিত মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ষোল শতকে আমরা কেবল প্রায় কাহিনীই নয়—শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও নবীকাহিনীও পাই। তখন দেশে আরবী ও শাস্ত্রশিক্ষা বাঞ্ছিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালী মুসলিমরা যে নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য হিন্দু-বৌদ্ধজ তা আজকাল আর কেউ অস্বীকার করে না। সে-যুগে শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু ঘটেনি। কাজেই ধর্মান্তরের ফলে তাদের বৃত্তি-বেসাতে তেমন বিপ্লবাত্মক কোন আর্থিক পরিবর্তন ঘটেনি, শিক্ষার ঐতিহ্য এবং চাকরিগত চাহিদা বা প্রয়োজন ছিল না বলে, তাদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো ঘরে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ পেশান্তরে সম্পদশালী হয়েছিল, হয়েছিল প্রান্তিক বা সচ্ছল আয়ের মধ্যমানের চাষী। তারাই অন্যদের (নিঃস্বদের, নিম্নবিত্তদের, নিম্নবৃত্তিজীবীদের) আতরাফ ও আজলাফ নামে অভিহিত ও অবজ্ঞেয় করে নিজেরা হিন্দুদের আদলে (স্পৃশ্য উচ্চবর্ণের) খানদানী হয়ে ওঠে। বিত্ত পরিচায়ক ভূঁইয়া (ভৌমিক), চৌধুরী, যেমন হয়, তেমনি পদ ও পদবী পরিচায়ক ছিল কাজী, খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, শেখ, সৈয়দ, খান।

সাধারণভাবে আজো বৈষয়িক জীবনে লেখাপড়ায় ঐতিহ্যহীন কোন কোন পরিবারে এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও ছেলেমেয়েদের ঘরে, মক্তবে-মসজিদে

আরবী হরফে কোরআন পাঠ শেখানো হয়, ভাষা শেখানো তো হয়ই না, লেখানোও হয় না। এদের কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-উকিল-হেকিম-প্রাথমিক শিক্ষক (খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি), দারোগা, গোমস্তা, নায়েব, পীর এবং সর্বোচ্চ কাজী ও ফৌজদার হতেন। এর ওপরে কোন দেশজ মুসলিম কোন পদে নিযুক্ত হয়নি তুর্কী-মুঘল আমলে। বাঙালী তথা ভারতীয় (বিশেষত নিম্নবর্ণজ) কোন মুসলিম তুর্কী-মুঘল আমলে প্রশাসক কিংবা দরবারে আমির ছিলেন বলে জানা যায় না, কেবল দিল্লীতে মালিক কাফুর আর রূপকথার কালাপাহাড়ই ব্যতিক্রম। অথচ দেশজ বর্ণহিন্দুরা চিরকালই তুর্কী-মুঘল সেনাবাহিনীতে ও দরবারে উচ্চপদ পেয়েছেন। কাজেই তুর্কী-মুঘল ও ইংরেজ আমলে (উনিশ শতকের তৃতীয়পাদ অবধি) গাঁয়ে-গঞ্জে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু বা অধিজন। স্বধর্মী তুর্কী-মুঘলদের সঙ্গে দেশজ মুসলিমদের কোন সূত্রেই কোন সামাজিক যোগ ছিল না, যেমন ছিল না দেশজ খ্রীস্টানের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসকসমাজের। অতএব সেই স্বৈর সামন্ত শাসক-শাসিত স্থবির ও গ্রামে বদ্ধ গ্রামীণ সমাজে উনজন, নির্বিত্ত, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পেশাজীবী মুসলিমরা ইংরেজ আমলেও (বিশশতকের প্রথমপাদ। প্রজাস্বত্ব আইন ১৯২৮ সন অবধি) ছিল গাঁয়ের হিন্দু ধনী-মানী-সর্দারদের অর্থাৎ বিদ্যায় বিত্তে শ্রেষ্ঠ, অর্থ-সম্পদশালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শাসিত ও শোষিত। স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত অবধি জমিদার-মহাজন, ডেপুটি-মুন্সেফ উকিল-ডাক্তার, কেরানী-পুলিশ, দোকানদার, শিক্ষক-শিল্পী-সাহিত্যিক, নাপিত-ধোপা, কামার-কুমার, স্বর্ণকার প্রভৃতি এবং উঁচু মানের পেশাজীবীমাত্রেই ছিল হিন্দু। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে তুর্কী-মুঘল ব্রিটিশ শাসনকালে দেশজ মুসলিমরা সাধারণভাবে অজ্ঞ-অনক্ষর এবং নির্বিত্ত ও স্বল্পবিত্তশ্রেণীর মানুষ ছিল, আর বর্ণহিন্দুরা ছিল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে সর্বত্র ও সব-সময়ে 'এলিট'। উল্লেখ্য যে পলাশীর ও বক্সারের পরাজয়ের পরে বিদেশাগত বিভাষী সব সৈনিক-প্রশাসকেরা বাঙলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ক্বচিৎ কেউ কেউ সম্পত্তি, আয়মা সম্পত্তি ও মদদই মাস সম্পৃক্ত—নানা সুবিধা-অসুবিধার দরুন থেকে গিয়েছিল। আর মুর্শিদাবাদে, কোলকাতায়, হাওড়ায়, হুগলীতে, ঢাকায়, চাটগাঁয় থেকে গেছে উর্দু‘ভাষী নিম্নপেশার লোকেরা। লাখরাজ আয়মা—ওয়াকফ সম্পত্তি ১৮২৮ সনের আইন সত্ত্বেও মুসলমানেরা ১৮৪৬ সন অবধি ভোগ করেছে।

কোম্পানী আমলে চাকরি হারিয়েছে বিভাষী সৈনিক-প্রশাসকরা এবং বাঙালী কাজীরা। মুন্সী উকিলরা মোটামুটি ১৮৬০ সন অবধি আদালতে ফারসী মাধ্যমে ওকালতি করেছেন। এরপরে ইংরেজী পুরোপুরি চালু হয়ে গেল বলে অফিস আদালত ১৮৬০-১৯০০ সন অবধি মুসলিমশূন্য হয়ে গেল। তবু এ সময়ে পূর্বতন শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের ১৯৮ জন বি-এ ও কিছু বি-এল ছিলেন। ১৮৮১ সন থেকে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। W. W. Hunter প্রভৃতি ব্রিটিশ প্রশাসক-লেখকদের গ্রন্থে, রিপোর্টে ও মন্তব্যে বিভাষী মুঘল-মুসলিমদের পদচ্যুতি, তজ্জাত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা প্রভৃতির যে বর্ণনা রয়েছে, তা বাঙলাভাষী মুসলমানদের ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু তথ্য জানা ছিল না বলে দেশজ মুসলিমরাও স্বধর্মী সুবাদে নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভেবেছে। আর উনিশ-বিশ শতকে ইংরেজীশিক্ষিত মুসলিমমাত্রেই ইংরেজ প্ররোচনায় হিন্দুদের ভেবেছে তাদের সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের কারণ। এই ভুল ধারণাবশে বিদ্বিষ্ট মনে হিন্দুদের তারা দেখতে শিখেছে মুসলিমদের শোষক, শাসক এবং শত্রুকল্প প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী রূপে। এ চেতনাকে উনিশশতকে প্রথম উদ্দীপিত করে ইসলামের ও মুসলিমের পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবীরা, পরে পরোক্ষে ফরায়েজীরা (ফরজে অনুগতরা) এবং বিশ্বমুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববাদী সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী এবং স্যার সৈয়দ আহমদ। আসলে বর্ণহিন্দুর চরিত্রে, পেশায়, আনুগত্যে ও লক্ষ্যে গত দু'হাজার বছর ধরে কোন অসঙ্গতি ছিল না, মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে তারা দরবারে-প্রশাসনে ও নানা পেশায় একইভাবে উপস্থিত ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল মানুষের প্রায়-স্থির নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতিবদ্ধ নিস্তরঙ্গ মৃদু-মন্দগতি জীবন-যাত্রা। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা যখন ষোল-সতেরো শতকে ভারতে প্রবেশ করল, তখন বাণিজ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বায়ু হল প্রবহমান, ইংরেজ আমাদের প্রভু হয়ে বসার আগেই আমাদের নগরে বন্দরে য়ুরোপীয় নতুন অগ্রসর জীবনপদ্ধতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য কোলকাতা, হুগলী, মাদ্রাজ, দামন, দিউ, কারিকল, মাহে, বোম্বাই, গোয়া কোনটাই ভারতের রাজধানীগুলোর তথা শাসনকেন্দ্রগুলোর কাছে ছিল না। ফলে এগুলো প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সুবেহ্ বাঙলা মুঘলশাসনে থাকায় বোধ হয় কোলকাতা-হুগলীর ইংরেজ-ফরাসীর বেনে-ফড়ে-গোমস্তা-দেওয়ান,

কেরানী, কুলি-দারোয়ান এমনকি সেবাদাসী পর্যন্ত প্রায় সবাই থাকত হিন্দু। কোলকাতা বন্দর তাই প্রধানত হিন্দু নিয়েই গড়ে উঠেছিল, কোলকাতা রাজধানী হলে ভাঙাহাট মুর্শিদাবাদ থেকে উর্দুভাষী বৃত্তিজীবী মুসলিমরা কোলকাতায় এসে পেশা চালু রাখে।

কোলকাতার কোম্পানীর চাকুরে ও সহযোগীরা পূর্ব থেকেই কেজো কথ্য ইংরেজী শিখতে থাকে। ইংরেজ শাসক হয়ে বসার মুহূর্ত থেকেই 'এলিট' শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হিন্দুরা সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। ফারসীর বদলে যে ইংরেজী প্রশাসনের ভাষা হবে তা কল্পনায়ও আসার আগেই কোলকাতার ইংরেজেরা ঘরে স্কুল খুলে বসে একালের গৃহগত কিণ্ডারগার্টেনের মতোই।

বন্দরে বন্দরে হিন্দুদের আর্থিক সোনার যুগ এবং মানসিক আধুনিক কাল শুরু হয়েছিল সতেরো শতকের প্রায় গোড়া থেকেই। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের সহযোগিতা ছাড়া বাঙলাদেশে প্রাচীন-মধ্যযুগেও কখনো সরকার-প্রশাসন চলেনি। ইংরেজ আমলেও তারাই হল ব্যবসায়-প্রশাসনাদি সব কাজে নির্ভর। ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে, গোটা-ভারতব্যাপী রাজ্যের বিস্তার ঘটে, আর বাঙালীবাবুদেরও বিত্তের ও বিদ্যার প্রসার ঘটে এবং বাবুরা ইংরেজী বিদ্যার জোরে গোটাভারতের সর্বত্র উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-কেরানী রূপে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ আমলে গাঁয়ে-গঞ্জেও পণ্যবিনিময় মাধ্যম কমতে থাকে, টাকায় লেন-দেন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোলকাতায় কোম্পানীর সহযোগী ও অনুকারক-অনুসারক হিন্দুর ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরি ও ঘুষ-দুর্নীতিজাত অর্থ-সম্পদ আকস্মিক-ভাবে স্ফীত হতে থাকে। কোলকাতা শহরে তখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কাঁচা টাকায়স্ফীত ধনী হিন্দুদের অধিষ্ঠান। কর্ণওয়ালিস প্রমুখ শাসক-প্রশাসকেরা এসব টাকার মালিকদের উৎসাহ দিয়ে জমিদার বানিয়ে মান-সম্মানের সামন্ত সহযোগী করে তোলেন, এতে ইংরেজেরা এক ঢিলে দুই পাখি মারল, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্ছেদ করল, আর ব্রিটিশ শাসন স্থিত ও স্থায়ী রাখবার জন্যে কায়েমী স্বার্থসচেতন বিশ্বস্ত মুৎসুদ্দী ও আঞ্চলিক সহযোগী পেয়ে গেল। এরা সাধারণভাবে ১৭৯৩ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ব্রিটিশ অনুগত ছিলই।

প্রতীচ্য বিদ্যায়, বাণিজ্যিক অর্থে, চাকরির আয়ে, ভূসম্পদে ও অন্যান্য বিত্তে-

বেসাতে ঋদ্ধ কোলকাতার বর্ণহিন্দু সমাজ হয়ে উঠল কাঙ্ক্ষা প্রণোদিত বৃহৎ ও মহৎ জীবনের সন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু হল জগতের ও জীবনের তাৎপর্যের, অন্বিষ্ট হল তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও শাস্ত্র। জাগল তাদের মনে কোলকাতাকে সর্বপ্রকারে 'লণ্ডন' বানাবার সুখস্বপ্ন। রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেনঠাকুর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশবসেন, বিবেকানন্দ প্রমুখ আস্তিক, নাস্তিক, সংস্কারক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিক, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং হিতবাদ-উপযোগবাদ-প্রত্যক্ষ-বাদ-ব্রহ্মবাদ-অজ্ঞেয়বাদ অনুশীলক তখনকার সুদীর্ঘ কয়েক সারি প্রখ্যাত ও মহৎ নাম। বাঙালী হিন্দুর এ-মানস জাগরণকে, এ মনীষার ও মনস্বিতার উন্মেষ-বিকাশকে বিদ্বানেরা হিন্দুর পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁস নামে আখ্যাত এবং হিন্দুর জাতীয় চেতনার ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকাল বলেও অভিহিত করেন। কিন্তু তখনো তারা ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার অনুগ্রহ বলেই জানত এবং মানত। বলেছি সতেরো শতকেই কোম্পানীগুলোর সান্নিধ্যে বাঙালী বর্ণহিন্দুর অর্থে বিত্তে প্রভাবে প্রতাপে এবং কিছুটা পরিবেষ্টনীজাত চেতনায় সৌভাগ্যের শুরু। তখন থেকেই ১৮৬৭—৭০ সন অবধি তারা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক। ওয়াহাবী আন্দোলনের ও সিপাহী বিপ্লবের পরে ব্রিটিশনীতির পরিবর্তন ঘটে। তারা মুসলিম-তোষণ নীতি গ্রহণ করে। আগে থেকেই বর্ণহিন্দুসমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে। কাজেই আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মতো হিন্দুদের মধ্যে উদারভাবে বিতরণ করার মতো সুযোগ বা চাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিংবা সরকারী অফিসে ছিল না। ফলে অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট শ্রেণীর মধ্যেও অর্থাগমের ও চাকরির অবাধ উপায় আর রইল না। কাজেই তাদের মধ্যেকার ওই ক্ষোভ ও অনুপায় তাদেরকে আত্মমর্যাদা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-সচেতন করে তোলে। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ও ১৮৬৭ সনে 'হিন্দু মেলা' অনুষ্ঠানে। এর পরেই যুগান্তর ও অনুশীলন (১৯০২) নামে আইরিশ দ্রোহ ও ম্যাটসিনি অনুপ্রাণিত গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে, উনিশ শতকের শেষ দশকে বিপ্লব বা সন্ত্রাস কর্ম শুরুও হয়, ১৮৮৫ সনে 'কংগ্রেস' নামে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের অসন্তোষবৃদ্ধি রোধ করার ও তীব্রতা কমানোর জন্যেই।

পঞ্জাবে মহারাষ্ট্রেও এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী দল ও দ্রোহ দেখা দেয়।

এর পরে সিপাহী যুদ্ধে পরাজয়ের এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতার গ্লানি মুসলিমদের হতোদ্যম ও আপোসবাদী করে তোলে। স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ও নেতৃত্বে বাঙলার ও ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত মুসলিমরা ব্রিটিশের আনুগত্য অঙ্গীকার করে এবং ১৯৪৭ সন অবধি সে-আনুগত্য রক্ষা করে। ভেদনীতির প্রয়োগসাফল্যে বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত প্ররোচনায় ইংরেজীশিক্ষিত কিন্তু তুর্কী-মুঘল আমলের আত্ম-বৃত্তান্তবিস্মৃত, অর্থাৎ দেশে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও অবস্থানের কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ মুসলিমরা মনে করেছে বুঝি ব্রিটিশ-আনুকূল্যে হিন্দুরা তাদের পূর্বতন অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাজেই তারা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ নিয়ে হিন্দুদের দেখেছে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই প্রজন্মক্রমে শত্রু, প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে।

ইসলাম ও মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবী-ফরায়েজীরা কেউ প্রতীচ্য-বিদ্যায় ও জীবনধারণায় প্রাজ্ঞ ছিলেন না। মধ্যযুগীয় জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ে অর্থাৎ মৌলবাদী সংস্কারকরূপে সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে প্রাগ্রসর জীবন-চেতনাসম্পন্ন ও উন্নততর কৌশল-প্রযুক্তিকুশল সমকালীন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো বুদ্ধির, শিক্ষার ও পদ্ধতির সমতা ও যোগ্যতা তাদের ছিল না। ফলে তাদের প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হওয়া ছিল স্বাভাবিক। যদিও গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষ তাঁদের প্রচারে প্রণোদিত হয়ে তাঁদের আহ্বানে সাগ্রহে জানে-মালে সাড়া দিয়েছিল বিপুল সংখ্যায়। এ ব্যর্থতার গ্লানি থেকেই নিরক্ষর গ্রামীণ মুসলিমরাও সম্বিৎ ফিরে পায় এবং ভাতে-কাপড়ে, গুণে-মানে ও প্রভাবে প্রতিপত্তিতে বাঁচার এবং মুসলিমসমাজকে বাঁচানোর জন্যে ইংরেজী শিক্ষা যে আবশ্যিক, তা উপলব্ধি করে। তাই ১৮৮০ সনের পর থেকে শিক্ষার ঐতিহ্য-বিরহী মুসলিমসমাজেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য যে কোলকাতার হিন্দুরা জীবিকার প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা শেখা উনিশ শতকের ঊষাকাল থেকেই তাদের সমাজে সোৎসাহে শুরু করলেও এবং ১৮১৭ সনে তাদের প্রচেষ্টায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হলেও, প্রশাসনের ভাষারূপে ইংরেজী আইনগত হয় ১৮৩৮ সনে, আবশ্যিক প্রয়োগের নির্দেশ দেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সনে। উর্দুভাষী মুসলিমরা কোলকাতায়, মুর্শিদাবাদে ইংরেজী শিখতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ (১৮২৪ সনে) থেকেই আর ১৮৬১ সন থেকেই উর্দুভাষী

মুসলিমরা বি-এ পাশ ও করতে থাকে। তখন থেকেই দেশজ গ্রামীণ শিক্ষিত পরিবারে ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা শুরু হয় বটে, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতায় ওদের শিক্ষা অসমাপ্তই থেকে যায়।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে কোলকাতায় মুসলিমরাও মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করতে থাকেন অর্থ-কৃচ্ছতা সত্ত্বেও, সমাজে চেতনাসৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যে। এভাবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা-মনন প্রকাশের ক্ষেত্রে শহরে মুসলিমরা ছিল প্রায়-অনুপস্থিত। সাধারণভাবে গ্রামবাসী অনক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত বা সাক্ষর দেশজ মুসলিমরা বাস্তবে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ছিল প্রশাসনে-আদালতে-বাণিজ্যে অনুপস্থিত। স্বাধীনতা উত্তরকালেও আজ অবধি সে-ক্ষতি পূরণ হয়নি। বলতে গেলে ১৭৬৫ বা ১৭৭০ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি (বহিরাগত) শহুরে উর্দুভাষীরা ছিল দেশজ মুসলিমের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি।

উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে মুসলিমরা সরকারী অফিসে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর তথা বেয়ারা-কেরানীর চাকরি খুঁজতে গিয়ে বড়বাবুর কৃপাবঞ্চিত হতে থাকে। তখন থেকেই হিন্দুরা এতকালের নির্বিঘ্ন অধিকারে এ মুসলিম-উপদ্রবে হচ্ছিল বিরক্ত। ব্রিটিশের অসংশয় আদর-কাড়ার পাট কিছু আগেই চুকে গিয়েছিল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। কাজেই এখন থেকে বর্ণহিন্দুর স্বার্থ-বিরোধী দুই শক্তির উপস্থিতি অনুভব করছিল হিন্দুরা: একটি জীবিকাক্ষেত্রে মুসলিমের, অপরটি শাসক-শোষক হিসেবে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের। ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদের জানল জীবিকাক্ষেত্রে জমিদার মহাজন-চাকুরেরূপে জানিদুশমন হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারও হিন্দুর ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ-রোষ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক ছিল। তাই জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস গঠন করিয়েই তারা নিশ্চিন্ত ছিল না। অবশ্য সুবেহ বাঙলার তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশালতার দরুন প্রশাসনে নানা সমস্যা অনুভব করছিল সরকার। সেজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিযুক্তির কথা মাঝে মধ্যে কমিশনার শ্রেণীর বড় বড় প্রশাসকরা ভেবেছেন এবং বিযুক্তি-বিভক্তির জন্যে চিঠি এবং লিখিত সুপারিশও পাঠিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তবু তখন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু যখন দেখল যে তরুণ হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছে, শিক্ষিত সমাজনেতারা ক্রমে সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠেছেন এবং ব্রিটিশের কাছে

নানা দাবি-দাওয়া পেশ করছেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্যে অনুপ্রাণিত বা প্ররোচিত করছেন, বিশেষ করে পঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাস-পন্থী দেখা দিয়েছে, তখন লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি দৃশ্যত প্রশাসনিক প্রয়োজনেএমনভাবে বিভক্ত করলেন যাতে বাঙলাভাষী হিন্দুরা সর্বত্র পূর্ববঙ্গে, বিহারে, ওড়িশায় উনজন হয়ে পড়ে। এভাবে বাঙালী হিন্দুর নেতৃত্ব, গুরুত্ব ও অস্তিত্ব বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে তারা সায় দিতে পারে না। ফলে এই-প্রথম বাঙালী বর্ণহিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়। তখন হিন্দুদের যুক্তি ছিল দেশমাতা বঙ্গজননীকে দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না। বঙ্গমাতার সন্তানেরা কিছুতেই তা মেনে নেবে না। ছবছর পরে ১৯১১ সনে ইংরেজরা এদের দাবি মেনেই নিল। ১৯০৫—১১ সনের আন্দোলনকারীদের প্রায় চল্লিশ শতাংশ উনিশ শ' সাতচল্লিশ সনেও বেচেঁছিল, কিন্তু এরাও বঙ্গমাতাকে বিখণ্ডিত করার দাবিতে ছিল মুখর। কেবল শরৎবসু ও কিরণশঙ্কর রায়কেই সেদিন প্রকাশ্যে অখণ্ড বঙ্গ রক্ষার চেষ্টায় নিরত দেখি। 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হওয়ায় মুসলিমরা-নেতারা মর্মহিত হয়েছিল, যদিও বাস্তবে নতুন প্রদেশে নিরক্ষর মুসলিমদের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা ছিল না বলে যখন প্রাগ্রসর হিন্দুদের হাতে চাকরি ও ব্যবসা রয়েই গেল, তখন কি লাভ হত তা স্পষ্ট নয়।

/ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ গোড়ায় বঙ্গবিভক্তির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু জমিদারীর ঋণ শোধ বাবদ না চাইতেই সরকার থেকে দশলক্ষ টাকা ঋণ পেয়ে তিনি লর্ড কার্জনের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁর শেখানো বুলি মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশসৃষ্ট নতুন প্রদেশে (৬০% মুসলিম) নাকি পঞ্চাশ লক্ষে অধিজন নিরক্ষরতাদুষ্ট গ্রামীণ মুসলিমদের সর্বক্ষেত্রে সবপ্রকার উন্নতি দ্রুততর হবে। বাস্তবে দেখা গেল অর্থে-বিত্তে-শিক্ষায় চিরকালের পিছিয়ে থাকা মুসলিমরা ছবছরের রাজধানী ঢাকায় অর্থে বিত্তে-বৃত্তিতে-বেসাতে একটুও অগ্রসর হয়নি ; বিদ্যালয়ে হিন্দু, অফিসে হিন্দু, ব্যবসায়ে হিন্দু, জমিদারী-মহাজনীতেও হিন্দু পূর্ববৎ রয়ে গেল এমনকি আবাসিক ওয়ারীর সব বাড়িই ছিল হিন্দুর। এ ছিল প্রশাসনিক বিভাগ মাত্র। কাজেই পরবর্তীকালের মতো ভিন্ন রাষ্ট্র ছিল না যে দাঙ্গা করে বিধর্মী তাড়িয়ে বিত্ত-বৃত্তি-বেসাতের মালিক হবে। নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত এমনকি ১৯২১—৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী-ফারসী বিভাগেও সব শিক্ষক

বাঙালী এবং মুসলমান ছিল না। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষক ছিল বিরল বা করগণ্য। আর বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মুসলিম ছাত্রসংখ্যাও ছিল প্রায় ১৯৪০ সন অবধি ঢাকা জেলা থেকে আসা হিন্দু ছাত্রদের চেয়েও কম।

এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে ১৯০৫ সনের পরে বিক্ষুব্ধ বাঙালী নেতাদের প্ররোচনায়, প্রেরণায় ও নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধীদের নানা দাবি ও আন্দোলন সারাভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনি সময়ে ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসে লর্ড মিণ্টোর প্ররোচনায় ও পরামর্শে উদ্যোগী জমিদার, বিত্তবান উচ্চ-শিক্ষিত, অর্থবান উকিল-ব্যারিষ্টার ও প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসারেরা স্যার সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ লক্ষ্যে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে বিত্তের ও বিদ্যার জোরে ব্রিটিশ সরকারের এসব অনুগত জনেরা অনক্ষরতা ও দারিদ্র্যদুষ্ট মুসলিম সমাজেরও আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ব্রিটিশ সরকারে চাকরির যোগ্যতা ও প্রত্যাশা ছিল না বলে মুঘলরাজত্বের গৌরবগর্বী স্বাধীনতা-কামী ইংরেজী না-জানা মৌলবী-মোল্লারা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস সমর্থকই ছিলেন, যদিও তাঁদের জামায়েত-ই-ওলেমায়ে হিন্দ, ইসলাম নামে পৃথক সংঘ-সমিতি ছিল। বাঙালী হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের ও সর্বভারতীয় হিন্দু অসন্তোষের মুখে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল সরকার। ইতিহাসের দুটো স্মরণীয় বছরের আকস্মিক সাদৃশ্য এখানে উল্লেখ্য। ১৮১৫ সনে রামমোহনের কোলকাতায় স্থায়ী বসবাসের পরে পরেই চিন্তা-চেতনা-মননের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস-ধর্মী আলোড়ন-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ১৯১৫ সনে গান্ধীর কংগ্রেসে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস পরিপূর্ণভাবে সরকারবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দুটোই বাঙলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা বাঙলা ও ভারতবর্ষ এ দুই যুগন্ধরপুরুষের অনন্য-অসামান্য মনীষায় ও কৃতিত্বে ঋদ্ধ হয়েছিল।

বলেছি ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের ও ব্রিটিশবিরোধিতার অবসানে ব্রিটিশসরকার মুসলিম তোষণনীতি গ্রহণ করেন। অগ্রিজন হিন্দুর সঙ্গে প্রতি-যোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাভীরু মুসলিমরাও নানা সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ পাবার দাবি বা আবদার করে। আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সনের পয়লা অক্টোবর মুসলিমদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও অতিরিক্ত আসন দাবি করা হয়। বড়লাট

মিন্টো এবং ভারত সচিব মর্লে মুসলিমদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতে নীতিগত-ভাবে তৈরীই ছিলেন। তাই ১৯০৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হাউস অব লর্ডসে ঘোষণা করা হয়: 'The Muhamadan demand of election of their own representatives to the Councils in all stages and the grant of number of seats in excess of their actual numerical proportion of the population would be met to the full.'

এ ঘোষণায় আন্তরিকতা কতটুকু ছিল, জানার উপায় নেই, কেননা ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে চার বছর সময় পেয়েও এর বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা হয়নি। ১৯১৬ সনে কংগ্রেস-লীগের মধ্যে আপোস মিলনমুখী একটা সমঝোতা হয়েছিল। স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বীকৃতিতে ও ভিত্তিতে পঞ্জাবে ৫০%, যুক্তপ্রদেশে ৩০%, বাঙলায় ৪০%, বিহার-ওড়িশায় ২৫%, মধ্যপ্রদেশে ১৫%, মাদ্রাজে ১৫% এবং বোম্বাইয়ে ৩৩% আসন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার করা হল। তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক-তৃতীয়াংশের আপত্তি থাকলে কোন বেসরকারী প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপিত হতে পারবে না আর কেন্দ্রেও মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মুসলিমদের দেয়া হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হল। এটির নাম লখনৌ-চুক্তি। ১৯১৭ সনে মনট্যাগু কমিশন ভারতে এসে ২০শে আগস্ট ভারতকে শর্তসাপেক্ষে স্বরাজ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কেন্দ্রোসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব, স্বতন্ত্র নির্বাচন, সংখ্যাগুরুকে প্রাপ্য আসনদান এবং তিন-চতুর্থাংশের আপত্তি থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পৃক্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করার কথা ছিল। ১৯১৬ সনের লীগ-কংগ্রেস চুক্তির সঙ্গে মনট্যাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের (১৯১৯) পার্থক্য ও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার রাওলাট বিলও (১৯১৯) হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মর্তব্য। কিন্তু এর মধ্যেই অতুষ্ট গান্ধী করলেন অসহযোগ আন্দোলন। বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বমনস্ক স্বদেশে বহির্মুখ মুসলিমরাও তখন আবেগবশে তুরস্কে খলিফা-উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে মুখর। অসহযোগ-কালে কংগ্রেস নেতা গান্ধী মুসলিমদের কৃতজ্ঞ ও সহযোগী করার লক্ষ্যে সদলে খেলাফত সংগ্রামে (১৯২০ সনে) যোগ দিলেন। কিছুকালের জন্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের লক্ষ্য হল অভিন্ন। সাময়িক উত্তেজনা ও সাময়িক বিষয়

বা ইস্যুভিত্তিক এ মিলন অনতিকালেই (১৯২৬) রক্তক্ষরা দাঙ্গায় অবসিত হল। অবশ্য ১৯২১ সনের মোপলা বিদ্রোহেও এর সূচনা বলা যেতে পারে। ১৯২৩ সনে মহাসভাপন্থীরা আর্যসমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের সমর্থনে ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এ দিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল দেখেই ১৯২৪ সনে মুসলিমলীগ সুপ্তি পরিহার করে জাগ্রত হল।

মধ্যপন্থী চিত্তরঞ্জন দাশের দলের সঙ্গে (১৯২৩ সনে) এদের একটা, বাঙলা-দেশে, সীমিত রাজনীতিক স্বার্থ বিষয়ক চুক্তিও হয়েছিল, নাম **Bengal Pact.** মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, মোপলা বিদ্রোহ ও হিন্দুপীড়ন, হিন্দু মহাসভার সমকালীন ভূমিকা, আর্যসমাজীর শুদ্ধি ও প্রচার, ১৯২৫ সনে খিদিরপুর ডকে কোরবানীর গোহত্যা নিয়ে উগ্রহিন্দুর বাধানো দাঙ্গা, রাওয়ালপিণ্ডির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৬ সনের জুন), কোলকাতার দাঙ্গা (১৯২৬ সনের এপ্রিল ও জুলাই), স্বতন্ত্র নির্বাচন ও হিন্দু নারীর মুসলিম প্রেম বা মুসলিমের হিন্দু নারীর প্রতি আসক্তি ও হরণ, গো-হত্যা, ১৯২৬ সনে শুদ্ধিনেতা শ্রদ্ধানন্দ হত্যা ও দিল্লীদাঙ্গা, ধর্মভেদ প্রভৃতি অনেক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, মানসিক ও ঐতিহাসিক লঘু-গুরু স্থায়ী ও সাময়িক কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলন অবাস্তব-অসম্ভব হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে ১৯২৬ সন ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের গতি নির্ধারণ ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অব স্টেটের কয়েকজন মুসলিম নেতা সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে প্রদেশে পরিণত করলে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে যৌথ নির্বাচনে মুসলিমরা রাজি হবে বলে এ সময় (১৯২৬ সনে) এক বিবৃতি প্রচার করেন। অবশ্য সংখ্যালঘুদেরও কিছু সুবিধে দেয়া হবে। এসব প্রস্তাব বিবেচনার কাল তখন অতিক্রান্ত। এর পর থেকে ১৯৪৭ সন অবধি চলেছে কেবল ত্রিপক্ষীয় দরকষাকষি, প্রকাশ্যে নিরাবরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে মুসলিম লীগের ভরসা ছিল ব্রিটিশ আনুকূল্যে ও সমর্থনে, বলা যায় মুসলিম লীগের শক্তির উৎসই ছিল ব্রিটিশ ভেদনীতি ও সমর্থন। ১৯৩১-৩২-৩৩ সনের রাউণ্ড টেবল বৈঠক আপাত ব্যর্থ হলেও মুসলিম লীগের তথা জিন্নাহর চৌদ্দ দফার অন্তর্গত সিন্ধু-বালুচিস্তান-সীমান্ত অঞ্চল ও আসাম প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং ১৯৩৫ সনের আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেলে, যদিও কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হল না। এমনকি কংগ্রেস-লীগের যুক্ত মধ্যবর্তী সরকারও টিকল

না দুই দলের স্বেচ্ছাকৃত অসহযোগ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট রেষারেষির ফলে। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে লাহোর সম্মেলনে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাদের অন্তরে আস্থা ছিল যে এ দাবির চরমতার আলোকে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শুভবুদ্ধি ও শ্রেয়োবোধ জাগবে এবং কংগ্রেস-লীগ একটা সমঝোতায় ও সিদ্ধান্তে পৌঁছোবে। আসলে কংগ্রেস-লীগের দূরত্ব বাড়ল ১৯৩৪ সনে জিন্নাহর স্থায়ীভাবে মুসলিম লীগের কর্ণধার হওয়ার ফলে। আগে ব্রিটিশ অনুগত ক্ষমতালোভী জমিদার-ব্যারিস্টার নিয়ন্ত্রিত লীগের তেমন কোন দৃঢ় ও স্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল না। কেবল সুবিধা ও পদপ্রাপ্তিই ছিল লক্ষ্য।

বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ লীগের নেতৃত্ব নিয়ে ১৯৩৩ সনে দেশে ফেরেন। সাধারণভাবে শিয়া-সুন্নী শ্রেণীর মুসলিম নয় ইসমাইলীরা, শরীয়ত কিছুই তাদের জানা-মানা নেই। জিন্নাহ্ ছিলেন একজন শাস্ত্রে আচারে উদাসীন, জন্মসূত্রে আগাখানী বা ইসমাইলী। তাঁর পারিবারিক জীবনও ছিল পার্সীঘেঁষা। তাঁর ও তাঁর গোষ্ঠীর স্বার্থ আর মুসলিম স্বার্থ সে-অর্থে অভিন্ন ছিল না। যদিও সুলতান আগা খান যুগের নিয়মে মুসলিম নেতাই ছিলেন। কাজেই যথার্থ তাৎপর্যে তাঁর কোন ইসলাম-মুসলিমপ্রীতি থাকার কথা নয়। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাই তিনি ছিলেন মুসলিমপক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্যনিষ্ঠ কৌঁসুলী বা অ্যাডভোকেট এবং মানতেই হবে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করে সমকালের মুসলিমদের আবেগানুগ দাবি পূরণে সফল হয়েছেন, আচকান-পাজামা ও টুপি পরেই তিনি মুসলিম ও মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সনের নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হকের কৃষকপার্টি বেশি সংখ্যক (৩৬) মুসলিম আসন লাভ করে, মুসলিম লীগ আশানুরূপ আসন পেল না। ফজলুল হক পরিণামে (১৯৩৭ অক্টোবর) লীগে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেন বাঙলায়। এ সময়ে সব বিভাগে পূর্বে বঞ্চিত মুসলিমদের বেশি চাকরি দেওয়ার নীতি গ্রহণ (৬০%) করলেও বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি-প্রকৌশল ক্ষেত্রে নিয়োগ করার মতো যোগ্য মুসলিমের তখন অভাব থাকায় উক্ত বিভাগগুলোতে পূর্বের মতো হিন্দুর হাতেই মুসলিমদের প্রাপ্য পদগুলো ছেড়ে দিতে হল। এদিকে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হল ১৯৪০ সনের মার্চে। ১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে কংগ্রেস গান্ধীর প্রবর্তনায় ব্রিটিশ সরকারকে 'ভারত ছাড়' বলে হুমকি দিল। কোথাও

কোথাও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হল তরুণেরা। গান্ধীসহ সব কংগ্রেস নেতা বন্দী রইলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান অবধি। এদিকে পূর্বানুমতি না নিয়ে ফজলুল হক বড়লাটের 'National Defence Council'-এ যোগ দিলেন। জিন্নাহ্-ফজলুল হকের এ দ্বন্দ্বে ফজলুল হক ১৯৪১ সনের ডিসেম্বরে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কংগ্রেসনেতা শরৎ বসুর সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে ১৯৪১ সনে হিন্দুমহাসভানেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সদলে জুটে শ্যামা-হক (progressive coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তা বেশী কাল টিকল না। ১৯৪৩ সনের ১৩ই এপ্রিল নাজিমউদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ সনের মার্চে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভারও পতন ঘটল বাজেট সেশনে আকস্মিক ভোটে। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে প্রায় সব আসনে লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হল। সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত হল মন্ত্রিসভা। ১৯০৬ সন থেকে প্রভা-প্রভাবহীন লীগ আজো অবিলুপ্ত। কিন্তু এ বিরাশি বছরের মধ্যে ওই একবারই অর্থাৎ ১৯৪৬ সনেই বাঙলায় নির্বাচনে জয়ী হয়ে (১২১ আসনের মধ্যে ১১৩ টায়) পাকিস্তান বানানোর সহায়ক হয়েছিল।

১৯৪১ সনে ফজলুল হক লীগ ছেড়ে হিন্দুদের সঙ্গে জোট বেঁধে আবার মুখ্যমন্ত্রী হন। এ সময়ে জাপানের ভারতমুখী অভিযানে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাঙলার গভর্ণর মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাকে না জানিয়েই বাঙলায় 'পোড়ামাটি' (scorched earth) নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ আমলাদের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চল থেকে বাঙলার ধান-চাল বাঙলার বাইরে সরিয়ে ফেলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। ত্রিশ হাজার দেশী নৌকো বাজেয়াপ্ত ও ফুটো করে অকেজো করে রাখা হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ হয়, যার নাম 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' যাতে বাঙলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ নির্বিত্ত-নিঃস্ব মানুষ খাদ্যাভাবে বীভৎসভাবে পথে-ঘাটে মরে। ফজলুল হক এ পরোক্ষ গণহত্যার জন্যে গভর্ণরকে প্রকাশ্যে দায়ী করে বলেন, 'At the present moment we are faced with a rice famine in Bengal mainly in consequence of an uncalled for interference on your part and of hasty action on the part of the joint Secretary.'

মুসলিম লীগ তথা জিন্নাহ যখন ফজলুল হককে for his treacherous betrayal of the league organization and the mussalmans generally

(Dec. 26. 1941) অভিযুক্ত করলেন, ফজলুল হকও কমতাপ্রিয় জিন্নাহর স্বৈরতন্ত্রতার সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন—'this one man was more haughty and arrogant than the proudest of the pharaohs. To add to our miseries, this Superman has been allowed to exercise irresponsible powers which even the Czars in their wildest dreams might have envied.' (letter to the leadeers. Hindusthan Standard, 21 June 42, as Quoted in Muslim politics in Bengal (1937-47).

এর পরে কষ্ট ফজলুল হক হিন্দুদের সঙ্গে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন ১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বরে।

এ সময়ে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপায়ণ যে বাঙলার মানুষের স্বার্থবিরোধী তা বিশদভাবে যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে বর্ণনা করেন, ১৯৪২ সনে ২০শে জুনে অনুষ্ঠিত 'Hindu-Muslim Unity Conference'-এ (Hindusthan Standard, 21 June '42, Quoted by Seela Sen).

লাহোর (পাকিস্তান) প্রস্তাবটি ছিল এরূপ 'Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so consitituted, with such teritorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent Units should be autonomous and sovereign.'—এ সম্বন্ধে ফজলুল হকের টীকা-ভাষ্য ছিল এরূপ :—We have to remember that the provinces geographically adjacent to Bengal are Assam, Bihar and Orissa. In Assam the Muslims are only 35% in Bihar 10% and in Orissa barely 4%. It is, therefore, evident that Bengal, as constituted cannot form an autonomous state with the geographically adjacent provinces.

If however, Bengal has got to be divided into two, the result will be that the Eastern Zone which will be a predominently Muslim area will be surrounded by four provinces in which Hindus will be in a majority.

ফজলুল হকের এ তথ্য-প্রমাণ সব রাজনীতিকেরই দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন করেছিল। এ তথ্যই জিন্নাহ-সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাসেমকে বাঙলা অবিভক্ত রাখার প্রয়াসে প্রবর্তনা দিয়েছিল, বরদলইকে আসামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দাবি দৃঢ় রাখায় শক্তি দিয়েছিল, শরৎবসু-কিরণশঙ্কর রায়কে পূর্ব বাঙলার হিন্দুর স্বার্থে বাঙলা অখণ্ড রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল আর গান্ধী উৎসাহিত হয়েছিলেন বরদলইকে প্ররোচিত করতে এবং শরৎ বসুকে বাঙলা অখণ্ড রাখার চেষ্টা থেকে বিরত করতে। এবং মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছিল আসাম ও পশ্চিম (বর্ধমান বিভাগ ব্যতীত) বঙ্গ ও পূর্ণিয়া দাবি করতে। আর মুসলিম লীগারদের সাধারণ ভাবে Truncated & moth eathen পাকিস্তান পেয়ে ঠকে যাওয়ার বেদনা ও ক্ষোভগ্রস্ত করেছিল।

১৯৪০-৪৬ সন ছিল বাঙলার তথা ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এসময়েই লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, বিপ্লবাত্মক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়, চলমান যুদ্ধে সহযোগিতায় কংগ্রেসের অসম্মতি, বোম্বাই উপকূলে নৌ-সৈন্যের বিদ্রোহ, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র নির্মাণে জটিলতা, কংগ্রেস-লীগ-দেশীয় রাজন্য-ব্রিটিশের মধ্যে তীব্র দরকষাকষি, ভারতীয় মুসলিমদের একক নেতৃত্বে ও প্রতিনিধিত্বে লীগের ও জিন্নাহর প্রায় অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠা, চক্রবর্তী রাজা-গোপাল আচারিয়ার প্রখ্যাত ফরমূলা (জুলাই ১৯৪৪), গান্ধী-জিন্নাহর আলাপ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) সিমলা কনফারেন্স (১৯৪৫, জুন), কেন্দ্রে ও প্রদেশে নির্বাচন (১৯৪৫-৪৬) এবং রাজনীতি-প্ররোচিত (১৬ই আগস্টের, Direct action 1946) কোলকাতার, নোয়াখালীর ও বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর ক্যাবিনেট মিশন প্রভৃতি এসময়কার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৪৫ সনের জুন মাসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতে স্বায়ত্তশাসন দানের নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের নেতাদের সিমলায় এক সম্মেলন আহবান করেন। তাতে কোন ফল হয়নি। ১৯৪৬ সনের মার্চে লর্ড পি. লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডার—এ তিন

সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন ব্রিটিশ সরকার। উদ্দেশ্য তিনটি (১) অধিকজন সমর্থিত একটি সংবিধান পদ্ধতি নির্ধারণ (২) শাসনতন্ত্র নির্মাণ কমিটি তৈরী এবং (৩) কেন্দ্রে প্রধান রাজনৈতিক দল সমর্থিত একটি Executive Council গঠন। ১৯৪৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার তথা শ্রমিক দলের সরকার পাকিস্তান-হিন্দুস্তানরূপে ভারত বিভাগে নীতিগতভাবে রাজি হয়ে এক ঘোষণা দিল। ঘোষণা শোনা মাত্রই বাঙলার হিন্দুমহাসভা দাবি করল বাঙলার বিভক্তি। অখণ্ড বাঙলা রাখার জন্যে অখিল দত্ত প্যাটেলের ও গান্ধীর কাছে সযুক্তি ব্যাকুল আবেদন জানালেন। এদিকে মূল প্রস্তাবের Independent States-এর 'S' বাদ দিলেন জিন্না। বাঙালী নেতা সোহরাওয়ার্দীরা তা মেনেও নিলেন, হিন্দুবিদ্বেষ বশে ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জোশে।

দেশের দখল পেয়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একবার মন্বন্তর ঘটিয়েছিল ১৭৬৯ সনে, ছিয়াত্তরের সে-মন্বন্তরের বিভীষিকার প্রজন্মক্রমিক শ্রুতিস্মৃতি আজো জনমনে প্রকট, আবার জাপানের ভারত বিজয়ের আশঙ্কায়-আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার ধান-চাল-সরিয়ে ফেলে যাতায়াত ও চালান ব্যবস্থা নষ্ট করে ১৯৪৩ সনে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে আবার নিঃস্ব বাঙালীকে হত্যা করে। পঞ্চাশের সেই মন্বন্তর এখনো স্বজন-হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ জাগায়। এ পোড়ামাটি নীতিগ্রহণ ছিল শঙ্কিত ও নিতান্ত বিকৃতবুদ্ধি অক্ষমের প্রতিহিংসাজাত। কেননা তখন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের জাপানী অভিযান ঠেকানোর মতো জনবল কিংবা অস্ত্রবল ছিলই না। জাপান এল না, খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাল পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাঙালী।

রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রেয়োবাদী উদারপন্থী হিন্দু-মুসলিমরা যতই এক জাতিত্বের বা একক জাতীয়তার কথা বলুন না কেন, বাস্তবে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু কেবল হিন্দু হয়েছিলেন, হয়েছিলেন হিন্দু উজ্জীবনবাদী। আর মুসলমানরাও হয়েছিলেন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বচেতনাপুষ্ট হয়ে স্বদেশে প্রবাসী। কাজেই সেদিন সে-অবস্থায়, সেই দ্বেষ-দ্বন্দ্বদুষ্ট মানসিকতার প্রতিবেশে ভারত বিভক্ত হতই। কেননা মনের মিল কিংবা মতের অভিন্নতা ছিল না। হিন্দুরচিত মধ্যযুগের ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিমদের প্রতি ক্ষোভ, বিদ্বেষ, নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল। সেজন্যে শিক্ষিত দেশজ মুসলমান বাঙলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকেই বরণ করতে চেয়েছিল। যেমন একই কারণে বিহারের ও উত্তর ভারতের হিন্দুরা উর্দু

পরিহার করে হিন্দি বরণ করেছিল সাগ্রহে। তাই grouping or federal সরকারবদ্ধ হয়েও হয়তো শিথিল বন্ধনে টিকে থাকতে পারত না। এটা ছিল শিক্ষিত ও শহুরে সমাজের তৈরী বিদ্বেষ-বিভক্তি। সাধারণ চাষী-মজুর ও বৃত্তিজীবী মানুষেরা গোটা ব্রিটিশ ভারতে শোষণ-পীড়ন অসহ্য হলে প্রায়ই বিদ্রোহ করেছে, করেছে স্থানিকভাবে; অজ্ঞ অনক্ষর দরিদ্র বলে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে পারেনি। সে-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল না কেবল, জমিদার মহাজন-নীলকুঠিয়াল প্রভৃতি সব শোষক-শাসকের বিরুদ্ধেই ছিল। পদচ্যুত ফকিরসন্ন্যাসী থেকে ওহাবী-ফরায়েজী, নীলচাষী অবধি কে বিদ্রোহ করেনি? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কোন কোন সংখ্যায়, প্রজাশোষণ ও প্রজাপীড়নের যেসব বর্ণনা রয়েছে তা ধর্মনির্বিশেষে সব নির্যাতিত চাষীরই জীবনকথা। ব্রিটিশ শাসনকালে নতুন পরিবেশে ব্রিটিশ ইতিহাসকারদের ও শাসকদের কারসাজিতে হিন্দুর ও মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে বিষাক্ত। স্থূল কারণগুলো এই:

১. তুর্কীমুঘলের মিথ্যে জাতিত্বচেতনা বাঙালী মুসলমানদের বিভ্রান্ত বিড়ম্বিত করেছে।

২. ভেদনীতির সাফল্য লক্ষ্যে ব্রিটিশরচিত ইতিহাস এবং সমকালীন ভুল তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার এবং তুর্কীমুঘলকে 'মুসলিম'—এ সাধারণ নামে চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি শিক্ষিত হিন্দুদের মুসলিমদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ করে তোলে। তারই বাহ্য ও প্রকাশ্যরূপ ছিল মন্দির-মসজিদ, গোহত্যা, বাজনা ও মিছিল নিয়ে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে স্থানিক ও বার্ষিক দাঙ্গার পৌনঃপুনিকতা।

৩. প্রতীচ্য শিক্ষা হিন্দুকে স্বধর্মীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি শিক্ষিত মুসলিমরাও হিন্দুদের পূর্বের প্রজা এবং বর্তমানে জমিদার-মহাজন-চাকুরে রূপে শোষক, শাসক ও প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী ভাবতে থাকে।

৪. জাত যায় বলে, সমাজে ঠাঁই হয় না বলে হিন্দু তরুণেরা গাঁয়ে-গঞ্জে ও শহরে মুসলিম মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত না, কিন্তু মুসলিমদের সেরূপ কোন মানসিক বা সামাজিক বাধা ছিল না বা নেই বলে সহজেই হিন্দু মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কাম-প্রেমের আবেগ অপ্রতিরোধ্য। কাজেই হরণ, পলায়ন বা বরণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। হিন্দুরা দাম্পট্যকে বর্বর মুসলিমদের জাতীয় স্বভাব বলেই জানত।

৫. বিত্ত-বিত্ত-আভিজাত্যগর্বী বর্ণহিন্দুরা স্বধর্মী নিম্নবর্ণের ও বৃত্তির লোকদেরই পুরো মানুষ বলে গণ্য করত না, সে অবস্থায় ওদের জাতি ও সমশ্রেণীর, অবস্থার এবং অবস্থানের মুসলিমদের তাই মানসিক ও সামাজিক ভাবে শ্রদ্ধায়-সৌজন্যে সমাদরে গ্রহণ করতে পারেনি ; পূর্বের বিধর্মী তুর্কী-মুঘল দুঃশাসনের প্রতিক্রিয়াজাত বিদ্বেষ এবং বর্তমান অবস্থানজাত ঘৃণা অবজ্ঞা হিন্দুমনে ছিলই।

৬. শিক্ষিতহিন্দু স্বধর্মীর জাতীয়তা ভিত্তি করে স্বধর্মীর য়ুরোপীয় আদলে পুনরুজ্জীবন কামনা করে। ইতিহাসে অজ্ঞ অনক্ষর মুসলিমরাও স্বাধীনতা হরণে ব্রিটিশকে এবং সম্পদ হরণে হিন্দুকে দায়ী করে ক্ষুব্ধ হতে থাকে।

৭. অতএব, উনিশ-বিশ শতকের ব্রিটিশশাসন আমলে দুই প্রতিপক্ষ হিন্দু-মুসলিমের সমকক্ষ স্বদেশী স্বভাষী রূপে মিলন ছিল অসম্ভব।

১৯৬০-উত্তর কালে হিন্দু-মুসলিমের পূর্ব সম্পর্কের বিস্মৃতি ঘটেছে, অন্তত তা আর্থিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে কেউ কারো প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বলে।

এখন হিন্দু-মুসলিমের পক্ষে পরস্পরকে কুটুম্বের মতো সৌজন্যে বরণ করাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর ফলেই এখন ভারত বিভাগের তেমন কোন গুরুতর মানসিক কিংবা আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ খুঁজে পায় না এখনকার মুসলমান কিংবা হিন্দু। তাই শাস্ত্রের, বর্ণের, সংস্কৃতির, জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার পার্থক্য ও বৈপরীত্যজাত বাধা-বন্ধনকে উদার ও যুক্তিপ্রবণ কিছু ভাবুক-চিন্তক দৈশিক-ভাষিক-রাষ্ট্রিক অভিন্ন জাতিচেতনা নির্মাণে তুচ্ছ বলেই মানেন। ইতিহাসের জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়, যে আস্তিক মানুষের পক্ষে স্বমতের, স্বধর্মের মানুষ ও জাতি-আত্মীয়-কুটুম্ব ব্যতীত নির্বিশেষ মানুষকে নিঃশর্তে ও নির্বিচারে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব। অবশ্য এ-ও সত্য যে কামে-প্রেমে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, অনুরাগে, বন্ধুত্বে, লাভে-লোভে মানুষ যখন মেলে, তখন দেশ-জাত-বর্ণ, ধর্ম-বৃত্তি-বেসাত, ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না ব্যক্তিগত জীবনে, কিন্তু শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে সে বাধা কিছুতেই ঘোচে না।

আজ সময় এসেছে এবং দায়িত্ব পড়েছে উপমহাদেশবাসীর উপর নির্মোহ দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারতের অন্তিম পর্বের ভারতীয় রাজনীতি দেখা। তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি প্রয়োগে তখনকার বিভিন্ন দলের মন, মত, আদর্শ ও লক্ষ্য জানা ও

বোঝা। বিশেষ করে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ-এ তিন দলের মতলব ও ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করার শ্রেয়োচেতনাজাত ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে আমাদের।

প্রথমেই ধরা যাক ভারতবর্ষের কথা। ব্রিটিশ সরকারের একচ্ছত্র শাসনে থেকে আমাদের মধ্যে জেগেছিল অখণ্ড ও অভিন্ন ভারতচেতনা। অথচ গোটা ভারত কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে একক শাসনে ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক কালের কথাই ওঠে না, ইতিহাসের আলোকেও দেখি যে মৌর্য-শক-কুষাণ-পার্সী-গ্রীক-গুপ্ত-পাল ও দাক্ষিণাত্যের পল্লব চোল-চালুক্য কিংবা মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল কেউ গোটাভারত শাসনের অধিকার ও গৌরব পায়নি। ব্রিটিশও পায়নি কখনো প্রত্যক্ষ শাসনের অধিকার। কাজেই অখণ্ড ভারতকে এক দেশ ভাবার কারণ ছিল না বাস্তবে। কংগ্রেস মাধ্যমেই ভারতীয় জাতিচেতনা জাগাবার ও প্রচার-প্রচারণার প্রয়াসও দেখা দেয় বিশশতকে। ১৮৫৭ সনের আগে (সিন্ধু ১৮৪০ সনে, পাঞ্জাব ১৯৪৯ সনে, আসাম ১৮২৬ সনে) গোটা ভারতরূপ দেশচেতনার কারণও ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনকালে অখণ্ড ব্রিটিশভারত গড়ে ওঠেনি বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিচেতনা নিবদ্ধ ছিল সুবাহ্-ই-বাঙালায় তথা বেঙ্গল প্রেসি-ডেন্সীর সীমায়। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আদিকাল থেকেই বিশাল ভারত রক্তে, বর্ণে বর্গে, গোত্রে, ভাষায়, ভৌগোলিক অবস্থানে দৈহিক গঠনে-অবয়বে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, পোশাকে, রুচিতে, খাদ্যে, পেশায় ছিল বিভিন্ন, বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এশিয়া-য়ুরোপের মতোই ভারতবর্ষ বহুজাতিক উপমহাদেশ (মধ্যে সামুদ্রিক বিচ্ছিন্নতা থাকলে এশিয়াভুক্ত না হয়ে এটিও একটি ভিন্ন মহাদেশ নামে অভিহিত হত)। মুঘল আমলে ভারতবর্ষে স্বাধীন, করদ ও তাঁবেদার রাজ্যের মোট সংখ্যা হল প্রায় সাড়ে সাতশ। এ সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়নি। ব্রিটিশ শাসনকালেও পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেন মুসলিমরাও। ব্রিটিশবিতাড়নলক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার গরজে উচ্চারণে অভিন্ন বা একক জাতিচেতনা ও একক জাতীয়তার অঙ্গীকার অভিব্যক্ত হলেও মানসিকভাবে তা কখনো আত্মীকৃত হয়নি। তার প্রমাণ জিন্নাহ্-উচ্চারিত দ্বিজাতিতত্ত্ব রাজনৈতিক ভাবে অস্বীকৃত হলেও, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের গৌত্রিক ও ভাষিক প্রদেশ বা রাজ্যগঠনের দাবি ওঠে সর্বত্র, পাকিস্তানেও ছিল লঘুভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি। রাষ্ট্রিক পরিচয়ে একক

জাতি হলেও এ মুহূর্তেও ভারতের সর্বত্র গৌত্রিক, ভাষিক ও ভৌগোলিক জাতিসত্তাচেতনাই প্রবল ও বাস্তব। পাকিস্তানেও তাই। কাজেই জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' দাবি তথ্য ও তত্ত্ব হিসেবে অসঙ্গত ছিল না, যদিও দাবিটা বাস্তবে সুষ্ঠু শ্রেয়োবোধজাত ছিল না। কেননা মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রতি কোনই জুলুম হতে পারত না, যেমন ১৯৩৭—৪৭ সনের বাঙলায় আসামে পঞ্জাবে সিন্ধে-বালুচিস্তানে বা সীমান্তপ্রদেশে হয়নি বা এখনকার ভারতীয় কাশ্মীরে হয় না। চৌধুরী রহমত আলী, কবি ইকবাল বা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কামনার মধ্যে ব্রিটিশের পরামর্শ ও প্ররোচনা ছিল কিনা জানি না, তবে ভেদনীতিনির্ভর কূট-কৌশলী ব্রিটিশসরকার প্রকাশ্যে মুসলিম লীগকে নিতান্ত অন্যায়-অযৌক্তিকভাবে মুসলিমদের একমাত্র মুখপাত্র বা প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়ে কেবল যে নির্লজ্জ নির্বিবেক পক্ষপাতিত্ব দেখাল, তা নয়, রাজনীতির ধারাও গেল এতে বদলে এবং অবাঞ্ছিত পরিণামও করল ত্বরান্বিত। অথচ বাঙলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ ছাড়া ব্রিটিশ ভারতের কোথাও মুসলিম লীগের গণভিত্তি, প্রভাব বা জনপ্রিয়তা ছিলই না। ব্রিটিশস্বীকৃতির ফলেই তথা পাকিস্তান প্রাপ্তির পরোক্ষ আশ্বাস ব্রিটিশ সরকারের কথায়-কর্মে-আচরণে আভাসিত হওয়ার ফলেই ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে এবং ওই একবারই মুসলিম লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হল বাঙলায় বিহারে উত্তরপ্রদেশে পঞ্জাবে ও সিন্ধে।

তবু জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' দাবি পরিহার করতে হল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাপের মুখে। আগেও গ্রহণ করেছিলেন তিন ভাগে স্বায়ত্ত প্রশাসনিক ভারত বিভক্তি প্রস্তাব, সার্বভৌম একক ভারতরাষ্ট্রের উপবিভাগ হিসেবে। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল এ প্রস্তাব মেনে নিয়েও আকস্মিকভাবে বলে দিলেন মনের কথা—এ প্রস্তাব অবিকল গ্রহণ করব, কি প্রয়োজন মতো গ্রহণ-বর্জন-সংশোধন করব, তা প্রয়োগকালে বিবেচনার অধিকার রইল আমাদের। অমনি শঙ্কিত জিন্নাহ প্রত্যাখ্যান করলেন 'ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব' নামের এ প্রস্তাব। অবশেষে দ্বিজাতি দাবির ভিত্তিতে নয় 'মুসলিম প্রধান ও হিন্দু প্রধান অঞ্চল' নীতির ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্র নামে। পরিণামে একক রাষ্ট্র হিসেবে এই প্রথম ৭৮১টি সামন্ত রাজ্য নিয়ে আরব সাগর থেকে চীন-বর্মা সীমান্ত অবধি বিশাল ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কাজেই ইতিহাসের আলোকে

দেখলে এ উপমহাদেশ প্রথম একটি সংহত জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল। এ তাৎপর্যে বিযুক্ত পাকিস্তানকে কিংবা বিচ্ছিন্ন বাঙলাদেশকে উপেক্ষা করা চলে। অতএব ১৯৪৭ সনে বিভক্তি নয়—কার্যত এক ধরনের সংহতিই সাধিত হয়েছিল, আবহমানকালের বহু বিচিত্র জাতিসত্তা ও জাতি প্রথমে দুটো রাষ্ট্রিক জাতিতে, এ মুহূর্তে তিনটে রাষ্ট্রিক জাতিতে স্থিতি পেয়েছে। অতএব, ইতোপূর্বে ভারতবর্ষ কখনো এক জাতির এক দেশ ছিল না। পরেও হয়নি। কাজেই দেশবিভাগের জন্য দীর্ঘশ্বাস কিংবা ক্ষোভ অযৌক্তিক আবেগপ্রসূন। সরকার যখন ভারত বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, তখন এ. কে. ফজলুল হক ব্যাখ্যাত বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গের বিপন্ন-অস্তিত্বচেতনা বাঙালী মুসলিম নেতা আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দীকে বিচলিত করে। অথবা তাঁরা উভয়েই পশ্চিম বাঙলার বলে তাঁরা বাঙলাবিভক্তি রোধে প্রয়াসী হন। পূর্ববঙ্গে উনজন বর্ণহিন্দুর ভাবী ক্ষতির ও অস্বস্তির কথা ভেবে শরৎচন্দ্র বসু-কিরণশঙ্কর রায়ও প্রয়াসী হন বাঙলাকে অখণ্ড রাখতে (ফিরোজ খান নুন প্রমুখও চাইলেন পঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখতে)। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিপন্নতা ঘোচানো লক্ষ্যে জিন্নাহ তাঁর পূর্বমতাদর্শ নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়ে বললেন বাঙলায় (এবং পঞ্জাবেও) রক্তে, গোত্রে, ভাষায়, ভৌগোলিক অবস্থানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম বাঙালী অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে ধর্মভেদ এক্ষেত্রে তুচ্ছ। পূর্ববাঙলার ভাবী বিপন্ন অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে আসামের গোপীনাথ বরদলই এবং স্বয়ং গান্ধী যিনি সর্বপ্রকার বিভক্তির ও বিচ্ছিন্নতার প্রমূর্ত প্রতিবাদ, বাঙালীর এ প্রয়াস অসমর্থনে ব্যর্থ করে দিলেন। ডিসরেলী প্রোক্ত 'There is no last word in politics'-কে গান্ধী-জিন্নাহ্ এভাবে সত্য ও বাস্তব করে তুললেন।

এ জিন্নাহই গভর্ণর জেনারেলরূপে প্রথম বক্তৃতাতেই সেক্যুলার রাষ্ট্র করে দিলেন পাকিস্তানকে, বললেন 'রাষ্ট্রে সরকারের চোখে নাগরিক মাত্রই সমান। হিন্দু থাকবে না হিন্দু, মুসলিম থাকবে না মুসলিম, ধর্ম বিশ্বাস হবে ব্যক্তিগত, সবাই পরিচিত হবে 'পাকিস্তানী নাগরিক' আখ্যায়। তাহলে এতো দ্বন্দ্বসংঘর্ষ-রক্তপাতের প্রয়োজন কি ছিল? পাকিস্তান কথা রাখেনি, ইসলামীরাষ্ট্র হয়েছিল।

পরিশিষ্ট-১

ব্রিটিশ আমলে মুসলিমদের অনুগৃহীত করে অনুগত করার ও রাখার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্যে ইংরেজ সরকার সীমিত ও সামান্য অর্থব্যয়ে হলেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে তা কখনো সফল হয়নি।

দেশজ মুসলিম এবং বিদেশাগত প্রশাসক মুসলিমরা ছিল সব রকমে বিচ্ছিন্ন পৃথক দু'টো সমাজ। অথচ কোম্পানী সরকার মুসলিমদের বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্যে যেসব মুসলিমের সাহায্য, সহায়তা ও পরামর্শ নিয়েছেন তাঁরা ছিলেন মুর্শিদাবাদের কোলকাতার উর্দুভাষী উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান, যাদের সঙ্গে বাঙলাভাষী মুসলিমদের কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভাষিক সম্পর্ক তুর্কী-মুঘল আমলে এবং উনিশ শতকেও গড়ে ওঠেনি। ফলে দেশজ মুসলিম তথা বাঙলার মুসলিম সম্বন্ধে মুসলিমদের স্বয়ংসিদ্ধ স্বঘোষিত ও কোম্পানীনিযুক্ত প্রতিনিধিরা শিক্ষা কমিটি প্রভৃতিতে যেসব বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের হয়ে যেসব দাবি করেছেন, তা বাস্তবে ভুল ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। দেশজ মুসলিমদের হীনমন্যতার সুযোগ নিয়ে ১৯৪৭ সাল অবধি বাঙালী মুসলিমদের চিন্তার, চেতনার ও রাজনীতির, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাধারণভাবে কোলকাতার ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিদেশাগত মুসলিমদের উর্দুভাষী জমিদার মুসলিমরা। উনিশ শতকের সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, খোন্দকার ফজলে রাব্বি থেকে ইস্পাহানি-নাজিমুদ্দীন-আবদুর রহমান সিদ্দিকী-সোহরাওয়ার্দী অবধি কেউ উর্দুভাষী নন। এমনকি এ. কে. ফজলুল হকও বিবাহ সূত্রে উর্দুভাষিতা লাভ করেছিলেন।

আরো একটি কথা, বাঙলার মুসলিমদের গোত্রগত বিভাগও তথ্যভিত্তিক নয়—অজ্ঞলোকের বানানো। যেমন শেখ-সৈয়দ-পাঠান-মুঘল। শেখ-সৈয়দ মাত্রই আরব হওয়ার কথা। পাঠান হলে কেবল আফগান এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত এলাকার হবে, আর মুঘল হলেও মধ্য এশিয়ার একটি গোত্রভুক্ত হয় মাত্র। ইরান-ইরাক মধ্যএশিয়া থেকে আগত ও অভিবাসিত লোকেরা বাদ পড়ে যায়।

আসলে দেশী লোকদের ইসলাম বরণে উৎসাহিত করবার জন্যেই গোড়ার দিকে আরবী শেখ-সৈয়দ যুক্ত হত তাদের নামের সঙ্গে, পরে তুর্কী-মুঘল আমলে দীক্ষিতদের নামের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে যুক্ত হত খাঁ এবং এখনো হয়। এজন্যেই

প্রায় সব আজলাফ শেখ, যারা অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় বড় হয়েছে তারা চৌধুরী, ভূঁইয়া (ভৌমিক), খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, কাজী, সৈয়দ, কোরদার, মীর, মীর্জা, মজুমদার, পাটোয়ারী, মৃধা প্রভৃতি হয়েছে, অন্যরা আজো বিশ্বাস, মোড়ল, মণ্ডল, মল্লিক, প্রামাণিক আর পেশাজীবীরূপে মুলঙ্গী, কাগজী, জুলহা, নিকেরী, কাহার, তেলী প্রভৃতি শ্রেণী নামে অভিহিত হত, এখনো হয়তো হয়।

পরিশিষ্ট-২

দেশজ মুসলিমদের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না এবং অর্থসম্পদও ছিল না বলেই তারা নব প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়নি, তাদেরই জ্ঞাতি বা স্বশ্রেণী নিম্নবর্ণের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য শ্রেণীর মধ্যেও উনিশ শতকে শুধু ইংরেজী শিক্ষার নয়, শিক্ষারই প্রসার ঘটেনি—শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলেই।

বিদেশাগত প্রশাসক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা সামরিক ও প্রশাসনিক পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নওয়াবী আমলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সপরিবারে বাঙলাদেশ ত্যাগ করেছিল, স্বল্প সংখ্যায় যারা থেকে গিয়েছিল, তারা সন্তানদের ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িয়েছে, কারো উচ্চশিক্ষা হয়েছে, কারো হয়নি।

দেশজ মুসলিমদের যাদের মধ্যে ফারসী লেখা-পড়া চালু হয়েছিল, তারাও সন্তানদের ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছে, প্রতিবেশ প্রতিকূলে ছিল বলে বিদ্যার বিস্তার ঘটেনি। আমাদের এ ধারণার সমর্থনও মেলে :

Robert Orme তাঁর 'Historical Fragments of Mugal Empire' গ্রন্থে বলেছেন—'The Moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect......under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of Moors comprehends all the descendants of converted—amiserable race as none but the most miserables of the gentoos castes are capable of changing their religion'.

বাঙালী-বাঙলাদেশী

আজকের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের আটানব্বই ভাগই বাঙালী। অর্থাৎ বহুশতাব্দীর রক্তসঙ্কর মানুষ ভৌগোলিক, আবস্থানিক, আবাসিক, ভাষিক ও জীবিকাগত সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠতায় অভিন্ন পরিচয়ে শাস্ত্রগত বিশ্বাসের ভিন্নতা, অবজ্ঞা, অসূয়া থাকা সত্ত্বেও বাঙালী পরিচয়ে স্বস্থ, সুস্থ, ও আত্মীয়তা-বোধে আত্মস্থ। তবে প্রগতিশীলেরা শুধু বাঙালী হলেও অন্যরা হয়তো আগে মুসলিম, হিন্দু, খ্রীস্টান বা বৌদ্ধ এবং পরে বাঙালী আর কেউ কেউ আগে বাঙালী পরে হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি। জ্ঞান-প্রজ্ঞা যুক্তির ও মন-মননের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুসারে শেষোক্ত দু'টো শ্রেণী গড়ে উঠেছে। অতএব মাপে মানে মাত্রায় বাঙালীদের পার্থক্য রয়েছেই। তাই স্বদেশ স্বজাতিবোধেও রয়েছে মাপ মান মাত্রায় পার্থক্য। রাজনৈতিক মত-পথ-মন্তব্যেও ব্যক্তির বা দলের কর্মে-আচরণে তা কখনো প্রকট হয়েও ওঠে। তবে নিজেদের বাঙালী সত্তা সম্বন্ধে আজকাল আর কেউ সন্দেহ বা আপত্তি পোষণ করে না। আগে করত, যেমন মুসলিমরা আরবী ইরানী ইরাকী সমরখন্দী বোখারী মক্কী মদিনী সৈয়দ হাসেমী কোরাইশী বলে গর্ব করত। আর বর্ণহিন্দুরাও নিজেদের উত্তর ভারতীয় আর্য-বংশজ বলে কুলপঞ্জী তৈরী করাত।

বাঙলাভাষী সকল বাঙালীর অর্ধাংশমাত্র বাস করে বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্রে। ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী সজ্ঞানে যুক্তিগ্রাহ্য একটি কৃত্রিম পরিচয়ে অভিহিত হতে চায়, বলে 'আমি ভারতীয়'। অর্থাৎ রাষ্ট্রিক পরিচয়ে আমি ভারতীয়। এবং ভাষিক জাতিসত্তায় বাঙালী। অতএব, ভাষিক-ভৌগোলিক অভিন্নতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক ভিন্নতা দুই বাঙলার বাঙালীকে অভিন্ন জাতি রাখেনি, জাতিসত্তায় অভিন্নতাও ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যহেতু অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত নয়। আর ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরম্পরা বা ঐতিহ্য তো গ্রহণে বর্জনে বদলায়। হিন্দু ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আরব ইরান ঐতিহ্যের ধারক হয়, খ্রীস্টান হওয়ার মুহূর্তেই হয় খ্রীষ্টীয় পরম্পরার বাহক। দেশান্তরে স্থায়িবাসী হয়েছে যারা তারাও হয় ছিন্নমূল। কাজেই চিরকালীন তথা প্রাজন্মিক পরিচয়ের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বা অবলম্বন বলতে গেলে নেই-ই।

ঢাকা শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি সচেতন ভদ্রলোকেরা যখন লেখায় কথায় ভাষণে রাষ্ট্রিক পরিচয়ে নিজেদের বাঙালী বলে দাবি করে, তখন বাঙলাদেশী বলে নিজেদের অভিহিত করে না। তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই ভিন্ন ভাষার, রক্তের ও সংস্কৃতির গারো, খাসিয়া, মুরঙ, চাকমা, মরমা, সাঁওতাল, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্বতন্ত্রসত্তা অস্বীকার করে বা তাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুভব করে না তথা তাদের মৌল মানবিক বা রাষ্ট্রে নাগরিক মাত্রেরই সমাধিকার অঙ্গীকার করে না। সরকারের বা জনগণের মনে নাগরিক হিসেবে ঠাঁই নেই দেখে ওরা হতাশ হয়, অপমানিত বোধ করে, জিম্মীর বিড়ম্বনা ভোগের আশঙ্কা করে। রাষ্ট্রকে আপন মনে করতে দ্বিধা করে তারা, তাই রাষ্ট্রিক জাতীয়তা প্রাণে-মনে-মননে দৃঢ়মূল হয়ে আবেগ-অনুভবের নিত্যসঙ্গী হয় না তাদের। রাষ্ট্রে সমতা, একতা ও একাত্মতাবোধের অভাবে তারা স্বঘরে স্বদেশে অপরিচিতির, অনাত্মীয়তার প্রতিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এসব কারণেই উনিশ শতকে য়ুরোপে এবং এ শতকে বিশ্বে অভিন্ন ভাষিক বা একক গোত্রীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, উঠছে। বিভিন্ন জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকামী দুর্বল ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলো দ্রোহী হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃত লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে। অতএব, আমরা শতে আটানব্বইজন সত্তায় বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক অখণ্ডতার ও একাত্মতার জন্যেই সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বাঙালী এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাঙলাদেশী হতে হবে আমাদের। সত্য ও শ্রেয় আমাদের এ-অঙ্গীকারেই নিহিত।

ভবিষ্যতের বাঙলা

গত একশ বছর ধরে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারায়, সমাজ-চেতনায়, ধর্ম-বোধে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, অর্থনীতিতে, ইতিহাস বিশ্লেষণে ও সাংস্কৃতিক মননে কার্ল মার্কসের প্রভাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত। মার্কসীয় তত্ত্বের এই সচেতন ও অবচেতন প্রভাব এড়িয়ে চলা মানুষের জীবন-জীবিকার কোন ক্ষেত্রেই আজ আর সম্ভব নয়। তাই কল্যাণ-চিন্তা কিংবা শ্রেয়স-চেতনা মাত্রেই আজ অল্প-বিস্তর মার্কসীয় তত্ত্ব-সংলগ্ন। মার্কসীয় প্রভাবের কয়েকটি স্থূল লক্ষণ এই :

(ক) মানুষ দেশ-জাত-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ এক সর্বমানবিক বোধের জগতে উন্নীত হয়েছে।

(খ) মার্কসের প্রভাব মানুষের মন থেকে নিয়তিবাদে আস্থা মুছে দিয়েছে। ফলে অজ্ঞতার স্বরূপ হয়েছে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং স্বাধিকার-চেতনা হয়েছে প্রবল। ধনগত বৈষম্য কিংবা পীড়ন-শোষণ নিয়তি নির্দিষ্ট যে নয়, তা উপলব্ধি করেই দুনিয়ার বঞ্চিত-শোষিত মানুষ পীড়ক-শোষকের প্রতি বিরক্ত-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এবং আসমানী শক্তি-আদিষ্ট বলে চালু সমাজব্যবস্থা ও সম্পদ-বিধির বিরুদ্ধে অনাস্থা ও দ্রোহ আজ সার্বত্রিক রূপে সুস্পষ্ট।

(গ) অজ্ঞ, অসহায়, অক্ষমের বিশ্বাসে, বিস্ময়ে, কল্পনায় যে ধর্মবোধের জন্ম, আবেগে, অনুভবে ও ভীরুতায় যার লালন, সংস্কারে ও সভয় স্বীকৃতিতে যার স্থিতি এবং ত্রাসে-শঙ্কায় যার চিরায়ু, সেই শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রাণমূলে বৈনাশিক আঘাত হেনে ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন করেছেন মুখ্যত কার্ল মার্কস-ই—বিজ্ঞান বা দর্শন নয়। কেননা বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্ররা আজো আস্তিক। আজ দুনিয়াব্যাপী নাস্তিকের আত্মশক্তিই মানুষের জন্যে সুস্থ স্বচ্ছ নতুন ভুবন রচনা করছে। সামাজিক শক্তি হিসেবে ধর্ম আজ ম্লান ও মৃতপ্রায় ; যদিও ব্যক্তি-জীবনে চালু ধর্মবোধ হয়তো অবিনশ্বর। কেননা দুর্বল মানুষের সুখ-বাসনা ও নিরাপত্তা-বাঞ্ছার অবলম্বনরূপেই এর অস্তিত্ব। এবং তেমন মানুষের অভাব দুনিয়াতে কোনকালেই হবে বলে মনে হয় না। তবু সামাজিক জীবননিয়ন্তার পদ হারিয়ে ধর্ম আজ ব্যক্তিমনের বিবরে আশ্রয় নিয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্বের সচেতন ও অবচেতন প্রভাবে মানুষ আজ স্বনির্ভর এবং তাই জীবননিয়ন্ত্রণ ও জীবিকা-

সংস্থান আজ ঐশ্বরিক নয়—লোকায়ত্ত। প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনে ও বণ্টনেই কেবল মানুষের জীবন ও জীবিকার সামাজিক ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান সম্ভব—এ আজ অনুবিত্তর স্বীকৃত। তাই আজকের মানুষ মানববাদী।

(ঘ) মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাবে ব্যক্তিমনে যে স্বাধিকার-চেতনা জেগেছে, তার ফলে তার দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি স্বচ্ছ হয়েছে, সে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়েছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি ও আত্মসম্মানবোধ। আগে যেমন ধনীর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এ যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবলতায় তা দুর্লক্ষ্য। এ যুগে হবে গুণই কেবল শ্রদ্ধেয় এবং গুণীই কেবল মান্য। ধনে বা বলে বড়োলোক হলেই কেউ সম্মান পাবে না। অর্থাৎ গুণী না হলে কেউ মানী হবে না। শোষিত ও পীড়নক্লিষ্ট মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমমর্মিতা মানুষকে করেছে সমস্যা-সচেতন, উদার বিবেচক, বিশ্বমানববাদী ও আন্তর্জাতিক।

(ঙ) তাছাড়া সরকার যে শাসকসংস্থা নয়—সমবায় সংস্থা এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গল এড়িয়ে কল্যাণ ও শ্রেয়সের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও প্রবর্ধনই যে সরকারের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব, তা আজ আর কেউ অস্বীকার করে না।

বাঙলাদেশ আজকের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কাজেই আজকের বাঙলার প্রবণতার প্রমাণে ও অনুমানে আমার চোখে ভবিষ্যতের বাঙলা এইরূপ : দেশে অদূর ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংস্থা প্রবর্তিত হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের ভারসাম্য যখন ব্যাহত হবে, তখন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে। এবং বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তির প্রভাব না থাকলে তার জন্যে হয়তো তিক্ত ও তীব্র রক্তক্ষয়ী দীর্ঘকালীন সংগ্রাম-সংঘর্ষের প্রয়োজন হবে না। কেননা বাঙালীর মধ্যে বিপুল সম্পদের অধিকারী, বিরাট শিল্পের মালিক কিংবা একচেটিয়া উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এখনো গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রীয় পোষণে গড়ে তোলার সময়ও হয়তো অপগত।

অধিকাংশ মানুষে শাস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাস অটল থাকবে। তবে তা হবে একান্ত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্য থাকবে তার সামান্যই। তখন ঐ ধর্ম পীর, দরবেশ, দরগাহ ও বলি-পূজায় নিবদ্ধ থাকবে। কেননা রোগ, দুঃখ, বিপদ-বিপর্যয় সংলগ্ন হয়েই এই ধর্ম ভীতত্রস্ত ব্যক্তিচিত্তে আশ্রিত থাকবে। সমাজে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে কিংবা রাজনীতি বা অর্থনীতিতে ধর্মের দৌরাত্ম্য

থাকবে না। এসব ক্ষেত্রে ধর্ম মুমূর্ষু ও বিলীয়মান। এখন যেমন বিধর্মী হলে পর ও শত্রু বলে মনে করা হয়, তখন মানুষকে তার ধর্মমতের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে না। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, জাতীয়তা হবে ভাষাভিত্তিক বা রাষ্ট্রভিত্তিক।

শিক্ষার প্রসারে দেশের মানুষের চিত্তলোকে মানববাদ প্রতিষ্ঠা পাবে এবং আজকের সংহত ও সংকীর্ণ ভুবনে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রজ্ঞা প্রয়োগে মানবিক সমস্যার সমাধানে ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রবল হবে। জীবন-জীবিকা সমস্যা আন্তর্জাতিক চেতনা বৃদ্ধি করবে এবং বর্ধিষ্ণু সমাজের ক্রমবর্ধমান সমস্যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে থাকবে। আর জাতীয়তাবোধের ক্রমে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ ঘটবে। কেননা সমস্বার্থে সহাবস্থান ও সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল পৃথিবীর ভাবীকালের মানুষ বাঁচতে পারবে। অতএব জাতিদ্বেষণা হবে বিলুপ্ত আর জাতীয়তাবোধও থাকবে না। নীতি হবে অহিংস আর প্রীতি, মৈত্রী ও আত্মীয়তার মাধুর্যে মণ্ডিত। কারণ মানববাদী না হলে কেউ সর্বজনীন কল্যাণকামী হতে পারে না। সর্বমানবিক ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধনা কেবল মানববাদীর পক্ষেই সম্ভব। তাই মানববাদী মাত্রেই কল্যাণবাদীও।

স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন উদার মানবিক বোধের ওপরই হবে প্রতিষ্ঠিত। সুরুচি-সৌজন্য ও শ্রেয়সই হবে তার সাংস্কৃতিক চরিত্র। প্রয়োজন-চেতনা ও সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রেরণায় বর্জন ও গ্রহণ এবং সৃজন ও বরণের মাধ্যমে তার সংস্কৃতি বিচিত্র বিকাশ লাভ করবে। সে-সংস্কৃতি সংকীর্ণ বোধে সঙ্কুচিত থাকবে না। দেশ ও জাতের রঙে অনন্য হলেও তা হবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যে সবল অর্থাৎ স্থানিক হয়েও হবে বিশ্বের এবং বিশ্বের হয়েও থাকবে স্থানিক বর্ণে উজ্জ্বল।

সমাজে থাকবে চতুর্বর্গ মানুষ—কৃষিশ্রমিক, মিলমজুর, কলমী চাকুরে ও ব্যবসায়ী। আর্থিক জীবনে বাঙালীর আপাতত স্বাচ্ছন্দ্য আসবে; অবশ্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে তার সম্পদও বাড়াতে হবে। এটাই থাকবে সর্বক্ষণের বড় সমস্যা। কারণ লোকবৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন কিংবা অর্থের আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য কর্ম।

কৃষি কিংবা শিল্পক্ষেত্রে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই চলে না, আন্তর্জাতিক বাজারে তার বেসাতির ভূমিকাও থাকা চাই। কিন্তু জীবন-জীবিকার

প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপারে স্বনির্ভরতা ও পণ্যের বাজার দখলের যে প্রতি-যোগিতা বিশ্বব্যাপী চলছে, তাতে সুবিধেমতো ঠাঁই করে নেয়া কোন নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়।

ইউরোপের ধনী ও বেনে রাষ্ট্রগুলোও আজ দারিদ্র্য-ভয়ে কাতর। এই জন্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ যৌথ কারবারে আত্মত্রাণ সন্ধানী। অতএব এ যুগে খণ্ড ক্ষুদ্র হয়ে কেউ বা কোন রাষ্ট্র বাঁচতে পারবে না। সমঝোতা ও সহ-যোগিতার মাধ্যমে সংহতি তাই কাম্য হয়ে উঠছে সর্বত্র। আগামী শতকের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলেও পারস্পরিক গরজে একটি পূর্বাঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘ বা ফেডারেশন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাই প্রবল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

১. বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
২. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন।
৩. গোরখবাণী : ডঃ পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।
৪. গোর্খ বিজয় : ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত।
৫. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [২য় খণ্ড, ২য় সং] : অক্ষয়কুমার দত্ত।
৬. প্রাচীন পুঁথির বিবরণ [১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা] : আবদুল করিম।
৭. ইউসুফ জোলেখা : শাহ মুহম্মদ সগীর।
৮. লায়লী মজনু : দৌলত উজির বাহরাম খান।
৯. বালকনামা : নয়ানচাঁদ ফকীর।
১০. সমসাময়িক ভারত [১ম খণ্ড] : যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
১১. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডঃ সুকুমার সেন।
১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [১ম খণ্ড] : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [১ম সং] : আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৩৯।
১৪. বাংলার ইতিহাস : ষ্টুয়ার্ট।
১৫. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায়. ১৯৫৮।
১৬. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা : নরহরি কবিরাজ, ১৯৫৭।
১৭. রম্যাঁ রলাঁর ভারতবর্ষ : অবন্তী সান্যাল।
১৮. স্যার সৈয়দ আহমদ : সৈয়দ আলতাফ হোসেন।
১৯. হালী : মৌলানা মুজিবুর রহমান অনূদিত।
২০. বাংলা ও বাঙালী : অজয় রায়, ঢাকা।

ইংরেজী

১. History of Bengal, vol II : Dhaka University.
২. Obscure Religious Cult : Dr. Shashi Bhushan Dasgupta.
৩, Economic History of India, vol 2 : N. K. Sinha.
৪. Muslim Politics in Bengal : Seela Sen.
৫. Historical Fragments of Mugal Empire : Robert Orme.
৬. The Muslim : William Hunter.
৭. Transition Bengal : Dr. A. Majid Khan.
৮. Historical & Social Development, vol I : B. M. Bhatia.
৯. Bipin Pal Commemoration Volume.

পত্রিকা/বাংলা

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক।
২. দুরবীণ, ১৮৬৯।

পত্রিকা/ইংরেজী

১. Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1957,
২. Hindusthan Standard, 1942
৩. Imperial Gazetteer, vol XXIV.
৪. Bengal Herald, 1829.